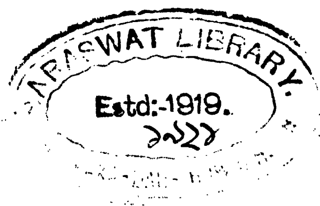
বাঙলা-সাহিত্যের

নবযুগ



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাঙলা-সাহিত্যের অধ্যাপক
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত,
এম্. এ ; পি. এইচ্. ডি

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৯৮।৪ রসা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব
সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৪৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫০
মূল্য—সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য
দি নিউ প্রেস
১নং রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

আমার অধ্যাপক ও পরমশুভার্থী

রসজ্ঞ সাহিত্যিক

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্‌-এ, বাহাদুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনীত—

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

এই লেখকের অন্যান্য বই—

১। উপমা কালিদাসস্য (প্রবন্ধ)—১৷৷০
২। সাহিত্যের-স্বরূপ (প্রবন্ধ) —১৷৷০
৩। বিদ্রোহিণী (উপন্যাস) —২৲
৪। এপারে ওপারে (কাব্য) —১৲

প্রাপ্তিস্থানঃ—শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

ভূমিকা

(প্রথম সংস্করণ)

এই গতির যুগে আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি, সত্য নিহিত থাকে অখণ্ড প্রবাহের সমগ্রতায়, কোন দেশকালের খণ্ড-ভূমিতে দাঁড়াইয়া আমরা সত্যকে কখনও মাপিয়া তুলিতে পারি না। সাহিত্যের যাহা সত্য তাহাও অখণ্ড প্রবাহে বিকাশের সত্য, তাহা রহিয়াছে সাহিত্যের সকল অতীত, বর্তমান এবং অনাগতকে জুড়িয়া। সুতরাং এই প্রবহমাণ স্রোতের উপকূলে কোথাও দাঁড়াইয়া সাহিত্যের সত্য সম্বন্ধে অথবা তাহার কোন যুগবিশেষের সম্বন্ধেও যে কোন কিছু চরম কথা বলিয়া দেওয়া যায়, এমন বিশ্বাস আমার নাই। সাহিত্যের বিকাশের বিবর্তন যে শুধু বাহিরে তাহা নহে,—এ বিকাশের বিবর্তন রহিয়াছে ব্যক্তিগত সাহিত্যবোধের ভিতরেও। সাহিত্যের যে সকল সমস্যা সম্বন্ধে পাঁচ বৎসর পূর্বে যে ধারণা পোষণ করিতাম, পাঁচ বৎসর পরে হয়ত তাহাও অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি,—তাহার সকল মতামতের সহিত পাঁচ বৎসর পরে হয়ত নিজেরই সম্পূর্ণ আন্তরিক সহানুভূতি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আজ পুস্তক-আকারে যে যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যে সকল

মতামত প্রকাশ করিলাম, বিশ বৎসর পরে এই সকল সম্বন্ধে আমার নিজেরই মতামত যে ঠিক অপরিবর্তিত থাকিয়া যাইবে এমন চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে আমি নারাজ। সুতরাং বিকাশের নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দনই যাহার ধর্ম, কোনও সিদ্ধান্ত-সূত্র রচনা করিয়া তাহাকে কোথাও আঁটিয়া বাঁধিবার চেষ্টা বৃথা। সেই স্পন্দনের ভিতরে কোথাও যদি কোনও রূপে এতটুকু তরঙ্গ তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহারই সার্থকতা আছে। এই কথা মনে করিয়াই আমি এই গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে বাঙলা-সাহিত্যে আসিয়াছিল একটা নবযুগ। এ যুগের গোড়াপত্তন বহুপূর্ব হইতে হইলেও, ইহা একটি স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের হাতে। এই সময়েই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আমাদের মনে প্রথম দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, সুদূর প্রাচ্যের শ্যামল ক্ষেত্রে পড়িয়াছিল পশ্চিমের সোনালী আলো। সে আলোক যে শুধু আমাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছিল তাহা নহে,—আমরা তাহাকে অনেকখানি প্রকৃতির দানের মত গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলাম আমাদের দেহমনের ভিতরে,—এই আত্মীকরণের ভিতরেই প্রকাশ পাইয়াছে আমাদের প্রাণপ্রাচুর্য। বঙ্কিম, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেম, নবীন প্রভৃতির ভিতর দিয়া বাংলা-সাহিত্যে যে নবযুগের আবির্ভাব দেখিতে পাই, আমার মনে হয়

তাহা একটি বিরাম-যতি লাভ করিয়াছে শরৎচন্দ্রের ভিতরে। তাহার পর আবার সাহিত্যের দিকে দিকে প্রকাশ পাইয়াছে নূতন আদর্শ, নূতন ধারা—বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাই শরৎচন্দ্রের ভিতরে ঘটিয়াছে একটি যুগসন্ধি। এই জন্য বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ বলিতে আমি মনে করিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্তের যে যুগ তাহাকেই।

আর একটি কথাও স্পষ্ট করি... বলিয়া রাখা দরকার, আমি এই গ্রন্থে বাঙলা-সাহিত্যের এই নবযুগের কোনও ইতিহাস লিখি নাই। আমি শুধু এই যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের বিশেষ বিশেষ আদর্শ বা রীতি লইয়া আলোচনা করিয়াছি,—কোথাও কোথাও বর্তমান সাহিত্যের কোনও বিশেষ বিশেষ ভাব ও রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রবন্ধগুলিও বিভিন্ন সময়ের লেখা; সুতরাং তাহাদের ভিতরে স্পষ্ট কোন যোগসূত্র নাই। তবে প্রবন্ধগুলি সাজাইবার সময়ে একটা পারম্পর্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সমস্ত জুড়িয়া পাঠকের মনে এই নবযুগ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিতে পারে, এই আশাই হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রায় শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ বাহাদুরের অকৃত্রিম স্নেহ এবং নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহের কথা

স্মরণ করিতেছি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহিত অনেক সময়ে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট হইতে অনেক সময়ে অনেক মূল্যবান উপদেশ লাভ করিয়াছি। ইহা ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কবিশেখর শ্রীযুত কালিদাস রায়, শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী প্রভৃতি নানাভাবে উৎসাহ এবং উপদেশ দানে আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

আমার এই সাহিত্য আলোচনা দ্বারা যদি কাহারও মনে বাঙলা-সাহিত্যের আলোচনার জন্য একটুকু প্রেরণা যোগাইতে পারিয়া থাকি তবেই সকল চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

বিনীত—

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগে'র প্রথম সংস্করণ অনেকদিন পূর্বে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে দেরী হইয়া গেল। 'নবযুগের লক্ষণ' এবং 'মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রবন্ধ দুইটি নূতন যোগ করা হইল। তাহা ছাড়া হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং বিহারীলাল সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিকে অনেকখানি পরিবর্ধিত করা হইয়াছে। এই পরিবর্ধনের ফলেই গ্রন্থের কলেবর দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য অন্যান্য প্রবন্ধগুলির একটু আধটু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন ব্যতীত বিশেষ কিছু করা সম্ভব হইল না।

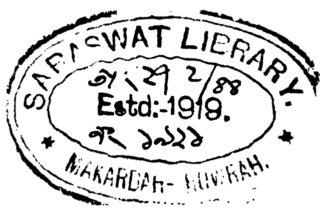
কবিতার ভিতরে পংক্তি-সন্নিবেশকে একান্ত বাহ্য বলিয়া গণ্য করিলে ভুল হয়; তথাপি কাগজ বাঁচাইতে গিয়া পংক্তি-সন্নিবেশের উপরে আমার একটু হাত চালাইতে হইয়াছে। বিহারীলালের কবিতার উদ্ধৃতির ভিতরে অনেকে এই ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারেন; আশা করি কাগজ-সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সহৃদয় পাঠক এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

এই সংস্করণের মুদ্রণপরীক্ষাকার্যে পরমপ্রীতিভাজন ছাত্র শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। শ্রীমান্ মৃণাল পালচৌধুরীর নিকট হইতেও সাহায্য পাইয়াছি।

৯৮।৪ রসা রোড, কালীঘাট।
আষাঢ়, ১৩৫০

বিনীত—
গ্রন্থকার।

সূচী



বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ

নবযুগের লক্ষণ

মানুষ নিরবধি কালেরও বহু অবধি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, তাহা লইয়াই চলে রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে, সভ্যতায়, সাহিত্যে নানা রকমের যুগবিভাগ। মহাকালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, সাহিত্য এই সকল লইয়া আমাদের বিশ্বজগৎটি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে,—অথবা একথাও বলা যাইতে পারে যে, বিশ্বজগতের চলার ছন্দের নামই কাল। এ দু'য়ের ভিতরে যে কথাটাই সত্য হোক না কেন, মোটের উপরে কালের চরণ-চিহ্নের সন্ধান এবং পরিচয় মেলে শুধু বিশ্বজগতের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া। এই জন্যই আমাদের বাহিরের জড়-জগতে এবং অন্তরের চিন্তাজগতে যখন আসে অনেকখানি একটা পরিবর্ত্তন তখনই, আমরা বুঝিতে পারি, কাল চলিয়া গিয়াছে অনেকখানি; এই পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি বিচার করিয়াই আমরা করি নানাপ্রকারের যুগবিভাগ।

সাহিত্যের জগতে আসিয়া আমরা যখন এই রকম

কোন যুগবিভাগের কথা বলি, তখন বুঝিতে হইবে সাহিত্যের দেহে ও মনে আসিয়াছে এই রকমের একটা অনুভবযোগ্য পরিবর্তন ; সেই পরিবর্তনের প্রকৃতি দ্বারাই আমরা যুগের স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয় করি। সাহিত্যের ইতিহাসের যে অংশটার উপর আমরা আধুনিক যুগের লেবেল আঁটিয়া দিয়াছি, তাহা অতি স্পষ্টচৌহদ্দিযুক্ত কোন কালখণ্ড নহে,—ইতিহাসের আবর্তনের ভিতর দিয়া সাহিত্যের দেহে ও মনে একটু একটু করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে কতগুলি পরিবর্তনের বিশেষ-লক্ষণ, সেই লক্ষণসমষ্টিই নবযুগের বা আধুনিক যুগের পরিচয়-পত্র।

মানুষের সাহিত্যের ইতিহাস তাহার সমগ্র জীবনের ইতিহাস হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন নহে ; এই জন্যেই সাহিত্যের আধুনিক যুগের পরিচয় নিহিত রহিয়াছে আমাদের জীবন-ইতিহাসের একটি বিশেষ পরিচয়ের ভিতরে। মানুষের চারি-পাশের জগৎ লইয়াই মানুষের সাহিত্য ; সে জগতের ভিতরে শুধু চেতনের খেলা নাই,—সেখানে আছে জড়েরও খেলা। জড় ও চেতনের সমবায়ে গঠিত মানুষের এই জগৎটি একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ রূপ লইয়া মানুষের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে,—মানুষের জগতের এই বিশেষ রূপটিই মানুষের সাহিত্যকেও দান করিয়াছে একটি বিশেষ রূপ, সেই বিশেষ রূপের সাহিত্যের আমরা নাম দিয়াছি আধুনিক সাহিত্য।

আসলে আমাদের জগৎটার কোথায় কতখানি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে না ঘটিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত,—কিন্তু আমাদের মনটার যে নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। জগতের পানে তাকাইয়া আমরা যখন তাহার যে রূপ দেখি তাহা আমাদের চোখ দেখে না,—চোখের যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখে আমাদের মন। এই মনের পরিবর্ত্তন আনে দৃষ্টির পরিবর্ত্তন,—দৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটায় দৃশ্যের পরিবর্ত্তন। জগতের ভিতরে হয়ত সমান তালে চলিতেছে একটা ইহার উল্টা প্রক্রিয়া—অর্থাৎ দৃশ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া হয়ত দ্রষ্টা মন (মনের ঊর্ধ্বের দ্রষ্টার কথা বলিয়া আমি সমস্যা আরও বাড়াইয়া তুলিতে চাহি না) যাইতেছে পরিবর্ত্তিত হইয়া। উভয়ের ভিতরে রহিয়াছে একটা পারস্পরিক প্রভাবের সম্বন্ধ। এখানে কার্য-কারণ যেটাই সত্য হোক, আমরা নিরন্তর যে জিনিসটা খুব বেশী অনুভব করিতে পারিতেছি উহা আমাদের মনের পরিবর্ত্তন এবং মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির পরিবর্ত্তন। আমাদের আধুনিকতার পশ্চাতে বাস্তব সত্য কি আছে না আছে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে,—প্রকৃতপক্ষে আমাদের আধুনিকতার মূলে নিঃসংশয়ে যাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি, তাহা একটা দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য। একটা সহজ উদাহরণ গ্রহণ করিতেছি। কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া চাঁদের নাম একবারও গ্রহণ করেন নাই

এমন কবি আদৌ আছেন কিনা ইহা বিশেষ গবেষণার বস্তু; কালপ্রবাহের ফলে এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের চাঁদের ভিতরে হাজার বৎসরের পূর্বের চাঁদ হইতে কতখানি পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে বলিতে পারেন; কিন্তু তাহার ভিতরকার অনুপরমাণুর মধ্যে পরিমাণগত এবং প্রকারগত কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটুক আর নাই ঘটুক, আজকের দিনে চন্দ্রের রূপ যে অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাতে আর বাধা নাই। হাজার বৎসর পূর্বের সংস্কৃত কবিগণ স্থানে অস্থানে শ্লোকের পর শ্লোকে যে অবিমিশ্র আদিরসের প্রলেপের দ্বারা চন্দ্রের মুখ ভূষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন আজকের দিনের কোন কবি তাহা করিয়া সাধুবাদের অধিকারী হইবেন বলিয়া ভরসা রাখি না। আধুনিক সাহিত্য-গগন হইতে চন্দ্র একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে একথা বলা যায় না, কিন্তু তাহার রূপ ও রঙ দুই-ই বদলাইয়াছে। এ রূপ-পরিবর্তনের কারণ আমাদের মনের পরিবর্তন এবং তাহার ফলে আমাদের দৃষ্টির পরিবর্তন। আধুনিক যুগে সর্বক্ষেত্রেই আমাদের এইরূপ একটা প্রকাণ্ড দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিয়াছে; এই দৃষ্টি-পরিবর্তনের ইতিহাসই আধুনিকতার ইতিহাস।

আমরা যাহাকে আমাদের আধুনিক যুগের সাহিত্য বলি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, সেখানে সর্বদা

বিষয়-বস্তুরই যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে এমন নহে,—একই বিষয়-বস্তু লইয়া সাহিত্য রচিত হইয়াও দুই যুগের সাহিত্যের ভিতরে ঘটিয়াছে অনেকখানি তফাৎ; দুই যুগের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে একই বিষয়-বস্তু দুই যুগে দুই কবির হাতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনযুগের কাব্যে বর্ণিত ঘটনা লইয়া মধ্যযুগে সাহিত্য রচিত হইয়াছে, মধ্যযুগের সাহিত্য লইয়া আধুনিক—তথা অত্যাধুনিক যুগে সাহিত্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু একের সহিত অপরে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে না,—সকলেই বিশেষ।

মূলে আমাদের সাহিত্যের বিষয়-বস্তু কি? আমার মনে হয়, বিশ্বসৃষ্টির বহুবঙ্কিম প্রবাহের পশ্চাতে বাজিয়া উঠিতেছে যে একটা ধ্বনি—একটা অতলস্পর্শ বিস্ময়ের অনুরণন আদিম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত তাহা লইয়াই নানা রূপে রসে, সঙ্গীতে ভঙ্গিতে গড়িয়া উঠিতেছে আমাদের সাহিত্য। কথাটি আমি অন্যত্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া এখানে আর পুনরুক্তি করিতে চাহি না। বিশ্বজগতের যে দৃশ্য বা ঘটনা আপনার সাধারণ প্রাতিভাসিক রূপের ভিতরেই শেষ হইয়া যায়, তাহা লইয়া কোনদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গড়িয়া ওঠে নাই; মানুষ যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে সেই দৃশ্য—সেই ঘটনা লইয়া, যাহার আপাতরূপের পশ্চাতে সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে গভীর বিস্ময়—গভীর রহস্য

অসীম মহিমা। কখন্ কোথায় কিসের ভিতর দিয়া মানুষ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে এই বিস্ময়—এই রহস্য—এই মহিমা, এবং কেমন করিয়া অন্তরধৃত সেই বিস্ময় এবং মহিমাকে সে করিয়াছে প্রকাশ, তাহা লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের সাহিত্যের ইতিহাসে এত যুগবিভাগ।

একদিন এমন ছিল যে নিম্নের মাটির পৃথিবী এবং তাহারই অঙ্কে অভিনীত প্রতিদিনের জীবন-নাট্যের প্রতি চাহিয়া দেখিবার মানুষের যেন সময়ই ছিল না। প্রথম নিদ্রাভঙ্গে সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিত—পূর্বাচলের দুয়ার খুলিয়া শুভ্রতেজোবসনা, রোচনা দ্যুলোক-দুহিতা উষা তাহার স্বর্ণবর্ণে সকল দিক উদ্ভাসিত করিয়া স্মিতহাস্যে আবির্ভূতা,—ধীরে ধীরে শোভন-পথে স্বর্ণরথে সে নামিয়া আসিতেছে মর্ত্যে,—স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সুপ্তা পৃথিবীর ঘুম ভাঙাইয়া দিল তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া চম্পক-অঙ্গুলি-স্পর্শে,—সুগৃহিণীর ন্যায় জাগাইয়া দিল সকল পশু-পাখী—জীব-জন্তু—প্রেরণ করিল সকলকে দিকে দিকে তাহাদের কর্মক্ষেত্রে; সুগৃহিণীর ন্যায় সে সঙ্গে আনিল প্রচুর ঐশ্বর্য, প্রচুর অন্ন। তারপরে একটু একটু করিয়া আকাশে দেখা দিল দ্যাবা-পৃথিবীর প্রদীপ্ত পুত্র সূর্য—দেখিতে দেখিতে ঝলিয়া উঠিল তাহার ভাস্বর কিরীট—সপ্তসূর্যের রথে ব্যোমমার্গে আরম্ভ হইল তাহার যাত্রা—দিবসের শেষে

সপ্ত অশ্ব লইয়া কোথায় হইল তাহার যাত্রা শেষ,—কোথায় সে সংহত করিয়া রাখিল তাহার বিশ্বভুবনব্যাপী এত তীব্র আলো! কৃষ্ণবসনা রজনী আসিয়া আবার তাহার অঞ্চল-তলে ঢাকিয়া রাখিল সমগ্র পৃথিবী, নীরব হইয়া গেল সব কর্মকোলাহল, অন্ধকার আকাশে একটি একটি করিয়া আসিয়া দেখা দিল গ্রহ-নক্ষত্রের দল, কে তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—কে তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে! প্রভাতের পরে সন্ধ্যা আসে, দিবসের পরে রাত্রি আসে,—গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে, বর্ষার পর শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত আসে,—এই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের দল—পর্যায়ক্রমে আসিতেছে--যাইতেছে,--কে ইহাদিগকে নিয়োজিত করিতেছে ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে! স্বচ্ছ সুনীল আকাশে সহসা কোথা হইতে ভৈরব গর্জনে ছুটিয়া আসে কালো কালো মেঘ-রূপী অসুরের দল,—কে তাহাদের বুকে প্রহার করে বজ্র,—তাহাদের কাছ হইতে ছিনাইয়া লয় বারিরাশি, তাহাকে বহাইয়া দেয় মর্ত্যে পর্বতের বুকের ভিতর দিয়া--কলকলনাদে মাতিয়া ওঠে নদনদী—ধরণী হয় শস্য-শ্যামলা! কোথা হইতে সহসা ছুটিয়া আসে রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ—তাহাদের রথ টানিয়া চলিয়াছে নানা বর্ণের মৃগগুলি, মুহূর্তে পর্বত ভাঙিয়া সাগরের বুক মন্থিত করিয়া বীরবিক্রমে ছুটিয়া যায় অন্তরীক্ষে! মানুষের চারিদিকে একি আলোড়ন—একি বিস্ময়—একি মহিমা! বিশ্বজুড়িয়া নিরন্তর চলিয়াছে কত শক্তির খেলা, সে শক্তি

মানুষের শক্তি হইতে কত বৃহত্তর—মহত্তর! আদিম শিশু-মন লইয়া মানুষ দেখে আর ভাবে—ভাবে আর বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়। এই বিস্ময়-বিমুগ্ধতা মানুষের সমগ্র সত্তার ভিতরে জাগাইয়া তুলিল একটা অলৌকিক আনন্দের স্পন্দন—সেই স্পন্দন নিজেকে বাঙ্ময়রূপ দান করিল সহস্র সহস্র কবিতায়, সেইখানেই আমরা পাইলাম আমাদের সাহিত্যের প্রথম পরিচয়। বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে বহু ভাগে ভাগ করিয়া তাহাকে বহু মূর্তি দান করিয়া মানুষ সূক্তের পর সূক্ত রচনা করিয়া প্রথমে করিয়াছিল দেব-দেবীর মহিমা-কীর্তন; কিন্তু একটু একটু করিয়া এই বহুর ভিতরে সে পাইল একের সন্ধান; সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে সে দেখিতে লাগিল একের মহিমা,—সেই একের মহিমা লইয়াই গড়িয়া উঠিল পরবর্তীকালের সাহিত্য।

তারপরে একটু একটু করিয়া মানুষের দৃষ্টি পড়িল নিম্নের পানে—মাটির পৃথিবীর দিকে। মানুষ একটু একটু করিয়া অনুভব করিতে লাগিল, শুধু পূর্বাচলে ঊষা দেবী নাই,—আকাশে শুধু সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র নাই,—অন্তরীক্ষে শুধু মেঘরূপী বৃত্র নাই, রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ নাই, স্বর্গে ইন্দ্র নাই—সমুদ্রে বরুণ নাই,—এই সকল ছাড়া আরও রহিয়াছে এই বিরাট্ পৃথিবী—তাহার বুকে চলিয়াছে মানুষের জীবন-লীলা। মানুষ বুঝিল—স্বর্গে ও অন্তরীক্ষে যেমন

দেবতা রহিয়াছে,--মর্ত্যে তেমনি মানুষ রহিয়াছে। তখন পর্যন্তও 'আমি' নাই,—মানুষ আছে; ব্যষ্টি নাই, সমষ্টি আছে। মাথার উপরে স্বর্গ রহিয়াছে বটে, স্বর্গের ভিতরে চিরনমস্য এবং অতুল শ্রী, ঐশ্বর্য ও মহিমান্বিত দেবগণ রহিয়াছেন বটে; কিন্তু নিম্নের পৃথিবীতেই কি চলিতেছে কম আলোড়ন! জাতিতে জাতিতে, সভ্যতায় সভ্যতায়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চলিতেছে নিরন্তর কত সংঘর্ষ, সংগ্রাম ও সমন্বয়; সেই নিরন্তর সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিতেছে কত নূতন জাতি, নূতন দেশ, নূতন সভ্যতা। মানুষের এই বিরাট্ জীবন-ইতিহাসের ভিতরেও রহিয়াছে কত বড় বিরাট্ মহিমা—সেখান হইতেও জাগিয়া উঠিতেছে অতল গভীর রহস্য ও বিস্ময়। সেই বিরাট্ বিস্ময়ের আনন্দ লইয়া গড়িয়া উঠিল বিরাট্ কাব্য,—ইহাই আমাদের সত্যকার মহাকাব্যের যুগ। এযুগে মানুষ বাড়িয়া উঠিয়াছে দেবতারই আওতায়,—দেবতার অনুগ্রহ-নিগ্রহের দ্বারাই সে পরিপুষ্ট আবার নিষ্পেষিত। তথাপি মানুষের ভিতরেও শৌর্যে-বীর্যে, সৌন্দর্যে প্রেমে সার্থক চরিত্র অনেক রহিয়াছে; অসংখ্য প্রকারের সাধারণ মানুষের ভিড়কে পটভূমিতে রাখিয়া তাহার ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া বীরত্বে, প্রেমে, সৌন্দর্যে, ত্যাগে সমুজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বহু চরিত্রের সমাবেশ করিয়া তবে দেবতার পার্শ্বে আমরা মানুষের মহিমাকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিলাম। মানুষের ভিতর হইতে

এক একটি চরিত্রকে বাছিয়া লইলাম মানবীয় দোষগুণের এক একটি জীবন্ত বিগ্রহরূপে, প্রস্তরে খোদাই মূর্তির মত তাহাদিগকে করিয়া তোলা হইয়াছে একান্ত স্পর্শযোগ্য। দেবতার পাশাপাশি মানুষকেও প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবার সেই চলিয়াছে কি বিরাট্ আয়োজন; বিপুল পরিধি, অনন্য-সাধারণ ঘটনা-প্রবাহ, অসংখ্য নরনারীর কর্মকোলাহলের দ্বারা এত বড় বিরাট্ আয়োজন না করিলে স্বর্গীয় দেবতামণ্ডলীর পাশে মর্তের মানুষ হয়ত সে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না।

এ যুগের সাহিত্যে আমরা একদিকে যেমন দেখিতে পাই, অসাধারণ দোষেগুণে মানুষকে দেবোপম করিয়া তুলিবার রহিয়াছে একটা আপ্রাণ চেষ্টা, তেমনই আবার মানুষের জন্ম-মৃত্যু এবং মর্ত্যের অবস্থিতি সব জুড়িয়া রহিয়াছে একটা অলৌকিকতার প্রহেলিকা। মানুষকে যেখানেই সম্ভব অতিমানুষ করিয়া এবং নানাপ্রকার অলৌকিক কিংবদন্তি দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী ফাঁকটুকু ভরিয়া দিবার চেষ্টা চলিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই আবার দেখিতে পাইব, মানুষকে সম্ভব ও অসম্ভব উপায়ে টানিয়া উর্ধ্বে তুলিয়া দেবতার সামিল করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা রহিয়াছে এই সকল সাহিত্যে, সেই চেষ্টাই অন্য দিকে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে দেবতাকে টানিয়া মর্ত্যের মাটিতে নামাইয়া তাঁহাদের দেহমনে যতটা সম্ভব মর্ত্যের রং ও গন্ধ মাখাইয়া

তাহাদিগকে মানুষের স্বজাতি করিয়া তুলিবার। এই সময় হইতে পরবর্তী কালের সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বদাই দেখিতে পাই এই চেষ্টা, একদিকে মানুষকে অলৌকিক দেবোপম করিয়া এবং অন্যদিকে দেবতাকে লৌকিক মনুষ্যোপম করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের, দেবতা ও মনুষ্যের ভিতরকার ভেদটুকু যথাসম্ভব ঘুচাইয়া দিতে। এই সকল চেষ্টার ভিতরে বীজাকারে নিহিত রহিয়াছে মানুষের অন্তর্নিহিত একটা আকাজ্ক্ষা—সে আকাজ্ক্ষা মানুষের সাহিত্যে মানুষেরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা—জীবনেরই জয়গান; বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই আকাজ্ক্ষাসিদ্ধির জন্যই চলিয়াছে সাহিত্যিকগণের নিজেদেরই মনের জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা।

একটা জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া বিরাট দেশ, সুদীর্ঘ কাল এবং অসংখ্য পাত্রের সমাবেশে এই যে সমষ্টিগতভাবে মানুষের জীবনকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, ইহার পরই দেখা দিয়াছিল এককভাবেই মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনা। সে ক্ষেত্রে দৈবের সহিত পৌরুষের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, এবং সে সংঘর্ষের ফলে মানুষকে দৈব নিগ্রহে হার মানিয়া আবার দৈব অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিতে হইল। তখন পর্যন্তও মানুষের প্রতি মানুষের আসে নাই নিশ্চল শ্রদ্ধা; তাই দৈবের হাতে পৌরুষের পদে পদে লাঞ্ছনার একশেষ করিতে কবিদের

উৎসাহের অবশেষ ছিল না। বহু ক্ষেত্রেই মানুষ দেখা দিয়াছে উপলক্ষ্য রূপে; লক্ষ্য দৈবের মহিমা-প্রতিষ্ঠা। মানুষের যেটুকু গৌরব তাহা দেব-মহিমার প্রসাদ লাভ করিয়া, দেব-মহিমা প্রচারের বাহন মাত্র রূপে।

কিন্তু একটু একটু করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে কালের রথ, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছে মানুষের দৃষ্টি। মানুষের এই দৃষ্টি-পরিবর্তন নেহাৎ খাপছাড়া এলোমেলোভাবে ঘটিতেছে না,—তাহার ভিতরে আমরা স্পষ্ট করিয়া খুঁজিয়া পাই একটা ক্রম—একটা বিশেষ পদ্ধতি ও পরিণতি। মানুষের এই দৃষ্টি-পরিবর্তনের ক্রম হইতেছে স্বর্গ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া তাহাকে মর্ত্যের ভিতরেই দৃঢ়নিবদ্ধ করিবার দিকে, মানুষের জগৎ হইতে দেবতার নির্বাসন করিয়া সেখানে মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে। আমার মনে হয়, এই যে ধূলামাটির মর্ত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাহার সঙ্গে নাড়ীর টান, এই যে মাটির পৃথিবীতে রক্ত-মাংসের মানুষের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, ইহাই আধুনিক যুগের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণ সাহিত্যে একদিন হঠাৎ কোনে বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কোনও বিশেষ সাহিত্যিককে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হয় নাই; বহু দিন ধরিয়া নানাভাবে চলিতেছিল ইহার সাধনা; সেই সাধনা যখন একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, তখন হইতেই আধুনিক

যুগের পত্তন হইয়াছে। জীবনে যখন জাগিয়াছে মর্ত্যপ্রীতি ও মনুষ্যপ্রীতি সাহিত্যে তখনই পড়িয়াছে তাহার প্রতিবিম্ব ;—এই দিক হইতে দেখিতে গেলে আধুনিকতা শুধু মাত্র সাহিত্যের সত্য বা রূপ নয়,—উহা আমাদের সমগ্র জীবনের সত্য।

আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়াই বিশেষভাবে কথা বলা যাক্, তাহাতে হয়ত বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথমেই একটা জিনিস চোখে পড়ে ; এদেশের প্রাচীন সাহিত্য, অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের সাহিত আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের কোনও ধারাবাহিকতার যোগ নাই। তিন হাজার বৎসর পূর্বে যে সাহিত্য তাহার শৈশব পার হইয়া আসিয়াছে এবং হাজার বৎসর পূর্বে যে তাহার প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়াছে, সে সেই হাজার বৎসরের পরবর্তী কালের সাহিত্যগুলির ভিতর দিয়া নিজের ধারাকে অক্ষুণ্ণভাবে বহাইয়া দিতে পারে নাই ; প্রৌঢ়ত্ব লাভের পরে একটু একটু করিয়া তাহার ধারা যাইতে লাগিল থামিয়া। সংস্কৃত-সাহিত্যের লেখক এবং পাঠকগোষ্ঠীকে এড়াইয়া এদেশের অসংস্কৃত জনগণের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ নূতন ইতিহাসের ধারাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের বাঙলা-সাহিত্য এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি। অসংস্কৃত জনগণের মধ্যে জাগিয়া উঠিল সেই আদিম মানবশিশুর

শৈশব লীলা; তাই সংস্কৃত-সাহিত্যের যে যুগ কাটিয়া গিয়াছে তিন হাজার বৎসর পূর্বে বাঙলা-সাহিত্যের সেই যুগ আরম্ভ হইল এক হাজার বৎসর পূর্বে। বাঙলা-সাহিত্যের জন্মের অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্বে সংস্কৃত-সাহিত্যে মানুষ লাভ করিয়াছিল তাহার মানবীয় প্রতিষ্ঠা; কিন্তু বাঙলা-সাহিত্যে আসিয়া মানুষকে আবার দেবতার সঙ্গে বহুদিন করিতে হইল কলহ-বিবাদ, বহু লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরে যেখান হইতে আরম্ভ হইল সাহিত্যে মানুষের প্রতিষ্ঠা সেইখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বাঙলা-সাহিত্যের আধুনিক যুগ।

আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের আদি ও মধ্য যুগে কি দেখিতে পাই?—একটানা ধর্মের প্লাবন। এই আদি ও মধ্য যুগ ধরিয়া বাঙলা দেশের মানুষ অসম্ভব রকমের ধার্মিক ছিল বলিয়াই বাঙলা-সাহিত্যে ধর্মেরই একাধিপত্য একথা বলিলে এক কথায় সমস্যার সমাধান হয় বটে, কিন্তু যথার্থ সত্য লাভ হয় কিনা সন্দেহ। আসলে দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত যে বাঙলা দেশে ধর্মের অতিরিক্ত প্রাবল্য ছিল সে কথাটা হয়ত ততখানি সত্য নয় যতখানি সত্য এই কথাটা যে, এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়াও আমাদের জাতীয় জীবনে মনুষ্যত্বের মহিমোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে নাই; জাতীয় জীবনে এই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার অভাব বহুদিন ধরিয়া আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল ঊর্ধ্বে—রাধা-কৃষ্ণ, শিব-চণ্ডী, মনসা-শীতলা-ষষ্ঠী, এমন কি শিলাকৃতি ধর্মঠাকুরের দিকে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া যত কবি হাজার হাজার পদ রচনা করিয়া রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা গান করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরে সকলেই নিত্য বৃন্দাবন ধামে রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমলীলার আস্বাদাকাঙ্ক্ষী কিনা এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকের হয়ত এখনও সংশয় রহিয়া গিয়াছে। অন্ততঃ একথা সত্য যে অনেক কবি-সম্বন্ধেই হয়ত আমাদের মনে বারংবার প্রশ্ন জাগে,—

> সত্য ক'রে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহ-তাপিত? ... ...
> ... ... এত প্রেমকথা,
> রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
> চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
> আঁখি হতে?

কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে;—'কানু ছাড়া গীত নাই', কারণ মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নাই; মানুষের প্রেমের ভিতরে যে থাকিতে পারে অতলস্পর্শ মহিমা তাহাকে দেখিবার আমাদের দৃষ্টি নাই, গ্রহণ করিবার মন নাই, তাই নিছক মানুষের প্রেমকেও অনেক সময় রাধাকৃষ্ণের

অঙ্গস্পর্শের দ্বারা মহিমান্বিত করিয়া লইয়া কাব্য রচনা করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠ করিয়া রাধাকৃষ্ণ-পদে মতি ও রতি হইতে পারে কয়জনের এবং কয়জনের পক্ষেও গ্রন্থ কতখানি হিতকর তাহা তর্কাতীত নহে; তথাপি সেই কামায়নও রাধাকৃষ্ণ প্রেম-রসায়নের পুটপাকে জারিত হইয়া সাধারণের মধ্যে আজ বেশ প্রচার লাভ করিয়াছে।

দেবদেবীগণের মাহাত্ম্য প্রচারই মঙ্গলকাব্যগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া একটা মত বহুপ্রচলিত। কিন্তু মঙ্গলকাব্য-গুলি সমগ্রভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, দেবদেবীর মাহাত্ম্য সেখানে তেমন ভালভাবে ফুটিয়াও ওঠে নাই, প্রতিষ্ঠাও লাভ করে নাই, যতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে মনুষ্যত্বের অপমান ও লাঞ্ছনা। আমার মনে হয় দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা মঙ্গলকাব্যের মূল কারণ ততখানি নহে যতখানি মানব-মানবীর এই মর্ত্যলোকে অধ্যুষিত জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম মনে প্রাণে শাক্ত ছিলেন, না বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা আমরা এখনও নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু যে কথাটা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি তাহা এই, মর্ত্যবাসী একটি 'গোহিংসক রাঢ়' ব্যাধের জীবনে তিনি এমন মাহাত্ম্য খুঁজিয়া পান নাই যাহাতে তাহার নিরাভরণ ব্যাধরূপটি লইয়াই কাব্য রচনা করা যাইতে পারে; ধনপতি সদাগর বা শ্রীমন্ত সদাগরের বিচিত্র জীবন-কাহিনীকেও তিনি সেই শ্রদ্ধা এবং নিজস্ব

মহিমা দান করিতে পারে নাই। কবি আরও জানিতেন, সে যুগে নিছক ব্যাধের কথা, বিশুদ্ধ সদাগরের কথা কেহ শ্রদ্ধা করিয়া শুনিতেও চাহিবে না; তখন সেই ব্যাধ-ব্যাধিনীকে, সেই বণিক বণিকপত্নীকে অলৌকিক মাহাত্ম্য-দানের চেষ্টা চলিতে লাগিল নানাভাবে,—প্রথমতঃ তাহাদের পূর্বজন্মের যবনিকার অন্তরালে দাঁড় করাইয়া দিলেন দুই জোড়া স্বর্গবাসীকে, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের ইহজন্মের জীবনকে বহুরূপে অনন্যসাধারণত্বের মহিমা দান করিবার চেষ্টা হইল চণ্ডিকার বহু বিচিত্র নিগ্রহ-অনুগ্রহের ভিতর দিয়া। মুকুন্দরামের এবং তৎপরবর্তী চণ্ডীমঙ্গলকারগণের কালকেতু উপাখ্যানে বা ধনপতি উপাখ্যানে কোথায়ও দেবীর প্রতিষ্ঠা তেমন সুষ্ঠু হইয়া ওঠে নাই যতখানি সুষ্ঠু হইয়াছে দেবীহীন মানুষের অপ্রতিষ্ঠা।

কৈশোরে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল পড়িয়া মনের ভিতরে উল্টা ফল ফলিয়াছিল। 'লঘুজাতি কাণি' মনসাদেবীর কাঁকালটি আর একটি হেঁতালের বজ্রবাড়ি দ্বারা চূর্ণ করিবার সুযোগ যে চাঁদ সদাগর কেন পাইল না, সেই আপশোষ লইয়াই ব্যথিত মনে দিন কাটিত। কিন্তু সেই রজত-গিরি-নিভ বিদ্রোহী পৌরুষের উচ্চশির যেদিন কবি হেলায় ধূলায় লুটাইয়া দিলেন, চাঁদ সদাগর যেদিন বাম হাতে ফুল দিয়া পিছন ফিরিয়া মনসার পূজা করিল সেদিন হয়ত মঙ্গল-গীতের শ্রোতারা ভক্তিতে গদগদ না হইলেও ভয়ে কিঞ্চিৎ

জড়সড় হইয়াছিল। ইহাকে কি শুধু বাঙলা-সাহিত্যে ধর্মের প্রভাব বলিব, না জাতীয় জীবনের অশোভন অসহায়তার পরিচয় বলিব ? যুগে যুগে ভক্তগণকে অবলম্বন করিয়া ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের প্রচেষ্টা দেখিয়া ধর্মঠাকুরের পায়ে মাথা নোওয়াইবার সুযোগ একবারও না পাইলেও খোলা মনে প্রচুর হাসিবার অবকাশ বহু পাওয়া গিয়াছে। ভাগ্যে উল্লূক বা হনুমান একজন কেহ ধর্মঠাকুরের পাশেই ছিল,—নতুবা মর্ত্যবাসী ভক্তের বিপদে গোলক- বৈকুণ্ঠ- বা কৈলাসবাসী ধর্মঠাকুরের সিংহাসন যখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিত, তখন অসহায় ঠাকুরদেবতা না জানি কি উপায় করিতেন! তবু ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশের কিছুই কার্পণ্য নাই,—শয্যাশিয়রে, পথে, ঘাঠে—স্ববেশে, পরবেশে ঠাকুর শুধু স্বপ্নাদেশ ছড়াইয়াছেন আর এখানে সেখানে উর্বর এবং উষর ভূমি ফুড়িয়া কেবলই গজাইয়াছে ধর্মমঙ্গল। লাউসেন এবং ধর্মঠাকুর মুখোমুখী হইয়া একবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে কে হারিত কে জিতিত কোন যুগের ধর্মমঙ্গলের কবিই সে কথা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ ; কিন্তু তথাপি লাউসেনের মস্তকে রহিয়াছে সর্ব্বদা ধর্মঠাকুরের যুগল পাদপদ্ম,—নতুবা লাউসেনের কাহিনী কে শুনিত ?

কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"মূল পাঠ করিলে দেখা যায়,

শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন,—দেবোপম ; মানুষী শক্তি ও বীর্য্যবত্তার আতিশয্যে তাঁহাকে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের আরাধ্য অবতার, তুলসীচন্দনে লিপ্ত বিগ্রহ! তিনি কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করিতে পারেন ; তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা, প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু ; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তূণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন।” রাম মানুষ না হইয়া, ভক্তের ভগবান হইয়া বাঙলাদেশে আসিয়া প্রেমাশ্রুনেত্রে কাঁদিবেই ত! বাল্মীকিবর্ণিত নরশার্দূল বা নরবৃষভের মহিমা পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি কৃত্তিবাস কোথায় পাইবেন? কালিদাসের যুগের ‘ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ’ মানুষের মহিমাই বা কৃত্তিবাস কোথায় দেখিয়াছেন? রামই হোক আর শ্যামই হোক বাঙলাদেশের মাটিতে আসিয়া সবই ‘ত্রিভঙ্গ মুরারি’! কারণ, দেবত্বের মোহ কাটাইয়া মানুষের স্বমহিমা আবিষ্কার করিতে বাঙালীর অনেক সময় লাগিয়াছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেবত্ব এবং অলৌকিকতার মোহ একটু একটু করিয়া কাটাইয়া উঠিতে লাগিলাম ; বহুদিনের আচ্ছন্ন মন একটু একটু করিয়া হইতে লাগিল সংস্কারমুক্ত। দেবত্বের মোহ, অলৌকিকতার মায়াজাল কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোখ পড়িতে লাগিল মানুষের দিকে, তাহার মহিমাই ক্রমে ক্রমে হৃদয় ও মন

অধিকার করিতে লাগিল। পূর্বেই বলিয়াছি, এই মানবতার সুরই আধুনিক যুগের মূল সুর।

ভারতচন্দ্রকে আমাদের সাহিত্যে আমরা সন্ধিযুগের কবি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। ভারতচন্দ্র সম্পর্কে এই 'সন্ধিযুগের কবি' আখ্যাটি সব দিকে হইতেই অতি সুপ্রযুক্ত বলিয়া মনে হয়। মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগের মাঝখানে আবির্ভাব হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের, তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে পরস্পরে জড়িত হইয়া রহিয়াছে এই অস্তগামী এবং উদয়োন্মুখ দুই যুগেরই প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি। ভারতচন্দ্রের কাব্য অস্পৃশ্য বলিয়া রুচিবাগীশ-মহলে বিধিনিষেধ রহিয়াছে; কিন্তু মজা এই, ভারতচন্দ্রের প্রধান কাব্যখানি 'অন্নদামঙ্গল'! চিরাচরিত প্রথামতে মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়া অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারই কবির লক্ষ্য। কবি সব দিক হইতেই আট-ঘাট সেই রূপই বাঁধিয়াছেন, মঙ্গলকাব্য রচনার অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই নাই। কিন্তু সকল অনুষ্ঠানকে ব্যর্থ করিয়া এই দেবী-মাহাত্ম্যকে একান্তভাবে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়াছে যুগ-ধর্ম, সেখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে মানুষ। আইনানুগ-ভাবে অন্নদামঙ্গলকে ধর্মমূলক মঙ্গলকাব্য না বলিয়া উপায় নাই,—কিন্তু কবির সকল ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে প্রতি ছত্রে ছত্রে,—কবি হয়ত ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিয়াছেন। সকল মঙ্গলকাব্যের ভিতরেই শিব-পার্বতীর বিবাহ এবং তাঁহাদের মিলন-কলহময় গার্হস্থ্য চিত্রটি একান্ত মানবীয়

হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু ইহার চরম রূপ দেখিতে পাই ভারতচন্দ্রে ; এখানে দেবত্বের অতি পাতলা বুনানী মুখোসটি একেবারেই খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, প্রকট হইয়াছে তরুণী-ভার্যা ও বৃদ্ধ দরিদ্র পতির গার্হস্থ্য-জীবনের বাস্তবরূপ। দীনেশ বাবু ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে দেবচরিত্রের দুর্গতি করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মহাযোগী মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন,—শিশুগুলি তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে,—"কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥ কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া। ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥ দেবাদিদেব মহাদেবের এই অবমাননা একজন শিবশক্তির উপাসক কবির যোগ্য হয় নাই।" আসলে কিন্তু ভারতচন্দ্রের দেবদ্বিজে বিশুদ্ধা ভক্তি কোনদিনই ছিল না। তিনি যুগসন্ধির কবি, দেবতার মহিমা তাঁহাকে খুব মুগ্ধ করিতে পারে নাই,—তাঁহার দৃষ্টি নামিয়া আসিয়াছিল মাটির পৃথিবীতে,—চাহিয়া দেখিয়াছেন তিনি তাঁহার চারিদিকে মানুষ—তাহার নানাবিধ সমাজ-চিত্র ; শিবও তাই মানুষ হইয়া গিয়াছেন। মাথায় জটা ও ফণী, গলায় মালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, গায়ে মাখা ছাই—এমন একটি ভিখারীর রূপ দেখিয়াছি আমরা আমাদের সমাজে কোথায়?—একটি বেদিয়ার

ভিতরে। ভারতচন্দ্রের শিব তাই বেদিয়া। এহেন বেদিয়া বুড়া স্বামীর সহিত নবযৌবনা উমার বিবাহ ঘটাইয়াছেন যেই ঘটকচূড়ামণি নারদ তাঁহাকে যদি কন্যার মাতা মেনকা "ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়॥ ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলে চক্ষু খেয়ে॥" তখন দেব-চরিত্রের অসম্মান দেখিয়া শুধু জিভ কাটিলে চলিবে না; নূতন যুগকেও স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতে হইবে।

মানুষের মনের ভিতরে কোথায় যেন রহিয়াছে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া। যে দেব-দেবীকে এতদিন দূর হইতে দেখিয়া কত বড় ভাবিয়াছে,—কতবার তাঁহাদের নিকট হইতে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মাথা নোওয়াইয়া দিয়া লাভ করিয়াছে কত অপমান ও লাঞ্ছনা, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যখন একবার সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন তাঁহাদের গায়ে পৃথিবীর ধূলা মাটি মাখাইয়া দিতে যেন মানুষের একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ জাগিয়া ওঠে। শিবকে ঘিরিয়া বালকদলের মধ্যে যখন 'ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া', তখন ইহাকে অকবির অক্ষমতাজনিত দেবচরিত্রের অসার্থক বর্ণনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, মানুষ এই যে দেবতার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল এইখানেই আমাদের জাতীয় জীবনে এবং জাতীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই একটি নবযুগের সূচনা। মানুষের মহিমাকে আমরা যত বড় করিয়া

দেখিতে শিখিতেছি, দেবদেবীগণকে আমরা তত ছোট—তত লঘু করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ভারতচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যে শিবকে লইয়া এবং অন্যান্য দেবদেবী ও মুনি-ঋষি-দিগকে লইয়া স্থানে স্থানে যে হাস্যরস পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পরবর্তী কালে সে চেষ্টা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে। আজকাল তাই আমাদের সাহিত্যে আমরা দেবদেবীগণকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নামাইয়া লইয়া আসি শুধু তখনই যখন আমরা পরিবেশন করিতে চাই লঘু হাস্যরস, অন্যরসের অবতারণার ক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যে দেবদেবীর কোনও প্রবেশ-অধিকার আমরা রাখি নাই।

ভারতচন্দ্র যে শুধু বিদ্যাসুন্দরের স্থূলতম আদিরসের বাড়াবাড়ি দ্বারাই তাঁহার কাব্যকে মানবীয় সুর দান করিয়া-ছিলেন এমন কথা মনে করিলে ভারতচন্দ্রের উপরে অবিচার করা হইবে। এখানে সেখানে টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া আছে তাঁহার মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি। আমি একটি মাত্র উদাহরণ গ্রহণ করিতেছি। ভবানন্দের ভবনে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীর নিকট আত্মপরিচয় দান করিলেন, এবং ঈশ্বরী পাটনীকে বর যাচ্ঞা করিতে বলিলেন; তখন—

প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥

তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

দেবীর নিকটে কোন মোক্ষ-মুক্তির বর নহে,--রাজ-ঐশ্বর্যের বর নহে,—খেয়াঘাটের পাটনীর শুধু প্রার্থনা;—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে!' বুঝিতে পারিতেছি সাহিত্যে জীবনকে কত নিবিড় করিয়া পাইতে আরম্ভ করিয়াছি,—একটি সহজ সরল প্রার্থনায় খেয়াঘাটের পাটনীর মনের আকাঙ্ক্ষাটি কেমন মধুর হইয়া উঠিয়া কাব্যকে কাব্যত্ব দান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের পূর্বে মুকুন্দরামের ভিতরেও আমরা পাই এই জাতীয় সুকুমার মানবীয় স্পর্শের সন্ধান।

ভারতচন্দ্রের পরে প্রায় এক শতাব্দী জুড়িয়া চলিয়াছে কবিওয়ালাদের যুগ। বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অসাবধানে অবজ্ঞাত এই কবিওয়লাদের যুগটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, ভারতচন্দ্রের ভিতরে আমরা দেখিতে পাইলাম যে নবযুগের সন্ধান, কবিওয়ালাদের সঙ্গীত ও কবিতাগুলির ভিতর দিয়া আমরা আরও স্পষ্ট করিয়া পাই এই যুগ-পরিবর্তনের পরিচয়। এখানে আমরা দেখিতে পাই, কি করিয়া কাব্যের দেহ ও মনের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের লক্ষণগুলি, কি করিয়া আধুনিক যুগ প্রকাশ পাইতেছে তাহার স্পষ্টতম রূপে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর

প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা এবং টপ্পাওয়ালাদের সঙ্গীত ও কবিতাগুলির ভিতর দিয়াই বহিয়া আসিতেছিল আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন ধারাটি অভঙ্গক্রমে; মধ্যযুগের সাহিত্য এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পাশ্চাত্ত্যপ্রভাবে বর্ধিত আধুনিক সাহিত্য—ইহাদের ভিতরকার ঐতিহাসিক যোগসূত্র রহিয়াছে এই কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা এবং টপ্পাওয়ালাদের ভিতরে। এই সকল কবিগণের কাব্যরচনার ভিতরে বিশেষ করিয়া পাই রাধাকৃষ্ণ-লীলাসম্বলিত প্রেমসঙ্গীত, কিছু শ্যামা-সঙ্গীত, গিরিনন্দিনী উমাকে অবলম্বন করিয়া পাই আগমনী সঙ্গীত, আর কতকগুলি পাই নিছক মানবীয় প্রেম-সঙ্গীত। এই যুগের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমগীতিগুলি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাইব, এখানে মূল সুরের তফাৎ অনেকখানি। রাধাকৃষ্ণ এখানে অনেকখানিই মুখোস মাত্র,—এবং সে মুখোসও অনেক স্থানেই খসিয়া পড়িয়াছে,—তাহাদের পিছন হইতে দুঃখে-সুখে, বিরহে-মিলনে মধুর হইয়া দেখা দিয়াছে নরনারীর রক্তমাংসের মূর্তি। এই সকল কবিদের মন একেবারে সাধারণ মানুষের মন,—প্রেম একেবারে সাধারণ মানুষের বাস্তব প্রেম,—তথাপি সেই পুরাণো ঢংটিকে যেন আর ছাড়িছাড়ি করিয়াও ছাড়া যায় না,—চলিতে হইতেছে তাহারই রেশ টানিয়া। কিন্তু এই কৃত্রিমতা মানুষের

কিছুতেই বেশী দিন ভাল লাগে না; সে ব্যাকুল হইয়া ওঠে চিরাচরিত পদ্ধতির শান-বাঁধান পথ ছাড়িয়া সহজ সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে একান্ত স্বাধীনভাবে নিজের মনকে প্রকাশ করিতে; এই কৃত্রিমতার অস্বস্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাকুলতাই এইসব কবিদিগকে একদিন করিয়া তুলিল একেবারে বেপরোয়া,—তাঁহারা কবিতা লিখিলেন,—

তবে প্রেমে কি গুণ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে কেতকী কণ্টক হীনে
ফুল ফুটিত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিতো।
প্রেম সাগরেরি জল হতো যদি সুশীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল তাহে যদি না থাকিতো॥

অথবা, ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥

অথবা—

নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মনমিলন॥

কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা এবং টপ্পাওয়ালাদের এই সকল গানের ভিতরে আধ্যাত্মিকতা ত নাই-ই,—প্রেমের সূক্ষ্মতাও সর্বত্র হয়ত নাই,—সে হয়ত কামনা-বাসনার নগ্নমূর্ত্তি লইয়া অনেক স্থানেই হইয়া উঠিয়াছে স্থূল; কিন্তু তথাপি তাহার

বৈশিষ্ট্য এইখানে, এতদিন পরে সাহিত্যে মানুষ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই সকল কবি নরনারীর বাস্তব আকর্ষণের ভিতরেই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন গভীর রহস্য, অনন্ত বিস্ময়, অসাধারণ মহিমা; সেই রহস্য এবং মহিমাকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এত-দিনের প্রথাকে ঘুচাইয়া এই নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা সাহসী এবং সক্ষম হইয়াছিলেন। এই যে এইখানে রাধাকৃষ্ণের পরিবর্তে সাহিত্যে নরনারীর মহিমময়ী যুগল-মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইল, তাহার পর হইতে সাহিত্যের বেদীতে এই নরনারীর প্রেমের পূজাই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি ব্যতীত নরনারীর বিরহ-মিলনের প্রতিষ্ঠা এবং শুধু তাহাকে লইয়াই সাহিত্য-রচনা বাঙলা-সাহিত্যে এই প্রথম।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতি ব্যতীত এই যুগে অন্য জাতীয় ধর্মসঙ্গীত যাহা রচিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে মানবীয় স্পর্শ। দাশরথী রায়ের—

> বলে গেলি নে বলে ভাই ভেবেছিলেম আমি চিতে।
> দীনকে বুঝি ভুলে গেলি দিন পেয়ে রে রামা মিতে॥—

এই গানের ভিতরে যাঁহারা সহজ সরল ভগবদ্‌ভক্তির সন্ধান এবং আস্বাদ পান তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই; কিন্তু এই গানের প্রতিটি শব্দের ভিতর দিয়া উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে যে সহজ হৃদয়ের সখ্য প্রেম

তাহাকে একান্ত মানবীয় করিয়া দেখিলেও কাব্যের কোন গৌরবহানি হয় না; বরঞ্চ আমার মনে হয়, এই মানবীয় সুরই এই জাতীয় ধর্মসঙ্গীতগুলিকে করিয়া তুলিয়াছে একান্ত রমণীয় এবং মধুর।

এই যুগের আগমনী সঙ্গীতগুলি অপূর্ব সুধানির্যাসে ভরপূর; কিন্তু গিরিরাজ হিমালয়, জননী মেনকা এবং তাঁহাদের আদরের তুলালী উমাকে অবলম্বন করিয়া এই গানগুলি গড়িয়া উঠিলেও এই সুধানির্যাস একান্তই মানুষের হৃদয়-মন নিঙড়ানো স্নেহ-প্রেমের নির্যাস। জননী মেনকা এখানে শুধু মা,—আমাদের মাটির ঘরের স্নেহপ্রেমের নির্ঝরিণী মা,—বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী গরীবের ঘরের মা। শরতের স্নিগ্ধ প্রভাতে ভিখারীর মুখে একতারার সুরের সঙ্গে যখন গান শুনি,—

আঁধার ক'রে ঘরের আলো
সত্য কি তুই চল্‌লি উমা!

তখন আমাদের মনটি উদাস হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় স্নেহ-সুনিবিড় পল্লীতে পল্লীতে; কত সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে চাপিয়া বুকের স্নেহধারায় বাড়াইয়া তোলে সোনার বরণী স্নেহের দুলালী শত শত উমাকে বাঙলার দীন-দরিদ্র মাতা-পিতা; বিবাহের পরের দিন সে যখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়, ঘরের প্রদীপ সেদিন সত্যই নিভিয়া যায়। বাঙলার দরিদ্র বাপ-মা,—বড় ঘরে

মন-মত বরে কন্যা সমর্পণ করিবার সাধ্য নাই,—চোখের জল আঁচলে মুছিয়া তাঁহাদিগকে কন্যা সমর্পণ করিতে হয় কপর্দকহীন, উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ বরের কাছে; তাই বৎসর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতেই মেনকার বুক কাঁদিয়া ওঠে। অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী সবেমাত্র শিশু-খেলা সাঙ্গ করিয়া সিঁথিমূলে সিন্দূরের অঙ্কন দিয়া অবগুণ্ঠনে চলিয়া গিয়াছে বৃদ্ধ বরের সঙ্গে দূর দেশে; উমাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া তাই মেনকার আর মুখে নাই ভাত—চোখে নাই ঘুম; স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় মা কাঁদিয়া উঠিত,—

উমা আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল॥

তখন জাগে প্রবোধহীন অনুরোধ—

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা বুঝি আমার কেঁদেছে।

আর যখন উমা ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন—

আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়।

রামপ্রসাদ যেখানে উমার শৈশব-লীলা বর্ণনা করিতেছেন,—

'গিরিবর, আমি আর পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন পান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥

অতি অবশেষে নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলাল আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥

আয় আয় মা মা বলি ধরিয়া কর-অঙ্গুলী
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি বলিলাম তায় চাঁদ কিরে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥

সেখানে মানুষী উমার মানুষী লীলাই আমাদের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে। বালিকা উমার অবোধ শিশুলীলার ভিতরেই এখানে জাগিয়াছে কত রহস্য, বিস্ময়, মহিমা! তাই তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহাদ্বারা আমরা সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছি। কিন্তু তথাপি লক্ষ্য করিতে হইবে, এখনও বাঙালীর ঘরের ছোট্ট মেয়েটিকে উমার বেশ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পিতামাতাকেও হইতে হয় গিরিরাজ আর মেনকা! তাহাদের আবরণহীন নিজস্ব রূপে এখন পর্য্যন্তও তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না। এই আবরণ খুলিয়া ফেলিতে এখনও যেন রহিয়াছে দ্বিধা এবং সঙ্কোচ।

এই যুগের সাহিত্যে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, সাহিত্যে দেবদেবীর আবির্ভাব থাকিলেও এবং ধর্ম্মের অনুসরণ—অন্ততঃ তাহার ঠাটটা বজায় থাকিলেও সাহিত্যের ভিতরে দেবদেবীগণের নিগ্রহাত্মক অত্যাচার এবং অনুগ্রহাত্মক

অত্যাচার দুই-ই লোপ পাইয়াছে। এখানে দেবদেবীর পাইতেছি শুধু প্রেমস্নিগ্ধ মধুর মূর্তি, মানুষের সঙ্গে তাহাদের যেটুকু সম্বন্ধ তাহাও এই মধুর সম্বন্ধ।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের ভিতরে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, মানুষের সাহিত্যের বিষয়-বস্তু মুখ্যতঃ মানুষ। জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিও সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কবি হিসাবে ঈশ্বরগুপ্তের সাফল্য সম্বন্ধে বহু মতভেদ থাকিতে পারে; তাঁহার আদিরসের আদিখ্যেতা হাস্যরসের স্থূলতা এবং অনুপ্রাস-যমকাদি শব্দালঙ্কারের সস্তা কবি-কৌশল তাঁহার কাব্যাস্বাদনে স্থানে স্থানে রতি অপেক্ষা হয়ত বিরতি আনে বেশী; কিন্তু সেই সঙ্গে এই জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়াও পারি না যে, বাঙলার হাটে বাজারে মেছোনীর ধামা আলো করিয়া থাকা 'তপসে মাছ' এবং বাঙলা ঘরের উৎসব 'পৌষ পার্বণ' তাঁহার কাব্যে সাহিত্যের বিষয়-বস্তুর সার্থক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই যে পৌষের পিঠাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ভিতরে পড়িয়া গিয়াছে একটা আনন্দ-কোলাহল এবং কর্মকোলাহল, তাহার ভিতর দিয়া একদিকে প্রকাশ পাইয়াছে যেমন পল্লীর সাধারণ ঘর-গৃহস্থের গৃহ-কোণে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, তরল ক্ষুদ্র আনন্দের ঢেউ,—অন্যদিকে আভাস রহিয়াছে পল্লীর দারিদ্র্যের,—গৃহিণীগণের সুকুমার অথচ আরক্ত অভিযোগগুলির। ইহারা

মানুষের জীবনের কোনও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘটনার কথা বলে না,—বড় কথাও ইহাদের ভিতরে কিছুই নাই, তবু তাহাদের একটা উজ্জ্বল মহিমা আছে; সে মহিমা ঈশ্বরগুপ্তের দৃষ্টিতে রহস্যঘন এবং আনন্দঘন হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাগুলিকে তাই আমরা বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্তম্ভবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

কবি হিসাবে ঈশ্বরগুপ্তের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে নবযুগের মানুষ হইয়াও তিনি খাঁটি দেশীয় কবি, এবং খাঁটি দেশীয় ধারার তিনিই শেষ কবি। 'খাঁটি দেশীয়' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ এই যে, তাঁহার কবি-মানসটি গড়া ছিল শুধু বাঙলার নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কার ও সংস্কৃতি দ্বারা, —তাঁহার কবি-মানসের প্রকাশভঙ্গিটিও ছিল বাঙলার নিজস্ব পদ্ধতি—তাঁহার ব্যবহৃত ভাষাও বাঙলার অন্তঃপুর, হাট-বাজার, মাঠ-ঘাটের ভাষা। পশ্চিমের আলোকপাতে তাঁহার ভাব বা ভাষার ভিতরে কোনও রঙ্ ধরে নাই। এ-কথাটি এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, আধুনিক বাঙলা-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমাদের একটা ধারণা, আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের গোড়াপত্তন পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবে। আমার মনে হয়, আধুনিক সাহিত্যের গোড়া-পত্তন পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবে নয়, গোড়াপত্তন কাল-প্রবাহে, সেই গোড়াপত্তনের উপর সৌধ নির্মাণ অনেকখানি পাশ্চাত্ত্য পরিকল্পনায়,—উপাদানও অনেক কিছু সংগৃহীত পাশ্চাত্ত্য

হইতে। আধুনিক যুগের যে গোড়াপত্তন করিয়াছে একটু একটু করিয়া কাল-প্রবাহ নিজেই, পশ্চিমের হাওয়া আসিয়া সেই ইতিহাসের ধীর-প্রবাহের উপরে সজোরে ধাক্কা দিয়াছিল,—তাহাতে আমাদের কাব্য-কবিতার গাঙে একেবারে বান ডাকিল। অনেকের ভিতরে এইরূপ একটা অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইউরোপীয় বণিক্ এবং ধর্ম্মযাজকগণের আবির্ভাব না ঘটিলে আমাদের গদ্য-সাহিত্য গড়িয়াই উঠিত না। বাঙলা গদ্য-সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার কাজে ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকগণের দান কিছুতেই অস্বীকার্য নয়,—তাই বলিয়া তাঁহাদের অনাগমনে এখনও পয়ার বা লাচাড়ী-প্রবন্ধে আমরা আমাদের সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত করিয়া চলিতাম এমন কথাও একান্ত অশ্রদ্ধেয়। কাল-প্রবাহের ভিতরে বীজাকারে উপ্ত ছিল গদ্য-সাহিত্যের সম্ভাবনা,—প্রকৃতির অযাচিত দানের ন্যায় পশ্চিমের আলো-হাওয়া, বাঙলার উর্বর ক্ষেত্রে তাহার সহৃদয় বর্ষণ এই বীজকে অতি অল্পকালের ভিতরে বাড়াইয়া তুলিয়াছে শাখায় পল্লবে, ফুলে ফলে। সাহিত্যের আধুনিকতার লক্ষণগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য সেই একই কথা। ভারতচন্দ্রের উপরে বা কবিওয়ালাদের উপরে কোনও অদৃশ্য রন্ধ্রপথে আসিয়া এক ঝলক পশ্চিমের আলোক পড়িয়াছিল এমন মতবাদ রচনা করিতে আশা করি কেহই উৎসাহিত হইবেন না; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি

এই সকল কবিদের ভিতর দিয়া কি করিয়া সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণগুলি ক্রমশঃ আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল। ঈশ্বরগুপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানের কবি হইলেও মূলতঃ তিনিও 'আদি এবং অকৃত্রিম' দেশীয় ধারারই কবি, অথচ অলঙ্কার-বাহুল্যে তিনি যতই প্রাচীনপন্থী বলিয়া মনে হোন, —দৃষ্টি তাঁহার নিবদ্ধ ছিল ধূলামাটির পৃথিবীর দিকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নানা শিক্ষা, সাহিত্য এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মারফতে বাঙালী পান করিতেছিল পাশ্চাত্ত্যের টাটকা সুরা,—তাহার কিছুটা অংশ নিজেকে প্রকাশ করিল একটা আত্মবিস্মৃত উদগ্র মত্ততায়,—আর বাকি অংশটা গ্রহণ করিল আমাদের জৈব প্রাণশক্তি, তাহার প্রকাশ প্রাচীরে ঘেরা আলো-বাতাসহীন প্রকোষ্ঠবাসীদের দেহ ও মনের একটা সতেজ নবীন স্বাস্থ্যবিধানে।

আমরা যেদিন প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যকর আহার্য গ্রহণ করি সেইদিন সেই মুহূর্তেই যে তাহার রসধারা আমাদের দেহ ও মনকে সতেজ করিয়া তোলে এমন নহে; স্বাস্থ্যকর আহারও মাত্রানুপাতে একটু আস্তে ধীরে গ্রহণ করিতে হয়, তাহাকে শক্ততীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা উত্তমরূপে চর্বণ করিয়া উদরের জারক রসে ধীরে ধীরে জারিত করিয়া লইতে হয়; তবেই সে আস্তে আস্তে রস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি রূপে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের দেহ ও মনকে পুষ্ট ও স্ফূর্তিযুক্ত করিয়া তোলে। পাশ্চাত্ত্যের দেওয়া বিবিধ

সামগ্রীকে এইরূপে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া হজম করিতে এবং তাহাদ্বারা ভাবে ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া লইতে আমাদের একটু দেরী হইল; পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে সজীব হইয়া নূতন সাহিত্য আমাদের গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক হইতে।

নব জাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রেরণাহেতু একথা স্বীকার করিতে আজ যতই কুণ্ঠাবোধ থাকুক না কেন, সত্যের মর্যাদা রাখিতে হইলে একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া এবং পাশ্চাত্ত্য জাতি সমূহের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া বিশ্বজীবন এবং বিশ্বমনের সহিত আমাদের বাঙালী-জীবন ও মনের একটা গভীর মিলন ঘটিয়াছিল; তাহার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনেও আসিল প্রসার, আমাদের চিত্তেরও ঘটিল প্রসার, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যেও আসিল প্রসার ও সমৃদ্ধি। ইহার পূর্বে আমাদের বাঙালী-জীবনটি যেন ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সমস্ত দিক দিয়াই বিরাট বিশ্বের নিরন্তর পরিবর্তনশীল আবর্তন হইতে রহিয়াছিল বিচ্ছিন্ন হইয়া। ঠিক যেন,—

"খাঁচার পাখী বলে, 'নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে'।"

রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন,—"যে জগতের মধ্যে বাস

সেটা সঙ্কীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বারবার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিবিড় হ'য়ে জমে উঠেছে, সেই সকল কঠিন সংস্কারের কঠিন ইটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানবব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চল্‌ছে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতন প্রথায় ও শাস্ত্র-বচনে চির-কালের মত স্থবির হয়ে ওঠে নি, তারমধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের ঘাত-সংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সঙ্কোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।" পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের রুদ্ধ-জীবনের ক্ষেত্রে বাতায়নের মত কাজ করিয়াছে,—এদিক ওদিক চাহিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি, আমাদের সীমাবদ্ধ পরিধির বাহিরে চলিয়াছে বিশ্বজীবনের কি বিরাট ঘূর্ণাবর্ত, এক মুহূর্ত তাহার বিরাম নাই,—কত সংঘর্ষ, সংগ্রাম এবং মিলনের ভিতর দিয়া রচিত হইয়া চলিয়াছে বিশ্বজীবনের ইতিহাস,—তাহার আবর্ত হইতে পাশ কাটাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার কাহারও অধিকার নাই,—সে চেষ্টাও আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। এই সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া গড়িয়া উঠিতে

লাগিল আমাদের জাতীয় জীবন—তাহারই ছায়া পড়িল আমাদের জাতীয় সাহিত্যে।

এই নব লব্ধ সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া আমরা আমাদের সম্মুখে, পশ্চাতে, ডাইনে, বাঁয়ে, ঊর্ধ্বে অধে তাকাইয়া কি দেখিলাম?—দেখিলাম দিকে দিকে মানুষের বিজয় মহিমা, কান পাতিয়া শুনিলাম মানবতার জয়ধ্বনি,—ধূলা-মাটির পৃথিবী, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মান-অপমান, প্রেম-অপ্রেম, শান্তি ও সংগ্রামে ভরা মানুষের জীবন—সে কত সুন্দর, কত কুৎসিৎ,—সকল সৌন্দর্য ও কুশ্রীতা লইয়া সে কত গভীর, অতলস্পর্শ। ঊর্ধ্বের স্বর্গ নামিয়া আসিয়া মিলিয়া গিয়াছে এই পৃথিবীর সঙ্গে,—ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণের স্পর্ধা সকলই দিন দিন মানুষ কাড়িয়া লইতেছে; জলবালা এবং বনবালাগণ জল এবং বন হইতে চলিয়া আসিয়া মানুষের প্রাসাদে ও কুটীরে ঠাঁই লইয়াছে; চারিদিক জুড়িয়া কত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দেশ, জাতির চলিতেছে নিরন্তর উত্থান ও পতন—কি বিরাট তাহার রূপ, কি গভীর তাহার মহিমা! আলো আঁধারের সহস্র স্ফুট-অস্ফুট বর্ণচ্ছটায় ভরা মন নামক ছোট্ট পদার্থটির ভিতরে নিহিত রহিয়াছে যেন অনন্ত কালের অসীম রহস্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগতের রহস্য যত বেশী উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, অন্তর্জগতের রহস্য যেন ততই বাড়িয়া যাইতেছে, চারিদিকে কি বিপুল

কর্মকোলাহল,—আবার প্রশান্ত বিরতি, কি ভীষণ মারিমারি ও হানাহানি—আবার কি গভীর স্নেহপ্রীতির বন্ধন। এই রহস্যময়ী পৃথিবী, এই বিস্ময়ে ভরা জীবন ছাড়িয়া অন্যদিকে *চোখ ফিরাইবার মানুষের সময় কোথায়?* এতদিন পরে ভবিষ্যদ্দর্শী কবির বাক্য একটা নূতন অর্থ লইয়া সার্থক হইয়া উঠিল,—

শুনহে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই॥

ধর্ম আমরা আমাদের জীবন হইতে বা সাহিত্য হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একেবারে দূর করিয়া দিই নাই,—কিন্তু এযুগের ধর্ম মানব-ধর্ম, সেখানে মানুষের কাজ-কারবার দেব-দেবীর সঙ্গে নহে,—পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন ভগবানের সঙ্গেও নহে,—সেখানে কাজকারবার মানুষে মানুষে। ভগবানকে খুঁজিয়া পাইয়াছি আমরা পাপ-পুণ্যে ভরা মানুষের অন্তরে অন্তরে; দেবত্বকে বণ্টন করিয়া লইয়াছি মানুষের শৌর্যে, বীর্যে, প্রেমে ও ত্যাগে! মনুষ্যত্বই তাই আজ দেবত্বের স্থান অধিকার করিয়া স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সংস্কার ও কিংবদন্তির ধর্ম,—পৌরাণিক কাহিনী আজ আর আমাদিগকে ভুলাইতে পারে না; মনের ভিতরে মাঝে মাঝে জাগিয়া ওঠে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতি-ক্রিয়া। মধুসূদনের রাবণ তাই grand fellow—সাবাস্

পুরুষ,—মেঘনাদ সত্য সত্যই 'ইন্দ্রজিৎ',—আর তাহাদের পার্শ্বে রাম-লক্ষণ হীন তস্কর—মহিমাহীন——ম্লানজ্যোতি,—বিভীষণ রামভক্ত বলিয়া পূজ্য নন, স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘৃণ্য। ইহাকে মধুসূদনের বিজাতীয় বা বিধর্মী মনোবৃত্তির কুফল বলিয়া নিন্দা করিলে চলিবে না,—ইহা নবযুগের ধর্ম। নবীন সেনের শ্রীকৃষ্ণ, অমিতাভ, অমৃতাভ, খ্রীষ্ট—সকলেই মানুষ—শৌর্যে-বীর্যে, জ্ঞানে গরিমায়, প্রেমে-ত্যাগে সার্থক মানুষ। হেমচন্দ্রের দধীচি মুনি তাহার বিরাট আত্মত্যাগে ইন্দ্রের মহিমা ম্লান করিয়া দিয়াছেন,—বঙ্কিম চন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ শারীরিক ও মানসিক সকল মনুষ্যগুণের পূর্ণতায় আদর্শ মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও মানুষের ধর্ম,—"প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।" এই মনুষ্য প্রীতিই স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্মের মূল-মন্ত্র,—এই মনুষ্য প্রীতিই রবীন্দ্রনাথের প্রচারিত ধর্মেরও মূলমন্ত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মনীষী কোম্‌ত ইউরোপের চিন্তাধারার ভিতরে আনিয়াছিলেন একটা নূতন সুর,—তাহাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যের পানে দৃষ্টি ফিরাইবার এবং নিবদ্ধ

রাখিবার সুর বলা যাইতে পারে। তিনি বলিলেন, আমরা যে বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত না সে সম্বন্ধে আমাদের কোন কিছু বলিবারও প্রয়োজন নাই, আমাদের মাথা ঘামাইবারও প্রয়োজন নাই। স্বর্গের এবং স্বর্গবাসীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছুই নিশ্চিত জানি না, ভগবান্ আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মস্তিষ্কের একটা জটিল দৃঢ় গ্রন্থিমাত্র, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধেও আমাদের মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই; রাজ্যের যত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া আমরা তর্কবিতর্কের কণ্টকাঘাতে নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিতেছি তাহারাও সবই অনিশ্চিত রাজ্যের বস্তু, সুতরাং জীবনের পক্ষে অপরিহার্য ত নয়ই,—একান্তভাবে পরিহার্য। আমরা নিশ্চিত করিয়া জানি আমাদের এই মাটির পৃথিবীকে, আর তাহার উপরের আমাদের সুখ দুঃখময় জীবনকে; সুতরাং আমাদের কায়-মন-বাক্যকে আমরা নিবদ্ধ রাখিব সম্পূর্ণরূপে এই নিশ্চিতের রাজ্যে এই প্রত্যক্ষের রাজ্যে। এই নিশ্চিত প্রত্যক্ষ জগতের সত্য যে মানুষ এতদিনে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে নাই তাহার কারণ আমাদের ভ্রম। আমাদের চিন্তাশক্তির ক্রমবিবর্তনের ভিতরে কোম্‌ত তিনটি প্রধান স্তর বিভাগ করিয়াছেন। চিন্তার আদিম যুগ হইতেছে ধর্মের যুগ বা কাব্যের যুগ। এযুগের বিশেষ লক্ষণ এই যে এযুগে মানুষ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারটিকে মনুষ্যধর্মের প্রতিচ্ছায়ায়ই দেখিয়াছে এবং ব্যাখ্যা করিয়াছে;—ফলে

প্রাকৃতিক অধৃষ্য এবং অদৃশ্য সমস্ত শক্তিকে সে রূপ দিয়াছে অসংখ্য দেবদেবীর এবং সবার উপরে স্থাপন করিয়াছে এক সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে ; জলাশয়গুলিকে সে ভরিয়া দিয়াছে জলবালা দ্বারা, বন ভরিয়া দিয়াছে বনদেবতায়, অন্তরীক্ষ ভরিয়া দিয়াছে পরী এবং তজ্জাতীয় অসংখ্য অবাস্তব প্রাণীর দ্বারা। ইহাদ্বারাই গড়িয়া উঠিয়াছিল মানুষের ধর্ম ও সাহিত্য। তাহার পরে আসিল দার্শনিক চিন্তার যুগ, তখন হাজারো রকম যুক্তিতর্কের সাহায্যে মানুষ উর্ণনাভের ন্যায় তৈয়ারী করিতে লাগিল মনগড়া তত্ত্বের ; সে তত্ত্বের ভিতরে জীবন বা জগতের কোন সত্যই আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না,—কারণ জীবন বা জগতের নিশ্চিত বাস্তব রূপটির সহিত এই সকল বিবাদাত্মক মতবাদগুলির ছিল না কোনই যোগ। মানুষের চিন্তার প্রসারের ফলে এখন আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি বৈজ্ঞানিক যুগে। এ যুগে সত্য লাভের যথার্থ উপায় হইবে গাণিতিক উপায়, এবং সে সত্যলাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে এই জীবনকে পূর্ণ পরিণতি দান। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হইতে আহৃত সত্যের ভিতরে একটা নিগূঢ় সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাকে নিয়োজিত করিতে হইবে ঐহিক জীবনের সর্ববিধ মঙ্গল বিধানের জন্য। এ যুগে পৃথিবী ছাড়া স্বর্গ নাই, মানুষ ব্যতীত দেবতা নাই, মঙ্গলের আলোক ব্যতীত জ্যোতি নাই। বিরাট অখণ্ড মনুষ্যত্বকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া

তোলা এবং মঙ্গলের আলোকে তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলা ইহাই মানুষের একমাত্র ধর্ম,—'মানব-ধর্ম'ই মনুষ্যের ধর্ম,—আর কোন ধর্ম নাই।

দার্শনিক হিসাবে কোম্‌ত ইউরোপে খুব প্রাধান্য লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তায় তাঁহার দান অনবদ্য। এই নিশ্চয়বাদ বা positivism-এর পর হইতেই কার্যতঃ ইউরোপীয় চিন্তাধারা মর্ত্যের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল; সুতরাং এইখানেই আমরা দেখি মূল সুরের একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন; এই পরিবর্তনের ঢেউ শুধু ইউরোপের তটেই আঘাত করে নাই,—সুদূর প্রাচ্যেও লাগিয়াছিল সেই সাগরপারের দোলা, আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনেকেই হইয়াছিলেন কোম্‌তের প্রায় মন্ত্রশিষ্য। কোম্‌ত এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষিত বাঙালীর মন।

একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, দেবতা ছাড়িয়া আমাদের প্রথম যখন দৃষ্টি পড়িল মানুষের দিকে তখন আমরা বাছিয়া বাছিয়া আশ্রয় করিলাম খুব বড় বড় মানুষকে, এই বড়ত্বের পরিচয় সর্বদাই অন্তরের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে নয়,—বাহিরের ঐশ্বর্যের মহিমাও কম নয়। স্বর্ণময় কিরীটে কুণ্ডলে,—বহুবিচিত্র এবং জমকালো পোষাকে

পরিচ্ছদে রাজদণ্ড হস্তে স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট পুরুষটি পর্বত খুঁড়িয়া পথ বাহির করিবার দিনমজুরটি অপেক্ষা যে অনেক বড় পুরুষ ইহা তখন আমাদের একটা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের পশ্চাতেও রহিয়াছে সেই একই দৃষ্টির দৈন্য, যে দৈন্যের ফলে দেবতার কাছ হইতে হাসিমুখে বসিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি বহুযুগ ধরিয়া লাঞ্ছনা। রাজা যে তাঁহার রত্নখচিত বহিরাবরণটিকে ডাইনে বাঁয়ে অনেকখানি বাড়াইয়া দেন তাহার ভিতর দিয়া এককালে তাঁহার ব্যক্তিপুরুষটিকেও আমরা যেন দেখিতে পাইতাম অনেকখানি বাড়ান। আমাদের সাহিত্যেও তাই কিছু-দিন চলিল রাজা-বাদশাহ, উজীর-ওমরাহের যুগ,—তাহারই আওতায় জাগিয়া উঠিত দুই-একটি প্রধান প্রধান চরিত্র। এই করিয়াই গড়িয়া ওঠে সকল সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি। এজাতীয় উপন্যাসগুলির অন্য যতই গুণ থাকুক না কেন, আজকাল আমাদের চোখে পড়িতেছে ইহাদের একটা মৌলিক দুর্বলতা; সে দুর্বলতা এই যে, যে জীবনটি আমরা উপন্যাসে আঁকিতে চাহিতাম তাহাকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই যে শ্রদ্ধার্হ এবং গৌরবান্বিত করিয়া তোলা যায় এই বিশ্বাসের ছিল অভাব, তাই সাধারণ জীবনকে ঘোরাল করিয়া জম-জমাট করিয়া তুলিতে হয় ঘটনাচক্রের পাকে তাহাদিগকে রাজ-রাজাদের দরবারী জীবনের সহিত প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে যুক্ত করিয়া।

ব্যক্তিজীবন বা পারিবারিক জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া লইতে হয় রাষ্ট্র-জীবনের পটভূমিকার ছায়ায় রাখিয়া।

কিন্তু 'মরিয়া না মরে রাম'!—রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ মরিয়া ভূত হইয়া দেখা দেয় জমিদার-তালুকদার এবং তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের রূপে। জীবন সম্বন্ধে স্বাধীন সত্যদৃষ্টিটি যেন ঢাকা রহিয়াছে সংস্কারের ঠাসাবুনাট সাতটি পর্দার আড়ালে,—তাহার পশ্চাতে স্বমহিমায় ভাস্বর হইয়া শোভা পাইতেছে অনন্ত রহস্যে জীবন-দেবতা। একটু একটু করিয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে আমাদের সংস্কারের বন্ধন—দৃষ্টি যত লাভ করিতেছে মুক্তি, তত লাভ করিতেছে প্রসার। দেবদেবী ছাড়িয়া রাজা-বাদশাদিগের উপরে ভর করিয়াছিলাম,—আর একটু নামিয়া ধরিয়াছিলাম উজীর-ওমরাহের দল,—তারপরে ধরিয়াছিলাম জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি ভূঞাশ্রেণীর মানুষ,—তারপরে অবলম্বন করিলাম রাজধানী কলিকাতার অন্তর্গত তিনতলা বাড়ীতে বাস এমন সব জাঁদরেল জাঁদরেল জীব; কিন্তু আজ দেখিতে পাইতেছি তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর ত্রিকোণাবর্ত প্রেমের বিলাস হইতে, তাহাদের সৌখীন সুখ-দুঃখের ইতিহাস হইতে ঘুঁটেওয়ালীদের লিমিটেড্ কোম্পানিটির ইতিহাসটিই বা ছোট কিসে? 'বাদশাজাদী প্রেম জানে না' কি জানে সে কথা অনিশ্চিত, কিন্তু যে কাবুলিওয়ালাটির ময়লা ঢিলা জামার নীচে বুকের কাছে ছিল তাহার সুদূর

পার্বত্য গৃহনিবাসিনী কন্যাটির হাতের ছাপ সে নিশ্চয়ই প্রেম জানে; 'মহেশে'র বিরহে 'আমিনা'র হাত ধরিয়া ভিটামাটি ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া অজানা পথে নিরুদ্দিষ্ট হইল যে দীনদুঃখী গফুর মিঞা, সে নিশ্চয়ই প্রেম জানে। শহরের কর্দমাক্ত উপকণ্ঠে শূকরছানা পরিবেষ্টিত হইয়া তালপাতার মঞ্চাকৃতি কুড়ে ঘরে বাস করে যে মিশ্‌মিশে কালো সাঁওতালি মেয়েটি তাহার জীবনের রহস্যই কি কম! সাপ খেলিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায় যে বেদে-বেদিনী তাহাদের যাযাবর জীবনের অনিশ্চিত যাত্রা যে মন ভরিয়া তোলে অসীম বিস্ময়ে,—ভাঙা ছিপ্ নৌকায় নঙ্কাপোড়া আর জলদেওয়া ভাত এবং তামাকুর সরঞ্জামসহ শ্রাবণ রাত্রে ইল্‌সে জাল লইয়া জেলের যে ভরাগাঙে অভিযান, মানুষের অনন্ত জীবন-লীলা হইতে সেই-ই বা একেবারে বাদ পড়িবে কেন? আমাদের দৃষ্টি এখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে জীবনের আনাচে-কানাচে, জগদ্ব্যাপারের কোন ক্ষেত্রেই কৌতূহলের আর অন্ত নাই। আর এই কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গেই জাগিতেছে বুকভরা শ্রদ্ধা ও অসীম সহানুভূতি; মানুষের মহৎ গুণগুলিকে যেমন করিতে শিখিয়াছি শ্রদ্ধা, মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি তেমনই আকর্ষণ করে আমাদের হৃদয়ের দরদ, প্রেমের দানে ভরিয়া তুলি মানুষের দৈন্যকে। জীবনবেদের পাতায় পাতায় লেখা রহিয়াছে যে অসংখ্য কাব্যকবিতা তাহা পড়িয়াই মানুষ শেষ করিতে পারিতেছে

না,—মানুষের মুখে তাই মুখরিত হইয়া উঠিতেছে আজ জীবনের বন্দনা। বাস্তব জীবনের সহিত এই যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং নিবিড়তম বন্ধন, ইহাই সাম্প্রতিক সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ।

মানুষের জীবনের ক্রমবিবর্তন একটা অখণ্ড স্বাধীনতার সংগ্রাম, সাহিত্যের পৃষ্ঠায় রহিয়াছে সেই অভিযানের ইতিহাস। স্বর্গের দাসত্ব মানুষ যেমন একটু একটু করিয়া অস্বীকার করিয়াছে, মর্ত্যের দাসত্বকেও সে তেমনই করিয়া অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু মর্ত্যের দাসত্ববন্ধন স্বর্গের দাসত্ববন্ধম হইতে অনেক দৃঢ়—অনেক কঠিন। সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক আর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেই হোক, আধুনিক যুগের লক্ষণ কি এ প্রশ্নের যদি এক কথায় জবাব করিতে হয় তবে বলিব,—তাহা মুক্তির সন্ধান।

বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যের আদর্শবাদ

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে ক্রমেই একটি মতবাদ গড়িয়া উঠিতেছে যে, তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি অনেকখানি সংস্কৃত সাহিত্যের ভট্টিকাব্যেরই সহোদর—অন্ততঃ জ্ঞাতিভাই; অনেকখানিই যেন নীতি উপদেশের কুইনাইনকে সাহিত্যরসের শর্করা-মণ্ডিত করিয়া সাধারণের সম্মুখে আনিয়া ধরা, উদ্দেশ্য মনুষ্য-সমাজের সর্ববিধ অমঙ্গল রোগের নাশ। মতবাদটি নানা দিক দিয়া বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। সাহিত্য-সমালোচনা করিতে বসিয়া এবং সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বারবার অতি স্পষ্ট ভাষায় এবং দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন, যে সাহিত্য সত্য শিব এবং সুন্দর এই তিনেরই উপাসক; ইহার ভিতরে সুন্দরের স্থানই ঊর্ধ্বে হইলেও সত্য এবং শিবকে বাদ দিয়া সাহিত্য কখনও সম্পূর্ণ নহে। এ-কথা বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, মঙ্গলের আদর্শ হইতে বিচ্যুত যে সাহিত্য-সৃষ্টি তাহাকে তিনি পাপ মনে করিতেন। সাহিত্য সম্বন্ধে এই জাতীয় একটি মতবাদ আজিকার দিনে আমাদের সৌন্দর্য-বোধকে স্বভাবতঃই একটু ক্ষুন্ন করে এবং আমরা ইতিমধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের রসবোধের গভীরতা এবং সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে নানা

প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের বর্তমান যুগের সৌন্দর্যবোধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য-বোধ সম্বন্ধে একটু বিচার-বিশ্লেষণের দরকার।

সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ কি এবং নীতিজ্ঞান বা মঙ্গলের আদর্শের সহিত তাহার সম্পর্ক কোথায় এবং কতটুকু, সাহিত্যের আদিম জন্ম-লগ্ন হইতে আজ পর্যন্ত এ সমস্যাটি সাহিত্যের পিছনে লাগিয়াই আছে; এবং এআশা আমরা কোন দিনই করিতে পারি না যে, সাহিত্য-রূপ একটি পদার্থের অস্তিত্ববোধ হইতে এই উপসর্গটিকে অনাগত কোন কালেও একেবারে মুছিয়া ফেলা যাইবে। সুতরাং সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ বা মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামতের মহাভারত সঙ্কলন করিয়া লাভ নাই। এখানে শুধু আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাহিত্যের তরফ হইতে প্রধান অভিযোগটি কি এবং সেই অভিযোগের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ হইতেই বা কি জবাব দেওয়া যাইতে পারে, তাহারই একটা বোঝাপড়া করা দরকার।

আজকাল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের ভিতরে আদর্শ-বাদের অনধিকার প্রবেশ করাইয়া সাহিত্যের সৌন্দর্য ও রসের স্বরূপকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন; এবং তিনি শুধু যে যুক্তিতর্ক দ্বারাই সাহিত্যের স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য জন্মাইয়াছেন তাহা নহে; তিনি তাঁহার সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির ভিতরেই এই আদর্শবাদের

নীতিকে অনুসরণ করিয়াছেন,—ফলে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির শিল্প-মাধুর্য পদে পদে তাঁহার নীতিজ্ঞানের অভিভাবকত্বে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরে আর্টের যে অপমান তাহা তাঁহার অক্ষমতার জন্য নহে ;—নৈতিক চর্চার বাড়াবাড়িতে অনেকখানি স্বেচ্ছাকৃত।

সাহিত্যের যে আদর্শটিকে মাথায় করিয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটি দায়ের করিতেছি, সে আদর্শটি হইতেছে Art for Art's Sake—বা 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই মতবাদ। কিন্তু এই 'আর্টের জন্য আর্ট' ব্যাপারটি যে কি বস্তু, সেই কথাটিই স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া ওঠা যাইতেছে না। ইহাকে নৈয়ায়িক পন্থায় বিচার করিলে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের সৌন্দর্য-বোধের সত্তাটি অপর সকল বোধ-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র বস্তু ;—সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু সৌন্দর্য-বোধের এই স্বাতন্ত্র্য এবং আত্ম-পরিপূর্ণত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি ? তাহার অর্থ যদি এই হয় যে, সে তাহার আত্ম-প্রকাশের জন্য অন্য কোন জাতীয় বোধেরই কোনও অপেক্ষা রাখে না, তবে সাহিত্যের সেই নিরপেক্ষ স্বরূপের ভিতরে আমরা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বৃহত্তর সমস্যার ভিতর পড়িয়া যাই। মনের রাজ্যে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই, সেখানে একান্ত নিরপেক্ষ কোন বোধশক্তি নাই,—সকলেই পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে ; যাহাকে আমরা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য বলিয়া ভুল

করিতেছি, তাহা আপেক্ষিক প্রাধান্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমাদের মনোরাজ্যটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিব, সেখানে প্রত্যেকটি বোধ প্রত্যেকটি বোধের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া আছে; তাই 'আর্টের জন্য আর্ট' কথাটি মূলতঃই ভুল। আমাদের মনের মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যে, আমাদের রসবোধ বা সৌন্দর্যানুভূতি যখন সম্রাটের বেশে বাহির হইল, তখন অন্য সকল বোধগুলিকে একেবারে নিঃশেষে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য অন্ধকার গারদে পুরিয়া রাখি। রসবোধ যখন রাজার ন্যায় রাজপথে বাহির হয় তখন তাহার আগে পিছে বহু জাতীয় বহু বোধের শোভাযাত্রা চলিতে থাকে; সেখানকার মন্ত্রী সেনাপতি এবং সৈন্যসামন্ত সকলের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া বা সকলকে বিদ্রোহী করিয়া রাজা একেবারে অচল।

আসল কথা এই,—আমরা যেখানে আর্টের চর্চা করিতে বসি—সৃষ্টির ভিতরেই হোক বা আস্বাদনের ভিতরেই হোক—তখন আমাদের সৌন্দর্যবোধটিই প্রবল থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া তখনকার জন্য যে আমরা আমাদের ধর্মবোধ, নীতিবোধ, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বোধগুলিকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি তাহা নহে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের এই জাতীয় সূক্ষ্ম এবং উচ্চ বোধগুলি একেবারে মৌলিক নহে;

অথবা আদিতে মৌলিক হইলেও তাহারা সাধারণতঃ একটা জটিলতম যৌগিকরূপেই আত্ম-প্রকাশ করে। নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বোধের বিচিত্র সমাবেশে আমাদের মনের মধ্যে আপাতস্বতন্ত্র এক একটি বোধ জাগিয়া ওঠে। এইভাবে আমাদের ধর্ম ও নীতিবোধের ভিতরে আমাদের রসবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে,—আবার আমাদের রসবোধ এবং সৌন্দর্যানুভূতির ভিতরেও আমাদের ধর্মবোধ, মঙ্গলের বোধ প্রভৃতি জীবনের সকল উচ্চতর বোধগুলিই সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া থাকে। ফলে সৌন্দর্যানুভূতির সময়ে আমরা তাহাকে কিছুতেই আমাদের অন্যান্য বোধগুলি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারি না,—তাহা মনোবিজ্ঞানের দিক হইতেই অসম্ভব।

পূর্বেই বলিয়াছি, মনোরাজ্যে এই বোধগুলিকে সর্বদাই মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে হয়, তাই সর্বদাই ইহাদের ভিতরে চাই সঙ্গতি। কোনও বিশেষক্ষেত্রে আমাদের নীতিবোধ হয়ত সৌন্দর্যবোধের নিকট মাথা নোয়াইয়া দিতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্যবোধ যদি সগর্বে নীতিবোধের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিতে বসে, বা তাহার অস্তিত্বকে কোনও অবমাননার ভিতরে টানিয়া আনে, সেখানে মনোরাজ্যে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। যে দৃশ্য বা ঘটনা সত্যই আমাদের নীতিবোধকে আঘাত দেয়, সে যে কখনও আমাদের নিকট সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে, এই কথাটাই মূলতঃ মিথ্যা।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে যেমন এই কথা, নীতিজ্ঞান সম্বন্ধেও তেমনই একই কথা; অর্থাৎ যে জিনিস সত্য সত্যই আমাদের সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধের একান্ত পরিপন্থী সে কখনই আমাদের নিকটে মঙ্গলের উজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে না। আমাদের মনটিকে আমরা একটি বীণা যন্ত্রের সহিত তুলনা করিতে পারি। মূল তারেই ধ্বনিয়া ওঠে সঙ্গীত; কিন্তু সেই মূল তারের সহিত অন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারগুলির যদি একটি সুসঙ্গতি না থাকে, তবে মূল তারের সুর বিচিত্র ঝঙ্কারে মনোরাজ্যকে ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে না,—মন জুড়িয়া সেখানে জাগিয়া থাকে শুধু একটা অসঙ্গতির বেদনা।

সুতরাং দেখিতেছি, সর্বক্ষেত্রেই মনের বৃত্তিগুলির ভিতরে একটা সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য একান্তই প্রয়োজন, নতুবা মনের মধ্যে একটা বেসুরের বেদনা আমাদের কোন বোধকেই সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট হইতে দেয় না। আর্টের ক্ষেত্রেও নীতির সহিত চাই একটি সূক্ষ্ম সঙ্গতি,—নতুবা অসঙ্গতির বেদনা লইয়া সে সুন্দর হইয়া উঠিতেই পারে না। আমরা আজকাল যেখানে আর্ট ও নীতিজ্ঞানকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছি, এবং বাস্তব কলুষ এবং বীভৎসতাকেও আর্টের মোহিনী স্পর্শে সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিতেছি, সেখানকার প্রকৃত সত্যটি এই যে, আর্ট সেখানে আমাদের বর্তমান নীতিজ্ঞানের সহিত সঙ্গতি

লাভ করিয়াছে, এবং এই জন্যই সে আমাদের নিকট সুন্দর। পতিতালয়ের কাহিনী দিয়া আমরা যেখানে আর্টের আসর জমাইয়া তুলিতেছি, সেখানে বুঝিতে হইবে পতিতার জীবন সম্বন্ধেই আমাদের পূর্ব ধারণা অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে; পতিতা সেখানে ঘৃণ্য, কদর্য হইয়া ওঠে নাই,—সে আমাদের কৃপার পাত্র, আন্তরিক সহানুভূতির আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে; এবং এই জন্যই তাহার জীবন আমাদের আর্টেও সুন্দর হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্যে যে আজকাল সমাজের বিরুদ্ধে নানা-প্রকারের অভিযান তাহা যে নিতান্তই আর্টের খাতিরে তাহা নহে, তাহার পশ্চাতে আছে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ। কোন দৃশ্য বা ঘটনা যদি আমাদের নিকটে সত্য সত্যই বাস্তবে জঘন্য বা বীভৎস হইয়া উঠিয়া থাকে, আর্টের গঙ্গাজল ছিটাইয়াই তাহাকে সুন্দরের কোঠায় কিছুতে পৌঁছাইয়া দিতে পারি না। তাই মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের আর্ট সম্বন্ধে যে মতবাদের অমিল রহিয়াছে, তাহার কারণ অনেকখানি রহিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের নীতিবোধ এবং অত্যাধুনিক যুগের নীতিবোধের সহিত বৈষম্যে। শরৎচন্দ্রের নীতিবোধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবোধ যদি একই থাকিত তবে 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের নিকটেই কিছুতে সুন্দর হইয়া উঠিতে পারিত না।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই সাম্যের গান গাহিয়া গিয়াছেন, আর্টের ক্ষেত্রেও তিনি সেই সমন্বয়বাদের

প্রচারক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আর্ট হইতে নীতি-জ্ঞানকে বা নীতিজ্ঞান হইতে আর্টকে কখনই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না,—তাই উভয়েরই স্ফুরণের জন্য এবং পূর্ণ পরিণতির জন্য উভয়ের ভিতরেই চাই সঙ্গতি। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে, সৌন্দর্যবোধের ভিতরে যে নীতিজ্ঞান, তাহাকে থাকিতে হইবে যবনিকার অন্তরালে; কিন্তু সৌন্দর্যবোধের ভিতরে সেই নীতিজ্ঞানই যদি প্রধান হইয়া ওঠে এবং নীতিজ্ঞানের দ্বারাই যদি আর্ট মুখ্যতঃ পরিচালিত হয়, তবে সেখানে যে আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যক্ষেত্রে সুন্দরই সত্য এবং শিব হইতে প্রধান; সাহিত্যে যেখানে ইহার ব্যত্যয় ঘটে সেখানেই তাহার বিরুদ্ধে আইনতঃ অভিযোগ আনিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে এই জিনিসটি যে কোথায়ও ঘটে নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। আর্টের ক্ষেত্রে আদর্শবাদের একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিলে আর্ট অব্যাহত থাকিতে পারে না। রসজ্ঞ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র এ-জিনিসটি জানিতেন এবং তিনি নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে নীতি এবং ধর্মের আধিপত্য আর্টের ক্ষেত্রে ক্রমেই অসঙ্গত হইয়া উঠিতেছে। এই জন্যই 'সীতারাম' রচনার পরেও কয়েক বৎসর কাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেও তিনি আর কখনও নূতন করিয়া সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে হাত দেন

নাই। সুতরাং আর্টের ক্ষেত্রে আদর্শবাদের স্থান দেওয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যে অ-রসিকের কাজ হইয়াছে একথা বলা যায় না; আর্টের ক্ষেত্রে আদর্শবাদকেই যেখানে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সেখানেই আমাদের সত্যকার অভিযোগ।

সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকস্থলেই শাসক এবং প্রচারকের রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই প্রচার কার্যের দ্বারা—সাহিত্যের এই উদ্দেশ্যমূলক নীতিদ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের আর্ট কতখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বা না হইয়াছে, সে বিচার আমরা পরে করিব। বর্তমানে বিচার্য এই, আর্টের সহিত প্রচার-কার্যের সম্পর্ক কতখানি, এবং ইহার সীমাই বা কোন্‌খানে। এখানে তথা-কথিত রিয়ালিষ্ট বা বাস্তববাদীরা বলিবেন, আর্টের ক্ষেত্রে প্রচারের প্রবেশ একান্তই অনভিপ্রেত অনধিকার প্রবেশ। সংসারে কি ভাল কি মন্দ তাহা বুঝাইয়া সৎপথে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে, সাহিত্যকেও ইহাদের প্রচারের কার্যে নিযুক্ত করিয়া লাভ কি? কিন্তু আর্ট সৃষ্টির ব্যাপারটিকে একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাইব, এখানকার যে ভুল তাহাও মূলের ভুল। বাস্তববাদ কথাটিতে যে সত্য কি বুঝায় তাহা বুঝিয়া উঠাই ভার। বাস্তববাদ বলিতে যদি আমরা ইহাই বুঝি যে, সাহিত্যের কাজ হইতেছে বাহিরের বস্তুকেই একেবারে যথাযথ আনিয়া

অক্ষরের মারফতে সকলের সম্মুখে ধরা, তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, সে কাজটি একটি জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা একখানি ফটোগ্রাফের প্লেটই সবচেয়ে বেশী নিখুঁত ভাবে করিতে পারে ; তবে আর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য একটা বিরাট জীবন্ত প্রতিভার প্রয়োজন কোথায় ? নিজের মনের রং তাঁহার সৃষ্টির ভিতরে মাখিয়া দেওয়া যদি সাহিত্যিকের একটা দুরপনেয় কলঙ্ক হয়, তবে আর্ট বস্তুটিই যে দাঁড়াইতে পারে না ; কারণ, আর্টের যে সত্য সে শিল্প-স্রষ্টার মনো-রাজ্যের সত্য,—এবং সাহিত্যের মাপকাঠিতে এই মনো-রাজ্যের সত্যটিই বাস্তব সত্য হইতে অনেক বড়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর্টের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকেও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। সৃষ্টির পূর্বে আমাদের অন্তরে জাগে কোন বস্তুর অবলম্বনে একটি তীব্র ভাবাবেগ। এই ভাব-সম্বেগের ভিতরে আমাদের আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাবের বাস্তব সত্তাটিই যে একটি প্রকাণ্ড জিনিস তাহা নহে ; বহিঃপ্রকৃতি হইতে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মূল্য সেখানে কিছু কম নহে। বহির্বস্তু একটি আলম্বন মাত্র,— তাহাকে কোনও একটি ভাবরূপ দেয় আমাদের অন্তর। এই 'অন্তঃ-করণে'র দ্বারা বহির্বস্তুকে যদি আমরা ভাবরূপে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে না পারি, তবে শুধু বহির্বস্তুর স্তূপী-করণে কোনও সাহিত্য গড়িয়া ওঠে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বহির্বস্তুকে আমরা আর্টের আলম্বনরূপে যখন

আন্তরে ধারণ করি তখনই আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি-দ্বারা তাহাকে একটি নবীন ভাবময় রূপ দান করিয়া লই; এ-রূপটি সাহিত্যিকের নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুর এই আন্তর সত্তাকে আমরা যখনই আবার বাহিরে রূপায়িত করিয়া তুলি, তখনই তাহার সহিত আমাদের সকল ভালমন্দ-বোধ মিশিয়া যাইতে বাধ্য।

মোট কথা আমরা যখন কোনও সৃষ্টিকার্যে হাত দেই, তখন সেই শিল্পসৃষ্টির ভিতরেই আমাদের নীতিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি অচ্ছেদ্য ভাবে মিশিয়া থাকে। অল্পের ভিতরে হয়ত তাহাকে ধরা যায় না—কিন্তু আর্ট সৃষ্টির ক্ষেত্র একটু প্রসার লাভ করিলেই এ জিনিসটি স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। আমরা যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন উপন্যাস বা সেই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কথাই ধরা যাক। সেক্স-পিয়রের ইয়াগো চরিত্রের নিপুণ অঙ্কনে যে আর্ট সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ভিতরে ভালমন্দ প্রভৃতি নৈতিক বিচারের স্থান কোথায়? কিন্তু এই বিশেষ একটি চরিত্রকে না ধরিয়া সেক্সপিয়রের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিকে যদি আমরা আলোচনা করিতে বসি, সেখানে কি আর্টসৃষ্টি ব্যতীত জীবনের কোন সত্য বা তত্ত্বকেই আমরা লাভ করি না? বাঙলা-সাহিত্যে নিপুণ বাস্তববাদী বলিতে আমরা আজকাল সাধারণতঃ শরৎচন্দ্রকেই মনে করিয়া থাকি। এই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে আমরা কি পাইয়াছি? শুধু কি নিরালম্ব আর্টের মাধুর্য?

জীবনের ভালমন্দ সম্বন্ধে কি তিনি কোন কথাই বলেন নাই? তাঁহার সাবিত্রী-সতীশ, বিজয়া-নরেন, রমা-রমেশ, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত প্রভৃতি সকলেই কি শুধু বাস্তবের ফোটো-গ্রাফ? আজ যে শরৎচন্দ্র নবীন বাঙলার চিত্তজয় করিয়া বসিয়া আছেন, সে কোন্ গুণে? শুধু কি আর্ট সৃষ্টির জন্য? সেই আর্টের মধুর রসে সিক্ত করিয়া মানুষের জীবনের নীতি সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে অনেক কথা শুনাইয়াছেন,—অনেক কথা বুঝাইয়াছেন,—মানুষের জীবনের দিকে তিনি আমাদের একটি নূতন অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন; ইহাই ত নীতি শিক্ষা;—'সদা সত্য কথা কহিবে' এই নীতিশিক্ষা অপেক্ষা জীবনের মূলনীতির পরিবর্তন—তাহার গভীর গহনে আলোকপাত এবং সত্যের আবিষ্কার ইহা যে আরও গভীর নীতিশিক্ষা। সাহিত্যের মারফতে এই নীতিশিক্ষা—এই প্রচার কার্যকে আমরা রসবোধের অনুরোধে যে বরদাস্ত করি নাই তাহা নহে; আর শুধু যে কোনও রূপে নাক মুখ বুজিয়া বরদাস্তই করিয়া গিয়াছি তাহাও নহে,—আমরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সাদর অভিনন্দনে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। তাই শরৎচন্দ্র আজ আমাদের নিকটে শুধু নিপুণ কলাবিদ্ রূপে পূজ্য নন,—তিনি সংস্কারকরূপেও আমাদের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যত সাহিত্যিক সমালোচনাই হইয়াছে, সেখানে তাঁহার আর্টের সহিত তাঁহার সমাজসংস্কারের কথা

ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে,—আর্ট এবং নীতি সেখানে একেবারে হরিহরাত্মা!

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আর্টের ভিতর দিয়া নীতি প্রচার করিয়াছেন, অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি আর নিকৃষ্ট না হইয়া যায় না, একথা অযৌক্তিক এবং অশ্রদ্ধেয়। আসল কথা হইল এই, প্রত্যেক বড় সাহিত্যিকেরই জীবন সম্বন্ধে একটি নিজস্ব দর্শন আছে। ইহার কতকখানি তাহার অন্তর ধাতুর মধ্যেই অনুস্যূত, কতকখানি তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ। জীবন সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টি ব্যতীত কখনও আর্ট সৃষ্টি হইতে পারে না,—আর জীবনের এই ভাবদৃষ্টির ভিতরেই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মিশিয়া থাকে আমাদের শ্রেয়োবোধের অসংখ্য আলোকচ্ছটা। এই ভাবেই আমাদের সৌন্দর্যবোধ আমাদের শ্রেয় এবং প্রেয়োবোধের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে। আমরা বাহির হইতে তাহাদের ভিতরে যে অহি-নকুলের সম্পর্ক স্থাপন করিতেছি উহা অনেকখানিই কাল্পনিক।

কিন্তু সমস্যা এই, আর্টের ভিতরে এই নীতি প্রচারের স্থান কতটুকু এবং তাহার সীমা কোথায়। ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যের লক্ষণের ভিতরে সর্বদাই 'উদ্দেশ্য'কে স্বীকার করিয়াছেন এবং সংস্কৃত আলঙ্কারিক গ্রন্থে অনেক স্থলে সাহিত্যের ফল-শ্রুতির ভিতরে চতুর্বর্গের লোভ দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের ভিতর এই 'উদ্দেশ্যে'র স্থান কোথায়

এবং কতটুকু সে সম্বন্ধে 'কাব্য-প্রকাশ'কার মম্মট ভট্টই একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—সাহিত্যের ভিতর যে উপদেশ থাকিবে তাহা 'কান্তা-সম্মিত',—কান্তা-সম্মিততয়োপদেশযুজে'। স্বামি-সোহাগিনী নারী যেমন তাহার সমস্ত সৌন্দর্য এবং প্রেম-মাধুর্য দ্বারাই স্বামীর চিত্তকে জয় করিয়া লয় এবং প্রেমবশবর্তী স্বামীকে তাহার জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নিজের অভিপ্রায়মুখী করিয়া তোলে, আর্টও তেমনই তাহার সৌন্দর্য ও রস-মাধুর্যের দ্বারাই আমাদের চিত্ত জয় করিয়া জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমাদিগকে মঙ্গলের পথে চালিত করিবে। এই প্রসঙ্গে 'কাব্য-প্রকাশে'র টীকায় শব্দকে ত্রিবিধ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা, প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত এবং কান্তা-সম্মিত। প্রভুসম্মিত বাক্য প্রভুর ন্যায় দণ্ড ধরিয়া আমাদিগকে মঙ্গলের পথে চালিত করে; যেমন, বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি। তারপরে সুহৃদ্ যেমন কোনও কর্তব্যের আদেশ দেয় না, শুধু বলিয়া দেয়, ইহা করিলে মঙ্গল হয়,—আর ইহা না করিলে অমঙ্গল হয়, ইতিহাস পুরাণাদিও তেমনই সুহৃৎসম্মিত বাক্যের বক্তা; কিন্তু কি করিলে ভাল হয়, কি করিলে মন্দ হয় সুহৃদের মতন স্পষ্ট করিয়া সে কথাও সাহিত্য বলিবে না। সাহিত্য শুধু যাহা মঙ্গল তাহাকে তাহার অন্তরের গভীর প্রদেশে লুকাইয়া রাখিবে; তাহার প্রিয়তম পাঠককে তাহা পূর্বাহ্ণে জানিতেও দিবে না; শুধু সৌন্দর্য এবং রসের ভিতর দিয়া—শুধু তাহার লোকোত্তর রমণীয়তার ভিতর দিয়া

পাঠকের চিত্তকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া লইয়া মনের অজ্ঞাতসারে তাহাকে মঙ্গলের আলোকে লইয়া চলিবে।

এইখানে কথা উঠিতে পারে, এই সৌন্দর্য এবং রস-মাধুর্য দ্বারা সাহিত্য আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে কেন, —সৌন্দর্য এবং রস-মাধুর্যকেই কি সাহিত্যের পরম সার্থকতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না ? নতুবা সাহিত্যের ভিতরে সৌন্দর্য এবং রস-মাধুর্য যেন অনেকখানিই গৌণ হইয়া যায়, তাহারা যেন আপনাতে আপনারা কিছুই নহে,--একটা মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়স্বরূপেই যেন তাহাদের সকল মূল্য। এ-কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই যে আমাদের মনের মধ্যে শ্রেয়োবোধ, ইহা যদি চিরাচরিত সংস্কার মাত্র না হইয়া আমাদের অন্তরের ভূমিতে অন্তরের আলোহাওয়া এবং রস-সম্ভার লইয়া ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তবে সে আমাদের সকল বোধের শ্রেষ্ঠ, এবং আমাদের সকল মানসিক বৃত্তির বিকাশের ভিতরে সে তাহার ছাপ রাখিয়া দিবেই। এ-কথার আভাস আমি পূর্বেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আজকাল আমরা আমাদের যে সকল সাহিত্য-সৃষ্টিকে এই মঙ্গলবোধের বালাই হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে আপন গৌরবেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছি, একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব যে, সেখানেও আমাদের শ্রেয়োবোধ লুপ্ত হয় নাই, সকল আর্টসৃষ্টি জড়াইয়া একটা কিছু কথা বলা হইয়াছে, এবং সেই কথাটির ভিতরেই সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া

আছে আমাদের শ্রেয়োবোধ। তবে আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের শ্রেয়োবোধটি কোনও একটি চিরন্তন স্থবির পদার্থ নহে; কালের পক্ষ বিস্তার করিয়া সেও মানুষের জীবন-ধারার সহিতই ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নিরন্তর পরিবর্ত্তনের ভিতরে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সম্বন্ধেই আমাদের শ্রেয়োবোধ হয়ত প্রায় সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। বাল্মীকির এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া হয়ত বুঝিয়াছিলাম,—'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ'; মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' পড়িয়া হয়ত বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে,—'রাবণাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রামাদিবৎ',—কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য হইতে যে শ্রেয়োবোধ লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহা নহে। বস্তুতঃ আজকাল আমাদের সাহিত্য রচনায় প্রচলিত সমাজ ও নীতির বিরুদ্ধে আমরা সচরাচর যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকি তাহা যে শুধু আর্টের মুখ চাহিয়াই তাহা নহে,—তাহার পশ্চাতেও রহিয়াছে অনেকখানি আমাদের শ্রেয়োবোধের তাগিদ। প্রচলিত মঙ্গলের আদর্শ হইতে আমাদের অত্যাধুনিক মঙ্গলের আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক এবং তাই বলিয়াই আমরা সাহিত্যের মারফতে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমাদের সেই নব্য শ্রেয়োবোধটিকে পাঠক সমাজে পেশ করিতেছি। ইহার ভিতরে আমাদের চিরাচরিত সংস্কারে যেখানে আঘাত লাগিয়া অশ্লীলতা দোষ উৎপন্ন হইতেছে, আধুনিকতাবাদীদের মনের বিচারে তাহা ততখানি অশ্লীল নহে,—এবং তাঁহাদের

শ্রেয়োবোধের নিকট তাহা সত্যকার অশ্লীলতা দোষদুষ্ট নহে; অথচ এই সরল সত্যটিকেই আমরা চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছি আর্টের নানা কৈবল্যরূপের লক্ষণ ফাঁদিয়া। মজার কথা এই,—একদিকে আমরা অমাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিপীড়িত দুর্বলের বুকের অস্ফুট বেদনাকে ভাষা দিতেছি,—মানুষের গহন গোপনের দুর্জ্ঞেয়ত্বের ভিতরে আলোক পাত করিতেছি, মুটে-মজুর এবং অসংখ্য কল-কারখানার শ্রমিকরূপ 'ভুখা-ভগবান'দের জয়গান করিতেছি, এবং ইহা লইয়াই বর্তমান যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাইতেছি,—অন্যদিকে আবার প্রমাণ করিতে লাগিয়া গিয়াছি যে, সাহিত্যের সহিত আমাদের শ্রেয়োবোধের কোনই সম্পর্ক নাই!

আমার মনে হয়, সাহিত্যকে যে আমরা ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতিগত সকল শ্রেয়োবোধ হইতে দূরে রাখিয়া একটি নিরালম্ব রস-আলাপনের ভিতরেই পর্যবসিত করিতে বসিয়াছি, উহা আমাদের চিন্তার সঙ্কীর্ণতা। ধর্ম-গৃহের ভিতরে যিনি আমাদের সৌন্দর্য-বোধকে কিছুতেই ঢুকিতে দিতে নারাজ তিনিও যেমন গোঁড়া সঙ্কীর্ণ, সাহিত্যে যিনি ধর্ম বা নীতিকে স্থান দিতে নারাজ তিনিও তাহা হইতে কোন অংশে কম গোঁড়া বা সঙ্কীর্ণ নহেন। তবে এই ধর্মবুদ্ধিতে বা নীতিবুদ্ধিতে পরস্পরের ভিতরে অবশ্যই ভেদ থাকিতে পারে; একে যেখানে হাজার হাজার নিরন্নকে

উপেক্ষা করিয়া দেব-পূজনের ভিতরেই ধর্ম লাভ করিয়াছেন, অপরে হয়ত ভজন পূজন ছাড়িয়া প্রেমের ভিতরে সার্বজনীন সহানুভূতির ভিতরেই ধর্ম লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু ধর্ম বা নীতি সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা আর্টের সহিত আমাদের এই জাতীয় সকল বোধগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে কখনই অস্বীকার করিতে পারে না। সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মনোভাবটি আরও উদার আরও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক; জীবনের একটা গভীর ব্যাপ্তি—একটা বিরাট পরিধির ভিতরে দেখিতে পাইব, আর্ট ও মঙ্গলবোধ কত নিকট সূত্রে আবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে এই বিরাটত্ব—এই প্রসার ছিল, তাই তিনি সুন্দরকে কোন দিনই মঙ্গল হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারেন নাই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার সাহিত্যের উপদেশ সর্বদাই কান্তাসম্মিত নহে। তিনি স্থানে স্থানে প্রকাশ্যে প্রভুসম্মিত এবং সুহৃৎসম্মিত অনেক কথাও বলিয়াছেন, এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্টের তরফ হইতে আমাদের সত্যকার আপত্তি। উপন্যাসের ঘটনা-স্রোতের মধ্যে যবনিকান্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি স্বমুখে অনেক উপদেশ দিয়াছেন,—যেখানেই এইরূপ হইয়াছে, সেইখানেই আর আমাদের মন সায় দিতে পারে না। যেখানে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র যবনিকান্তরাল হইতে বাহির হইয়া নিজেকেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন,

সেইখানেই যে ইহার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল তাহাও মনে হয় না। 'বিষবৃক্ষে'র উপসংহারে লেখক যখন যবনিকান্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন,—'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।'—তখন মনে হয়, এই জাতীয় পুরাণ-মাহাত্ম্যের ন্যায় বিষবৃক্ষ-মাহাত্ম্য বর্ণনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। 'বিষবৃক্ষে'র এ ফলশ্রুতি মিশিয়া আছে সমগ্র ঘটনা-প্রবাহের পরিণতিতে, সকল চরিত্রাঙ্কনে—তাহাদের জীবনের জীবন্ত বেদে। সেই কান্তাসম্মিত বচনকে আবার প্রকাশ্যে প্রভুসম্মিত বা সুহৃৎসম্মিত করিয়া তুলিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই শাসক বা প্রকাশ্য প্রচারক বা সংস্কারক রূপটি বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। 'রাজসিংহে'র ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলিয়া লইয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুগণ যে শৌর্যে-বীর্যে কোন জাতি অপেক্ষাই হীন ছিল না তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তিনি রাজসিংহ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'দেবীচৌধুরাণী' কোম্‌তের 'পজিটিভিজ্‌ম্‌' (Positivism) ও গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শে জাত অনুশীলনধর্ম প্রচারেরই অনেকখানি অবলম্বন মাত্র; তাঁহার 'সীতারাম' গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শকে ললাট-টীকা করিয়াই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এ-সকল স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রও

খুব সম্ভব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি আর্টের ক্ষেত্রে ক্রমেই সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন, এবং এই জন্যই বোধ হয় 'সীতারাম' রচনার পরে তিনি আর সৃষ্টি কার্যে হাত দেন নাই।

কিন্তু শেষ বয়সে লিখিত উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে আমাদের এই অভিযোগ এবং সমালোচনা প্রযোজ্য হইলেও বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রথম বয়সের লিখিত উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে এই জাতীয় অভিযোগ এবং সমালোচনা বিশেষ প্রযোজ্য নহে। যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, এ-সকল উপন্যাসেও স্থানে স্থানে তিনি যবনিকান্তরাল হইতে নিজমূর্তিতেই বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের আর্ট আদর্শবাদের দ্বারা খুব বেশী ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আলোচনার সুবিধার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', ও 'কৃষ্ণ-কান্তের উইলে'র কথাই ধরা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিন-খানি উপন্যাস সম্বন্ধেই এই অভিযোগ শুনা যায় যে, আদর্শবাদই এখানকার ঘটনাগুলিকে পরিণতি দান করিয়াছে, আর্টের স্বচ্ছন্দ গতি নহে। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য জীবনের পবিত্র আদর্শ স্থাপনের জন্য কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছেন,—'চন্দ্রশেখরে' এই সামাজিক মঙ্গলের অনুরোধেই তিনি প্রতাপকে মারিয়াছেন,—সমাজের সম্মুখে পবিত্র প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিতেই কলঙ্কিনী রোহিণীকে গুলি

করিয়া মারিয়াছেন। সমাজ ইহাকে যতই হাসি মুখে বরণ করিয়া লউক না কেন, আর্টের পক্ষে এতখানি দৌরাত্ম্য একেবারে অসহ্য! কিন্তু আদর্শবাদের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে এই উপন্যাসগুলির ঘটনা-প্রবাহ অন্য দিকে বহিতে পারিত বটে; তবে সে স্রোত অন্যদিকে না বহিয়া আদর্শের অনুরোধে যে দিকে বহিয়াছে তাহাতেও আর্টের প্রাণ-বস্তুটি সর্বত্রই নিষ্পেষিত হইয়া মরিয়া যায় নাই। এই আদর্শবাদ সত্ত্বেও যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আর্টকে অনেকখানিই বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহার একমাত্র কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের ভিতরে বাস করিত সত্যকারের একটি কবি—সত্যকারের একটি দরদী এবং রসিক শিল্পী। এই কবিচিত্তের গভীর পরিচয় মহামানবের সহিত একাত্মবোধে—অসীম প্রেমে—নিবিড় সহানুভূতিতে। কবির মুক্ত প্রাণের স্পন্দনে বিশ্বসৃষ্টি ধরা দেয় তাহার স্বাধীন স্বচ্ছন্দরূপে, কবির সহিত এ বিশ্বসৃষ্টির যোগ এই স্বাধীন প্রাণের খেলাতেই। বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন এই জাতীয় একটি প্রকাণ্ড কবি—অন্তরে তাঁহার দরদ ছিল অতলস্পর্শ। মানুষের বাঁধা-ধরা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ-জীবনের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেখিতে পারিয়াছিলেন,—হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন—এই সংসারের আইন-কানুনের নীচে কত অসহায় নিরীহ প্রাণ নিয়ত পিষিয়া মরিতেছে। আমরা যাহাকে তাহার পাপ বলিয়া তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া

রাখিয়াছি—সে নিজে তাহার কতটুকুর জন্য সত্যকার দায়ী? আমাদের পাপের ফল আমাদিগকে কড়ায়-গণ্ডায় ভোগ না করিলে চলিবে না; কিন্তু তাহার কতটুকুর উপর আমাদের সত্যকার হাত রহিয়াছে? যৌবনের প্রেমমধু বুকে চাপিয়া ঐ যে বর্ণে-গন্ধে অনবদ্য হইয়া শুভ্র-শীতল কুন্দ ফুলটির ন্যায় কুন্দনন্দিনী ধরণীর একপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল, সে যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট কবিচিত্তকে একেবারে মথিত করিয়া দিল। কুন্দ ধীরে ধীরে নগেন্দ্রকে ভালবাসিল, কুন্দের কতটুকু অপরাধ? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রেমকে হৃদয়হীন শাসকের নিষ্ঠুর পীড়নে পদদলিত করিতে পারেন নাই,—ধরণীর একটি কানন-প্রান্তে আপনা-আপনি ফুটিয়া-ওঠা একটি কুন্দ কুসুমের বুকের মধুসৌরভের মতই কুন্দের প্রেম বঙ্কিমচন্দ্রকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু হায়, অসহায় মানুষ!—এ ফুল ঝরিয়া পড়ে অনাদরে—উপেক্ষায়—শত লাঞ্ছনায় অপমানে। বঙ্কিমচন্দ্রও কুন্দকে অকালে ঝরাইয়াছেন—কিন্তু চোখের জল মুছিতে মুছিতে,—বেদনা-ব্যথিত হৃদয়ের অস্ফুট দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে! কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু বর্ণনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—"ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া, চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন-যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল! অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।"

যে সূর্যমুখীকে গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কুন্দ মরিল

সেই সূর্যমুখী কুন্দের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।" এই যে মানুষের জীবনের সত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা—নিবিড় দরদবোধ—অসীম করুণা, এইখানেই ত কবিচিত্তের গভীর পরিচয়। বঙ্কিম কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছেন, ইহা কুন্দের প্রেমের শাস্তি নহে—প্রেমের পুরস্কার। সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের তিনি মিলন করাইয়াছিলেন দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে; কিন্তু কুন্দকে তিনি মারিয়াছিলেন তাহার প্রেমকে বৃহত্তর লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত হইতে মুক্তি দিবার জন্য। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই কুন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি অধিকার করিয়া গেল অনেক বেশী। কুন্দের মৃতুতে আমাদের রসিক চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া ওঠে না এই জন্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাঁহার আদর্শবাদ সত্ত্বেও মানুষের জীবনকে—তাহার সত্যকে সমস্ত হৃদয় দিয়া স্বীকার করিয়াছেন—তাহার বৈচিত্র্য এবং সূক্ষ্ম সৌকুমার্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। যে আদর্শ আমাদের সত্যকার জীবনকে পদে পদে অস্বীকার করে—সে আদর্শ জীবনের একটা কেন্দ্রীভূত লাঞ্ছনা মাত্র। সংসারের স্রোত কুন্দের জন্য যত লাঞ্ছনা এবং অপমানই বহিয়া আনুক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে কুন্দকে ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন নাই—লোক-জগতের অন্তরালে যে তিনি কুন্দের জন্য অন্তরে একটি

করুণ-কোমল স্থান বিছাইয়া দিয়াছিলেন, এই সহৃদয়তা—এই মহানুভবতা দ্বারাই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছিলেন। এই যে ব্যষ্টি এবং বিশিষ্ট সমাজের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া একটা মহামানবতার দৃষ্টি এখানেই তাঁহার মহত্ত্ব। দেশ-কাল ভেদে বিশেষ বিশেষ জাতি বা সমাজেরও যেমন একটা ধর্ম আছে,—তেমনই এই সকল জাতি এবং সমাজের পশ্চাতে একটা মহামানবের প্রাণধর্ম রহিয়াছে ;—বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরে রহিয়াছে একটা সামাজিক বুদ্ধি, কিন্তু অন্তরে তাঁহার সেই মানবতার প্রাণ-ধর্ম। এই মানবতার দৃষ্টিতেই তিনি 'চন্দ্রশেখরে'র ভিতরে প্রতাপ এবং শৈবলিনীর প্রেমকে প্রকাশ্যে স্পষ্টতঃ অভিশাপ দিতে পারেন নাই। শৈবলিনীর ভিতরে রহিয়াছে উদ্দাম প্রাণস্পন্দন, তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিবার, তাহার যথার্থ অবলম্বন হইয়া থাকিবার শক্তি সংসার-ভোলা আত্ম-ভোলা গ্রন্থানুরাগী চন্দ্রশেখরের ছিল না,—সে পৌরুষ-বীর্য ছিল প্রতাপের। জল তাই তাহার স্বাভাবিক গতিতেই চলিয়াছে, শৈবলিনী প্রতাপের অনুরক্তা হইয়াছে। এই অনুরাগ সঙ্ঘটনেও বঙ্কিমের কত সূক্ষ্ম নৈপুণ্য! প্রতাপ ও শৈবলিনীর শৈশব-স্মৃতির অরুণ-রাঙা পটভূমির উপরে এ অনুরাগ কত মধুর—কত সার্থক! কিন্তু সংসার বহিয়া আনিল সে প্রেমের জন্য তীব্র অভিশাপ—জীবনে আসিল ব্যর্থ নৈরাশ্য। প্রতাপ সমাজ-দ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করিল—সে মরিল ; কিন্তু প্রতাপের কি

সত্যই প্রায়শ্চিত্ত করিবার মত পাপ সঞ্চিত হইয়াছিল ? কবি বঙ্কিম এ প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তরে শুধু ভাবিয়াছেন,—নিষ্ঠুর সমাধান দেন নাই। মৃত্যুর পূর্বে প্রতাপ বলিল,—"আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী, আপনি বলুন আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত ? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী ?" রামানন্দ স্বামী এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নাই ; তিনি বলিলেন,—"মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ, শাস্ত্র এখানে মূক।" প্রতাপের এই প্রশ্ন শুধুই প্রতাপের ব্যক্তিগত প্রশ্ন নহে—এ প্রশ্ন এই বিশ্বের সম্মিলিত মানবাত্মার চিরন্তন প্রশ্ন ! হৃদয়-ভরা যে এত প্রেম তাহা যদি কোথাও দান করিয়া থাকি—সমাজের কাছে সেখানে অপরাধী হইলেও জগদীশ্বরের কাছেও কি অপরাধী হইয়াছি ? মানুষের নীতি-জ্ঞান এখানে স্তব্ধ, একদিকে সমাজ ধর্ম—অন্য-দিকে মানব ধর্ম—বঙ্কিমচন্দ্র তাই নীরব হইয়া রহিলেন, শুধু একটা মঙ্গলের উজ্জ্বল আলোকে প্রতাপের মৃত্যুকে মহীয়ান করিয়া তুলিলেন, নিজে মঙ্গলের প্রদীপ হাতে করিয়া প্রতাপকে পথ দেখাইয়া বলিলেন,—"তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে ! যাও ! যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও ! যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও !"

কিন্তু প্রতাপের বেলা বঙ্কিমচন্দ্র যে কবিহৃদয়ের পরিচয়

দিয়াছেন, শৈবলিনীর বেলায় সেই সহৃদয়তার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় অভাগিনী শৈবলিনীর প্রতি কবি অনেকখানি নিষ্ঠুর অবিচার করিয়াছেন। প্রতাপের যাহা শেষ-প্রশ্ন ছিল, শৈবলিনীর জীবনেও অনেকখানি সেই প্রশ্ন। সে যে অন্তরে অন্তরে সত্য সত্যই প্রতাপকে ভালবাসিয়াছিল এই জন্য সে সমাজের কাছে অপরাধী সন্দেহ নাই; কিন্তু জগদীশ্বরের পায়েও কি তাহার অপরাধ সমান? পূর্বে দেখিয়াছি, কবি বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তরে নীরব রহিয়াছেন। কিন্তু তবে তিনি শৈবলিনীকে দিয়া এমন নিষ্ঠুর প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন কেন? এখানে তাঁহার প্রাণধর্ম সমাজধর্মের নিকটে যেন অতিমাত্রায় লাঞ্ছিত,—আমাদের হৃদয়েও তাই এইখানেই বেদনা এবং বিদ্রোহ। সমাজের বিরুদ্ধে শৈবলিনী যে অপরাধ করিয়াছিল, সমাজ তাহার শাস্তি বিধান করিয়াছিল। যে স্বভাবের হাতে ক্রীড়নক হইয়া শৈবলিনী স্বামী ছাড়িয়া প্রতাপের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিল,—সেই স্বভাবধর্মই তাহাকে পাগল করিয়া শাস্তি দিয়াছিল। এ শাস্তির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ নাই। কিন্তু লেখক যেখানে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আনিয়া শৈবলিনীর আবার চারি বৎসর কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন, মনে হইল লেখক সেখানে সাহিত্যের পথ ছাড়িয়া স্মার্ত-পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

আর একটি প্রকাণ্ড মতভেদ রহিয়াছে 'কৃষ্ণকান্তের

উইলে'র রোহিণীকে লইয়া। আমার মনে হয় রোহিণীর উপরে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন কোনও অবিচার করেন নাই। অবশ্য গোবিন্দলালের প্রমোদ উদ্যানে মন্দির তুলিয়া সেখানে ভ্রমরের স্বর্ণ-প্রতিমা স্থাপন সাহিত্যের দিক হইতে খানিকটা বাহুল্য মনে হয় বটে, কিন্তু ঘটনা-স্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহে কোথাও নীতির জোর জবরদস্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। সৌন্দর্যের প্রতিমা বিধবা রোহিণী অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের বিদ্যুৎ চাপিয়া রাখিয়া হরলালকে বা গোবিন্দলালকে অবলম্বন করিয়া মনের নিভৃত কোণে যেদিন একটি নূতন করিয়া ঘরসংসার পাতিবার স্বপ্ন দেখিতেছিল, লেখক রোহিণীর মানস-গগনের সেই সপ্তরঙের ইন্দ্রধনুকে কোনও নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া ফেলেন নাই; কত করুণা—কত সহানুভূতি! যেদিন অশোকের শাখে বসন্তের কোকিল ডাকিয়াছিল 'কুহু'—আর কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া সরোবরের সোপানে বসিয়া রোহিণী কাঁদিতে বসিল,—রোহিণীর সে অশ্রুবিন্দু বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়কেও সিক্ত করিয়াছিল। কিন্তু প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে যে রোহিণীর মৃত্যু হইল, উহা নিতান্তই একটা ঘটনা বিশেষ, উহা রোহিণীর স্বৈরাচারের একটা আকস্মিক পরিণতি, সেটা একান্ত আকস্মিক হইলেও একান্ত অস্বাভাবিক নহে। রোহিণীর মৃত্যু কুন্দের মৃত্যু বা প্রতাপের মৃত্যুর ন্যায় আমাদের হৃদয়ে গভীর সহানুভূতির উদ্রেক

করে না; কারণ, কুন্দ বা প্রতাপের মত তাহার প্রেম *নাই—মহিমা নাই।* ঘটনার ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইল যে, যে গোবিন্দলাল রোহিণীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে সেই গোবিন্দলালের জন্য তাহার আন্তরিক কোন প্রেম নাই,—রহিয়াছে উদগ্র ভোগ-বাসনা,—যাহা হরলালকে দিয়া চরিতার্থ হইতে পারে, গোবিন্দলালকে দিয়া হইতে পারে, নিশাকরকে দিয়াও হইতে পারে—অন্য কাহার দ্বারাও হইতে পারিত। এই যে জীবনের সকল মাহাত্ম্যবর্জিত নিছক ভোগস্পৃহা, ইহার জন্যই রোহিণী পরিশেষে আর আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রধানতঃ তাঁহার প্রেমের আদর্শের ভিতর দিয়া। প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ উপন্যাসের ঘটনাবলি আবর্তিত হয়; সেই প্রেম সম্বন্ধে একটি বিশেষ আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের মন অধিকার করিয়া থাকায় সেই আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাসের ঘটনা-প্রবাহও একটা একজাতীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, শুধু সাহিত্য বা আর্টের ক্ষেত্রে নহে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সমন্বয়বাদী। তাঁহার পরিকল্পিত ধর্মের আদর্শের ভিতরেও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে

মানুষের দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল উচ্চবৃত্তি-গুলির ভিতরে একটা গভীর সমন্বয়। তাঁহার প্রেমের আদর্শের ভিতরেও প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল এই সমন্বয়বোধ। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ যাপনপ্রথার ঊর্ধ্বে, অথচ প্রতিদিনের জীবনকে জুড়িয়া প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই রহিয়াছে একটা বৃহত্তর পরিধি এবং পরিকল্পনা। সেই বৃহত্তর পরিধি এবং পরিকল্পনাতেই ব্যষ্টিজীবনের সহিত সমষ্টিজীবনের—অর্থাৎ ব্যক্তির সহিত সমাজের অঙ্গাঙ্গিযোগ। বৃহত্তর জীবনের সহিত যোগরক্ষা করিবার জন্য আমাদের দৈহিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির ভিতরে সর্বদাই চাই একটা গভীর সমন্বয়। মানুষের সকল বৃত্তির ভিতরে শ্রেষ্ঠ বলশালী বৃত্তি তাহার প্রেম; প্রেমকে শুধু একটা বিশুদ্ধ মানসিক বৃত্তি বলিয়া বর্ণনা করিলে চলিবে না, দৈহিক এবং মানসিক বৃত্তির সমবায়ে গড়িয়া ওঠে প্রেমের যৌগিক রূপ। প্রকৃতিতে সর্বাপেক্ষা বলশালী বৃত্তি বলিয়া নিজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেমের সর্বদাই রহিয়াছে একটা দুরন্ত চেষ্টা; ফলে জীবনের সৌষম্য এবং সঙ্গতি ভঙ্গ করিয়া একটা বিক্ষোভের দাবানল সৃষ্টি করাই তাহার সাধারণ ধর্ম। কিন্তু বৃহত্তর জীবনে সার্থক হইয়া উঠিবার জন্য প্রেমকে তাহার একাধিপত্যের অসঙ্গত দাবীকে, জীবনের উপরে তাহার সার্বভৌম কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করিতে হইবে,—এইখানেই প্রেমের ভিতরে আসে

ত্যাগের প্রশ্ন। নিরন্তর ত্যাগের পুটপাকেই প্রেমের বিশুদ্ধি। যে প্রেমের লক্ষ্য শুধু আত্মসুখ, প্রাচীরঘেরা একটি সঙ্কীর্ণতম পরিধিতে নিজকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে থাকে যাহার আবর্ত, সে প্রেম যে শুধু জগতের মঙ্গলের অন্তরায় তাহা নহে, সে আত্মজীবনের সুখ ও মঙ্গলেরও অন্তরায়। ত্যাগের অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া যে প্রেম মঙ্গলের ঔজ্জ্বল্য লাভ করে নাই, সে প্রেম কখনও বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভ করে নাই। দাম্পত্য প্রেমের ক্ষেত্রেও তিনি প্রেমের এই আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। "কমলাকান্তের দপ্তরে"র ভিতরে বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন,—"যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভিতরে দেখিতে পাই, প্রেম যেখানে ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির সহিত অবিরোধে চলিতে নারাজ, বৃহত্তর জীবনের মঙ্গলেরও যে একান্ত পরিপন্থী তাহাকে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্কিম মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়-ধর্মকে কোনদিন অস্বীকারও করেন নাই,—নিষ্ঠুর বিচারকের ন্যায় তাহার শিরোদেশে পাপের শিরোনামাও আঁটিয়া দেন নাই।

পূর্বেই দেখিয়াছি, হৃদয়-ধর্মের দুর্বলতার প্রতি তাঁহার ছিল অসীম সহানুভূতি,—যেটুকু উপালম্ভ আমরা দেখিতে পাই তাহা সহবেদনে অশ্রুসিক্ত। "বিষবৃক্ষে"র ভিতরে দেখিতে পাই, সূর্যমুখীর পত্র পাইয়া কমলমণি গোবিন্দপুরে আসিয়া নিভৃতে কুন্দকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস্—না ?

কুন্দ উত্তর দিল না, কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন,—'বুঝেছি—মরিয়াছ। মর, তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে ?'

কুন্দনন্দিনী মস্তক উত্তোলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, 'পোড়ারমুখী, চোখের মাথা খেয়েছ ? দেখতে পাও না! যে—' মুখের কথা মুখে রহিল, তখন ঘুরিয়া কুন্দের উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।

ভালবাসা কাহাকে বলে, সোনার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছাইয়া কহিল, 'কুন্দ' !"

এখানে বুঝিতে একটুকুও কষ্ট হয় না যে কুন্দের চক্ষু মুছাইয়া এই স্নেহসম্ভাষণ 'কুন্দ' শুধু কমলমণির সম্ভাষণ নহে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের স্নেহসম্ভাষণ। তথাপি তাঁহাকে কঠোর হইতে হইল, কুন্দফুল অকালে ঝরাইতে হইল, কারণ, নতুবা "সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে!" হরদেব ঘোষালও অনুতপ্ত নগেন্দ্রনাথকে চিঠি দিয়াছিলেন,—"মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।" শুধু ইহাই নহে, 'মৃণালিনী'র ভিতরে মনোরমার মুখ দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বলাইয়াছেন,—"প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে ন্যস্ত রয়—পরিশেষে সাগর-সঙ্গমে লয় প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়।"

এই মহৎ প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষার রহস্যময়ী দেবীমূর্তি অঙ্কন করিয়াছিলেন। আয়েষাকে লেখক আদর্শের অনুরোধে স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে নিরালম্ব একান্ত অবাস্তব করিয়াই স্থাপন করেন নাই,—তাহার ভিতরে জীবন্ত ছিল যে একটি রক্ত-মাংসের নারী সে কথা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন নাই; তাই দেখিতে পাই, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের বিবাহরাত্রে আয়েষা তিলোত্তমাকে নিজের উপহৃত রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া—

"তিলোত্তমাকে কহিলেন,—'তিলোত্তমা! আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত হইতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কালহরণ করিব না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ু করিবেন। আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সাররত্ন হৃদয় মধ্যে রাখিও।

'তোমার সাররত্ন' বলিতে আয়েষার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; তিলোত্তমা দেখিলেন, আয়েষার নয়ন-পল্লব-জলভার-স্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে।

তিলোত্তমা সমদুঃখিনীর ন্যায় কহিলেন, 'কাঁদিতেছ কেন?' অমনি আয়েষার নয়ন-বারিস্রোত দরদরিত হইয়া বহিতে লাগিল।

আয়েষা আর তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া দোলারোহণ করিলেন।"—এই ভাবেই আয়েষা একটা আদর্শের বিগ্রহমাত্র না হইয়া রক্তমাংসের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই রক্তমাংস, প্রাণ-মনকে অনেকখানি অস্বীকার করিয়া আদর্শ প্রেমের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সীতারামে; ভৈরবী জয়ন্তীর উপদেশে শুধু 'সর্বভূতের হিতের জন্য'ই শ্রী সীতারামকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিল। শ্রীর প্রতি সীতারামের আসক্তি বৃহত্তর মঙ্গলের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—তাই শ্রীকে সরাইয়া দিতে হইয়াছিল বহুদূরে।

কোনো লেখকের সৃষ্টির ভিতরে তিনি কোন্ চরিত্রের উপর

সুবিচার করিয়াছেন, কাহার উপর অবিচার করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, দেখিতে হয়, কোনও ঘটনার বা চরিত্রের পরিণতির ভিতরে একটা অনিবার্যতা—একটা অবশ্যম্ভাবিত্ব আছে কি না। কোন একটি ঘটনা-স্রোতকে লেখক খেয়ালের বশে যখন ইচ্ছা তখনই যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যেভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই পরিণতি দান করিতে পারেন না,—সমগ্রের সহিত তাহার একটি অখণ্ড সঙ্গতি চাই,—নতুবা পাঠক তাহাকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে না। তেমনই কোনও চরিত্রকে কোনও পরিণতি দান করিতে হইলে হেতু-প্রত্যয় যোগে তাহাকে তাহার সমগ্রতার সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে। গাছের শাখা-প্রশাখায় যে ফুল—যে ফল ভরিয়া উঠিবে, তাহার বীজের ভিতরে সেই সম্ভাবনা চাই,—তাহার ভূমির ভিতরে তাহার রসসত্ত্বা চাই,—তাহার জল-বায়ু-আলোকের মধ্যে তাহার পোষকতা চাই। এই সকল হেতু-প্রত্যয় যোগে যে ঘটনা—যে চরিত্র গড়িয়া উঠিবে তাহাই হইবে সত্য। এই সমগ্রতার অপেক্ষা না করিয়া যে ঘটনা খাপ-ছাড়া ভাবে আপনার অস্তিত্বকে জাহির করিয়া বসিবে, পাঠকের মনে সে-ই আনিবে বিদ্রোহ,—সে খাপছাড়া সৃষ্টির পশ্চাতে সুনীতিই থাক আর দুর্নীতিই থাক। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির ভিতরে দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার আদর্শকে অতি কৌশলে অতি নিপুণভাবে জীবনের সহজ স্রোতের সহিত অনেক স্থানে স্বাভাবিক ভাবে

মিলাইয়া দিয়াছেন। যেখানে তিনি তাহা করিতে পারেন নাই—সেই খানেই রহিয়াছে অসঙ্গতির বেদনা। কিন্তু এ-কাজ তাঁহার সৃষ্টির ভিতরে অনেক স্থানেই তিনি করিতে পারিয়াছেন,--এই খানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব—এই খানেই তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব।

কোনও সাহিত্যকে বিচার করিতে গেলে আমাদের আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ এই,—সে তাহার ফল-শ্রুতি দ্বারা আমাদের ব্যক্তিজীবনের সঙ্কীর্ণ সীমাকে মুছিয়া ফেলিয়া বিশ্ব-জীবনের সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় যোগ স্থাপন করিয়া দেয়। এই যে বিশ্ব-জীবনের সহিত একাত্মতা এবং তাহার ভিতর দিয়া অন্তরের অসীম প্রসার—সাহিত্যের ইহা অপেক্ষা আর বড় উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। রসের সিঞ্চনে আমাদের চিত্তের আবরণ ঘুচিয়া যায়। এই যে চিত্তের নিরাবরণ নিঃসীমতা এই খানেই কাব্য-কলার চরম সার্থকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরেই আমরা প্রথম লাভ করিয়াছিলাম রসের আবেদনে চিত্তের প্রসার, ব্যক্তি-জীবনের পাষাণ-ঘেরা প্রাচীরের ভিতরে আসিয়াছিল অসীম মানব-প্রীতি, তাহার ভিতরেই আমরা প্রথম পাইয়াছিলাম মুক্তির নবতম আস্বাদ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণব-কবিতা

আর্টের লক্ষণ দিতে গিয়া আমরা আর্টের ধর্মকে যতই দেশকাল-নিরপেক্ষ সার্বজনীন বলিয়া ব্যাখ্যা করি না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে ইতিহাসের গণ্ডির ভিতরে আমরা তাহার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রূপ অতি কদাচিৎই দেখিতে পাই। জগতে যত কাব্য-সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ভিতর হইতে দেশকালের সকল বৈলক্ষণ্য ত্যাগ করিলেও আমরা যে কাব্য-কলার ভিতরে কোনও সার্বজনীন উপাদান খুঁজিয়া পাই না এমন নহে; তবে শুধু এই সার্বজনীন উপাদানকে লইয়াই কাব্য সৃষ্টি আমরা খুব কমই দেখিতে পাই। আর্ট যেখানেই বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই সে দেশ-কালের রং মাখিয়া একটি বিশিষ্ট রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে; শিল্প-কলার আস্বাদনে আমরা তাই তাহাকে কখনই একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না।

এই জন্য কোনও সাহিত্যকে ভালরূপে অধ্যয়ন করিতে হইলে শুধু সাহিত্যের সাধারণ ধর্মটি জানিলেই চলে না,—আমাদের পরিচয় লাভ করিতে হয় তাহার বিশেষ রূপটির। আর্টের সার্বজনীন প্রাণটি লুকাইয়া আছে তাহার দেহের

বহু বিচিত্রতার ভিতরে ; এই বহু বিচিত্র রূপকে বাদ দিয়া আমরা তাহার প্রাণ-বস্তুকেও সকল সময় চিনিয়া উঠিতে পারি না। তাই সাহিত্যকে সত্যকার আস্বাদ করিতে হইলে আমাদের জানিতে হয় তাহার জন্ম-রহস্যকে,—জানিতে হয় দেশকালের বিশিষ্ট সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রকে, জানিতে হয় সেই জল-বায়ুকে, যাহার ভিতর দিয়া এই সাহিত্য বর্ধিত এবং বিশিষ্ট রূপে—বিশিষ্ট ফল-পুষ্পে সুশোভিত।

এই দেশকালের বিশিষ্ট আবেষ্টনী যে সাহিত্যের শিল্প-সৃষ্টির ভিতর কতখানি প্রধান হইয়া উঠিতে পারে, এবং সাহিত্যের আস্বাদনের ভিতরে সে যে কতখানি অপরিহার্য হইয়া উঠিতে পারে, বাঙলার বৈষ্ণব সাহিত্যই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বাঙলার বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচয়, বাঙলার জাতীয় জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বাঙলার বৈষ্ণব-কবিতার আস্বাদনের অঙ্গহানি ঘটাইবেই।

মনে পড়ে মধ্যযুগের বাঙলা কবিতার নমুনা-স্বরূপে একদিন একজন বিদেশী পণ্ডিতের নিকট গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদ ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। পদটি—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু সুরধুনী তীরে উজোর॥

বহুক্ষণ বসিয়া আপ্রাণ ব্যাখ্যা করার ফলেও শ্রোতার

দিক হইতে কোনও রসানুভূতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। দ্বিগুণীকৃত চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর ভদ্রতার খাতিরে শ্রোতা দু'একবার 'হুঁ্যা হুঁ্যা' করিলেন বটে, কিন্তু আমি নিরুৎসাহ হইয়া ধীরে ধীরে থামিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমি আমার ভুল আবিষ্কার করিতে পারিলাম। আমি যে রসের ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রোতার ভিতরে সে রসকে গ্রহণ করিবার বাসনা কোথায়? শুধু রসের বাসনা নয়,—শ্রাবণ মেঘের ঘনবর্ষণে বাঙলার বনে-প্রান্তরে আনন্দের শুভ্র পুলকের মত কদম্বতরুর দীর্ঘ দেহে যে কেমন করিয়া কদম্ব ফুল ফুটিয়া থাকে সে দৃশ্য যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে সে কেমন করিয়া মানস নেত্রে মহাভাবে বিভোর শ্রীগৌরাঙ্গের পুলকিত দেহখানির দর্শন লাভ করিবে এবং মুগ্ধ হইবে?

আসল কথা এই, কোন বস্তুরই কোন নিরপেক্ষ মূল্য নাই। কোন বস্তুর যখন আমরা মূল্য নির্ধারণ করিতে যাই, তখনই আমাদের মনের পটভূমিতে স্ফুট, অস্ফুট এবং অর্ধস্ফুট অসংখ্য রঙের সমাবেশ হইতে থাকে; সেই বর্ণ-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া কোনও বিশেষ বস্তুর যে বিশেষ রূপ প্রতিভাত হয় তাহার অপেক্ষায়ই আমরা বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের ভাষায় বলিতে গেলে, মনের পটভূমিতে এই যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতিভাস ইহাই আমাদের মনের 'বাসনা', এবং কাব্যকলার মূল্য সাধারণতঃ এই বাসনার আপেক্ষিক। যে বৈষ্ণব কবিতার কথা বলিতে-

ছিলাম তাহাকে তাহার এই আপেক্ষিক রূপ হইতে একেবারে সাধারণ রূপে লইয়া বিচার করিতে গেলে,—অর্থাৎ বৈষ্ণব-ধর্ম এবং রাধা-কৃষ্ণের বালাই একেবারে চুকাইয়া দিয়া তাহাকে সাধারণ প্রেম হিসাবে আস্বাদ করিতে গেলে সেখানে শ্লীলতা অশ্লীলতার নানা কথা আসিয়া মনকে বিক্ষুব্ধ করিবেই; তাই বৈষ্ণব-কবিতাকে সম্যক আস্বাদ করিতে হইলে প্রথমে মনের ভিতরে চাই একটি বৈষ্ণবী বাসনা এবং সেই বাসনা মনের ভিতরে উদ্রিক্ত হইলে দেখা যাইবে, শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন দূরে গিয়া মনের ভিতরে এমন একটি অভিনব রসলোকের সৃষ্টি হইয়াছে যাহার আভাসে বৈষ্ণব প্রেম বাস্তবও নয়, অবাস্তবও নয়, বাস্তব-অবাস্তবের মিলনে সে কত মধুর!

সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্বেও তাই চাই একটি গভীর বাসনা। এই বাসনা ব্যতীত যে শুধু সৃষ্টি হয় না তাহাই নহে, সে সৃষ্টিকে সম্যক রূপে গ্রহণ করাও হয় না। তাই শিল্পী এবং শিল্প-রসিক উভয়ের ভিতরেই একটি সজাতীয় বাসনা না থাকিলে শিল্পের স্বরূপটি কাহারও নিকট উদ্ঘাটিত হয় না।

আমরা দেখিতে পাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙলা-সাহিত্যের দিক্‌পালগণ সকলেই অল্প-বিস্তর বৈষ্ণব কবিতা লিখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, —যিনি শৈশবে ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার কিঞ্চিৎ মাত্র মক্স করার পর আর এমন কর্ম বিশেষ করেন নাই,

তিনিও প্রাপ্ত বয়সে বৈষ্ণব-কবিতা লিখিয়াছেন,—“মেঘনাদ-বধ’-এর দুর্ধর্ষ কবি মধুসূদনও বৈষ্ণব-কবিতা লিখিয়াছেন, হেমচন্দ্রও হাত দিয়াছেন, আশৈশব নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক রবীন্দ্রনাথও ইহার হাত হইতে রক্ষা পান নাই। বৈষ্ণব-কবিতার ভাষা, ছন্দ এবং রসলোকের ভিতরে এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে,—এমন একটি অনিবার্য হৃদয়াবেগ আছে যে, রসিক চিত্তকে সে মুহূর্তে আলোড়িত করিয়া তোলে। তাহার অভিনব সৌকুমার্য এবং চমৎকারিত্ব, তাহার লোকোত্তর রমণীয়তা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য মনকে অভিভূত করিয়া দিবেই। ভাল সাহিত্যের লক্ষণই এই,—তাহাকে পড়িয়া শেষ করিলেই সে শেষ হইয়া যায় না,—তাহার ধ্যানরূপ নব নব রসালোকে আমাদের চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তোলে। তাই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রবলতম যুগ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও আমরা দেখিতে পাই সেই বৈষ্ণব-কবিতার পুনরাবির্ভাব।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে এই বৈষ্ণবী বাসনাটি প্রায় লোপ পাইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারার সংস্পর্শে জীবন এবং ধর্মকে আমরা সে যুগের নূতন আলোকে অনেকখানি নবীন করিয়া পাইয়াছিলাম ; মনুষ্যত্বের অনন্ত মহিমা দেবত্বের গাম্ভীর্যকে অনেকখানি ম্লান করিয়াছিল। মানুষের জীবন—তাহার প্রেমের অনন্ত বৈচিত্র্যকে মানুষ এমন নিবিড় করিয়া

অনুভব করিতে শিখিল যে, তাহাকে আর রাধাকৃষ্ণের কোঠায় পৌঁছাইবার সে প্রয়োজন বোধ করিল না; শুধু তাহাই নহে,—বৈষ্ণব-কবিতার সমগ্র রস-মাধুর্যকেও সে মর্ত্যলোকের নর-নারীর প্রেম-নির্যাস বলিয়াই গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। মনের এই পটভূমি লইয়া বাঙালী কবিগণ যে বৈষ্ণব-কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া এই পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারার যুগেও বাঙালীর চিত্ত বৈষ্ণব-কবিতার অনন্যসাধারণ রমণীয়তায় কিরূপ বিমথিত হইয়াছিল, আমরা শুধু তাহারই সন্ধান পাই,—সত্যকারের বৈষ্ণব-কবিতা আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে আশা করিতে পারি না।

বৈষ্ণব-কবিতাকে আমরা যদি নর-নারীর বিচিত্র প্রেম-প্রকাশের একটি বিশেষ ভঙ্গি মাত্র মনে করি, তবেও বলিতে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে নর-নারীর প্রেম-প্রকাশে আমাদের অন্যরীতি আসিয়া গিয়াছিল। কবিওয়ালাদের সময় হইতেই দেখিতে পাই,—কানু ছাড়াও গীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর যত কাব্য-কবিতা তাহা প্রায় কানু ছাড়াই,—এবং উনবিংশ শতকের শেষ অর্ধে কানুকে যেখানে গীতের ভিতরে আসিতে হইয়াছে, সেখানেও মানুষ হইয়া। ইহার মাঝখানে যখন বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, ভানুসিংহ প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিতার আসরকে আবার গরম করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তাহা যে সবটুকু না হইলেও অনেকখানিই কৃত্রিম হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোনও বিশিষ্ট সাহিত্যকে অনুকরণ করাই যে সাহিত্যের পক্ষে একটি দুরপনেয় কলঙ্ক একথা বলা যায় না; কিন্তু সাহিত্যের মর্যাদা সেইখানেই সবচেয়ে অধিক ম্লান যেখানে সেই অনুকরণের ভিতরে আসিয়া পড়ে কৃত্রিমতা। শুধু বাহিরের রীতি বা প্রকাশ-ভঙ্গিকে অনুকরণ করিয়াই আমরা যে সেই সাহিত্যকে অনুকরণ করিতে পারি, সাহিত্যের আসরে এতবড় ভ্রান্ত ধারণা অতি বিরল। আজকাল অনেকের ভিতরেই পল্লীগীতি রচনা করিবার একটা দুর্নিবার ঝোঁক আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আমার মনে হয়, শহরের ত্রিতল বাড়ির বৈদ্যুতিক আলো-পাখার তলে বসিয়া বাঙলার পল্লীকে চোখের দেখাও দেখেন নাই এমন অনেক কবির পক্ষে এই জাতীয় পল্লীগীতি যা, তাহাকে শুধু একটি শব্দের দ্বারাই প্রকাশ করা যায়,—উহা সাহিত্যের 'ন্যাকামি'। শুধু মহাপ্রাণ বর্ণকে 'হ'-কারে পরিণত করা, বর্গের প্রথম দ্বিতীয় বর্ণকে তৃতীয় বা চতুর্থে পরিবর্তিত করা বা তৃতীয়-চতুর্থকে প্রথম দ্বিতীয়ে পরিবর্তিত করা এবং ইহার সহিত আধা-পূর্ব এবং আধা-পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি ক্রিয়াপদ মিশাইয়া দিয়া তাহার সহিত একটি ভাটিয়ালি সুরের সংযোগ ঘটাইয়া দিতে পারিলেই যে একেবারে অপূর্ব পল্লীগীতি বনিয়া যায়, এ-কথাটি কিছুতেই মানিব না। পূর্ববঙ্গের নদী-গাঙের ভিতরে একাকী নিরালা ছোট্ট নৌকাখানি ভাসাইয়া দিয়া মাঝি-মাল্লাদের অন্তরে যে প্রেম প্রাণ খোলা সহজ সুরে ধ্বনিয়া ওঠে,—

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের ভিতরে ধান নিড়াইতে নিড়াইতে শ্যামল ধানের সোনার শীষের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্তরে যে অমার্জিত বেদনা—যে অনাড়ম্বর আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়,—সে শুধু বর্ণ-বিন্যাস বা কথার বাঁধুনির বিশিষ্ট ভঙ্গিমাত্র নহে,—পল্লীর সে ভাটিয়ালি সুরে কাঁপিয়া বেড়ায় মুক্ত প্রাণের ছন্দিত স্পন্দন।

এই ভাবধারার পার্থক্য—এবং তৎপ্রসূত কৃত্রিমতার জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-কবিতাকে আমরা সেই প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিতার সহিত সমসূত্রে গাঁথিয়া দিতে পারি না। শুধু তাহাই নহে, এই কৃত্রিমতা দোষেই এ-জাতীয় কবিতা সত্যকার সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রথমতঃ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই ধরা যাক। তিনি 'বিষবৃক্ষে'র ছদ্ম-বেশী বৈষ্ণবী এবং 'মৃণালিনী'র ভিখারিণী গিরিজায়াকে দিয়া বৈষ্ণব-কবিতা গাওয়াইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র আদর্শ বৈষ্ণব-কবিতার কৃষ্ণচরিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং বৈষ্ণব-কবিতায় ও বিবিধ পুরাণে গোপীগণের সহিত অবৈধ প্রেম-সম্বন্ধের ফলে কৃষ্ণ-চরিত্রে যে কালিমা বহু শতাব্দী ধরিয়া পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে কৃষ্ণ চরিত্রকে মুক্তি দিয়া তাঁহাকে অনুশীলন ধর্মের আদর্শে মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ করিয়া আঁকিয়া তোলাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য। সেই বঙ্কিমচন্দ্র যখন কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব-কবিতা লিখিতে বসিলেন,—

"কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান ?
ব্রজ কি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজ-জন টুটায়ল পরাণ ॥
মিলি গেই নাগরী, ভুলি সেই মাধব,
রূপ-বিহীন গোপ-কুঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী ॥" ইত্যাদি।

তখন স্পষ্টই বোঝা যায় ইহা বৈষ্ণব-কবিতার উপরে মক্স মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের ভিতরেই তাঁহার ছড়া-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এই ছড়ার ভিতর দিয়া নায়িকাদের কথোপকথন অথবা ভিখারিণী প্রভৃতিদের ছড়া এবং গানের ভিতর দিয়া বক্তব্য বিষয়ের একটা অস্পষ্ট আভাস দেওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বাঁধারীতি ছিল। বঙ্কিম-চন্দ্রের বৈষ্ণব-কবিতাগুলি অনেকখানি এই জাতীয় ছড়ারই রূপ ভেদ। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় বৈষ্ণব-কবিতা তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার প্রেমসঙ্ঘটন করাইবার জন্যেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একটি গান সুন্দরই হইয়াছে, এবং উপন্যাসের আবেষ্টনী হইতে তাহাকে বৈষ্ণব-কবিতাবলীর ভিতর ঢুকাইয়া দিলে, সে বেমালুম বৈষ্ণব-কবিতা বলিয়া চলিয়া যায়। যেমন 'মৃণালিনী'তে গিরিজায়ার গান :—

মথুরা-বাসিনি,	মধুরহাসিনি,	শ্যাম-বিলাসিনি রে।
কহ লো নাগরি,	গেহ পরিহরি,	কাহে বিবাসিনী রে॥
বৃন্দাবন-ধন,	গোপিনী-মোহন,	কাহে তু তেয়াগী রে।
দেশ দেশ পর,	সো শ্যাম-সুন্দর,	ফিরে তুয়া লাগি রে॥
বিকচ নলিনে,	যমুনা পুলিনে,	বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনী,	যা মধুযামিনী	না মিটিল আশা রে॥
সা নিশা সমরি,	কহ লো সুন্দরি,	কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনি যাওয়ে চলি,	বাজয়ি মুরলী,	বনে বনে একা রে॥

অথবা,— শুনহু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে,
যব শুনন্ লাগি সই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো?

ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যাম-পদমূলে।
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি
মরণ না ভেলো?

কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতার অমোঘ মোহিনী শক্তির পরিচয় সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায় মধুসূদনের বৈষ্ণব-কবিতা 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে'র ভিতরে। আশৈশব পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় পরিবর্ধিত এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অনুরক্ত খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী মধুসূদন যে সেই বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া বৈষ্ণব-কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা পরম বিস্ময়ের বস্তু

সন্দেহ নাই। মধুসূদন যে কেন এই কবিতা লিখিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালী আদিরসেরই কবি, ...মধুসূদন যদিও জাতীয় প্রবণতা অতিক্রম করিয়া মেঘনাদ-বধ রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি আদিরসের মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লেখনী ঘুরিয়া আসিয়া আদিরসের পথে দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার তিলোত্তমা-সম্ভব ও মেঘনাদ-বধ তাঁহার বিজাতীয় শিক্ষার ফল। ব্রজাঙ্গনা তাঁহার জাতীয় প্রবণতার নিদর্শক। বৈষ্ণব-কবিগণই বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রথমে আদিরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহাদিগেরই কাব্যের আদর্শে ব্রজাঙ্গনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।" এখানে যোগীন্দ্র বাবুর মতটি এইরূপ মনে হয় যে, বাঙালীর আদি-রসের ধাতটি মধুসূদনের বিদেশী ধাতগুলির ভিতর দিয়া যেদিন প্রাধান্য লাভ করিল সেই দিনই তিনি আদিরসের কবি ব্রজাঙ্গনার রচয়িতা। এখানে লক্ষ্য করা দরকার,— 'কৃষ্ণকুমারী নাটক,' 'মেঘনাদ-বধ' এবং 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' মধুসূদনের একই সময়ের রচনা। ইহার ভিতরে প্রথমে 'কৃষ্ণকুমারী' সারা হইয়াছে; 'কৃষ্ণকুমারী' পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির অনুকরণে লেখা,—'মেঘনাদ-বধ'ও পাশ্চাত্ত্য এপিক্ কাব্যের প্রেরণায় লিখিত। এই দুইয়ের মাঝখানে যে প্রেম-কবিতার উদ্দীপনাটি ব্রজাঙ্গনা-কাব্য সৃষ্টি

করিয়াছে তাহার ললাটে বাঙালীর আদিরসের ধাতটি মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যায় কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। ব্রজাঙ্গনা রচনার পূর্বে মধুসূদন রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—"But I suppose, I must bid adieu to Heroic poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wild field of Romantic and lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the lyrical way". অর্থাৎ—"আমার মনে হয়, মেঘনাদের পর আমাকে বীররসের কবিতা বিদায় দিতে হইবে। এ ধরণের কোন নূতন চেষ্টা আমার পক্ষে একটা পুনরুক্তির মতই হইবে। আমার সম্মুখে রোম্যান্টিক এবং লিরিক কবিতারই বিস্তৃত ক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি, এবং আমার মনে হয়, লিরিক কবিতার দিকে আমার একটা ঝোঁকও আছে।" ইহা হইতে মনে হয়, ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অনুপ্রেরণা অনেকখানি পাশ্চাত্ত্য লিরিক কবিতার।

কেহ কেহ বলেন, 'ব্রজঙ্গনা-কাব্য' বাঙলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রেম-গীতিকার সর্বপ্রথম আমদানি। তবে প্রেম বর্ণনা করিতে রাধাকৃষ্ণের মুখোস গ্রহণ করাই বাঙলা-সাহিত্যের চিরন্তন রীতি। ইহার ফলে প্রেম-কবিতা যতই জড়তাগন্ধী বা কামগন্ধী হোক না কেন, তাহাকে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া লইতে মুস্কিল হয় না। 'ব্রজাঙ্গনা-

কাব্যে'ও মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য প্রেম-কবিতায় এই বৈষ্ণবী রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। এখানেও ভাবিবার কথা আছে। 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' যদি পাশ্চাত্ত্য প্রেম-কবিতারই প্রথম আমদানি হয়, তবে মধুসূদন ইহাকে পাশ্চাত্ত্য প্রেম-কবিতার ধরণেই না লিখিয়া বাঙালীর বৈষ্ণব রীতিটি গ্রহণ করিলেন কেন? বাঙালীর বৈষ্ণব আদর্শের উপর তিনি যে কোন দিন খুব শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন, এমন কথা বলা চলে না। বৈষ্ণব কবিদের প্রতিও তিনি খুব শ্রদ্ধা দেখান নাই। তারপরে বাঙালীর ধাতে আঘাত লাগে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সব্যসাচীর ন্যায় এমন কাজ মধুসূদন অনেকই করিয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দকে বাঙালী কাব্য-রসিকগণ সকলেই যে খুব আদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এমন নহে; তবু তিনি সমস্ত প্রতিবাদ এবং বিদ্রূপ সত্ত্বেও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করিয়াছেন। বাঙালীর প্রাণে আঘাত দেওয়া ট্র্যাজেডির প্রচলন করিতেও তিনি কোথাও ইতস্ততঃ করেন নাই। প্রাচীনকে ভাঙিতে এবং নবীনকে গড়িয়া লইতে কোথাও তাঁহার দ্বিধা ছিল না। বিদ্রোহীর ন্যায় তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে চিরদিনই নির্ভীক। শুধু পাশ্চাত্ত্য প্রেম-কবিতাকে এদেশে আমদানি করিতেই যে তিনি রাধা-কৃষ্ণের মুখোসটি কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার এই, বাঙলা সাহিত্যের

যে-সকল প্রাচীন কবিকে মধুসূদন অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাদের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস। তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি গ্রীক, ইংরেজ, ফরাসী, সংস্কৃত এবং বাঙলার অনেক কবির উদ্দেশ্যেই তাঁহার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন,—কিন্তু বাঙলা-সাহিত্যের প্রাচীন কবিসম্রাট চণ্ডীদাস বা অন্য কোন বৈষ্ণব কবির কোন উল্লেখ মাত্রও নাই, এক জয়দেবের নাম আছে,—সেও বোধ হয় সংস্কৃত বলিয়া। বাঙলার বৈষ্ণব কবিদের প্রতি মধুসূদন স্থানে স্থানে বরঞ্চ বেশ একটু অবজ্ঞাই প্রকাশ করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry leave aside all religious bias. Besides Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the begining, she would have been a very different character. It is the vile imagination of the poetasters that has painted her in such colours." অর্থাৎ,—"আমার মনে হয় বেচারা ব্রজ-রমণীটির উপরে তুমি একটু বিরূপ; কিন্তু যখন কবিতা পড়িতে বসিবে তখন মন হইতে সর্বপ্রকার ধর্মের পক্ষপাতিত্ব দুর করিয়া দিও। তা

ছাড়া, মিসেস্ রাধা মোটের উপরে খুব যে একটা খারাপ স্ত্রীলোক তাহা নহে ; প্রথম হইতেই যদি তোমার এই বিনীত ভৃত্যটির মত তাহার একটি চারণ থাকিত, তবে তাহার চরিত্রও অনেকখানি অন্যরূপ হইয়া যাইত। বালখিল্য কবিদের জঘন্য কল্পনাই তাহাকে এই রঙে রঞ্জিত করিয়াছে।” এই বালখিল্য বৈষ্ণব কবিদের প্রতি মধুসূদনের অশ্রদ্ধার বেশ প্রাচুর্য আছে, এবং ইহাদের হাতে পড়িয়াই যে মিসেস্ রাধা নামক ভদ্র মহিলাটি একেবারে ন্যস্ত-নাবুদ হইয়াছেন সে বিষয়েও মধুসূদনের কোন সংশয় ছিল না। ‘শৃঙ্গার-রস’ নামক কবিতায় মধুসূদন বলিতেছেন,—

হাত ধরা-ধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণীচয়, কামাগ্নি নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ ভূষণে
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গছলে।

সুতরাং রাসলীলাও যে শুধু কামকেলিরই ছলনা মাত্র এ বিষয়ে মধুসূদনের কোন সংশয় ছিল না। এই সমস্তের ভিতর দিয়া বৈষ্ণব-কবি এবং বৈষ্ণব-কবিতার প্রতি মধুসূদনের যে কি মনোভাব ছিল তাহা বুঝিতে কিছুই বেগ পাইতে হয় না।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মধুসূদনকে সেই জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির বৈষ্ণব-কবিতাকে অনুসরণ করিয়াই রাধা-কৃষ্ণপ্রেম অবলম্বনে কবিতা লিখিতে হইয়াছে। কুমড়ো

পোকাকে তেলেপোকা একবার ছুঁইয়া দিলে সে দিনরাত অনন্যচিত্তে বসিয়া তেলেপোকারই ধ্যান করিতে থাকে, এবং ধ্যান করিতে করিতে সে নিজেই তেলেপোকা হইয়া যায়। মধুসূদনের গভীর কবিচিত্তকে বাঙলার বৈষ্ণব-কবিতার লোকোত্তর রমণীয়তা যেদিন স্পর্শ করিয়াছিল, সেদিন 'সুন্দরী ভেলি মাধাই'! তাই সাহেব মধুসূদনও হ্যাট্-কোট্ ছাড়িয়া ধুতি-চাদর লইয়া বৈষ্ণব-কবিদের দলে ভিড়িয়া গেলেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিদের দলে একবার ভিড়িয়া পড়িতে পারিলেই যে বৈষ্ণব-কবি বনিয়া যাওয়া যায় তাহা নহে,—তাই ধুতি চাদরের নিম্নে মধুসূদনের কোট-পেণ্টুলুনকে চিনিয়া লইতে খুব বেগ পাইতে হয় না।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'কে সমগ্রভাবে বিচার করিলে মোটের উপরে এই কথাই মনে হয়, রাধা যেন সত্যই অনেকখানি মিসেস্ রাধা হইয়া গিয়াছে। সে আর প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নাই,—তাহার প্রাকৃতত্ব একেবারে স্পষ্ট। তাই মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' খানিকটা তাঁহার 'বীরাঙ্গনা'রই সহোদরা হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের রাধারাণী হইতে প্রাকৃত নায়িকা বলিয়াই ভ্রম হয় বেশী।

এই স্বর্গ-মর্ত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির রাধা হইতে প্রকৃতিতেই যেন মধুসূদনের রাধা অনেকখানি পৃথক। মধুসূদনের রাধা

প্রথমাবধিই বিরহিণী এবং দিব্যোন্মাদিনী। বৈষ্ণব কবিদের রাধা পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমানে যতই সুচতুরা হোক না কেন, বিরহে সে বাণবিদ্ধা হরিণী। বুকের কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই,—তাহার এক একটি দীর্ঘ-শ্বাসই যেন বৈষ্ণব কবিদের ভাষা ও সঙ্গীত অবলম্বন করিয়া এক একটি কবিতা হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের রাধা বিরহেও বড় সুচতুরা,—হৃদয়ের আবেগ হইতে তীক্ষ্ণ কথার বাঁধুনিই যেন স্থানে স্থানে বড় বেশী হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরের গভীর বেদনা অপেক্ষা ঝাঁজটাই যেন প্রকাশ পাইয়াছে বেশী।

•

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র ভিতরে সংস্কৃত কবিদের—বিশেষতঃ কালিদাসের প্রভাবও কম নয়। 'মলয়-মারুত' কবিতাটি যেন কালিদাসের 'মেঘদূত'কে সম্মুখে রাখিয়াই লেখা। রাধিকার প্রথম সম্ভাষণ,—

> শুনেছি মলয়গিরি তোমার আলয়
> মলয় পবন;—'

আমাদিগকে 'মেঘদূতে'র—'জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাম্' প্রভৃতি মনে করাইয়া দেয়। রাধা পবন-দূতকে পথের সকল প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সাবধান করিয়া দিতেছে,—

> দেখি তোমা পীরিতির ফাঁদ পাতে যদি
> নদী রূপবতী;

মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হের না হের না, দেব, কুসুম-যুবতী।
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভ-ধন,
অবহেলি সে ছলনা যেও, আশুগতি।

ইহা আমাদিগকে মেঘের প্রতি যক্ষের সাবধান বাণী ;—

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজল-নয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥

প্রভৃতির কথাই মনে করাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া পৌরাণিক কথাও রাধাকে দিয়া মধুসূদন অনেক বলাইয়াছেন। যমুনাকে সম্বোধন করিয়া রাধা বলিতেছে,—

তপন-তনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে,

পৃথিবীকে রাধা বলিতেছে,—

যবে দশানন-অরি,
বিসর্জিলা হুতাশনে জানকী-সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা, বরাননে !
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা, বাসুকি-রমণী !

'গোপ-গোয়ালিনী বিরহিণী' রাধার মুখ দিয়া এত পুরাণাদির নজির বাহির না করাইলেই বোধ হয় ভাল হইত। তারপরে যমুনাপুলিনে আসিয়া রাধার শুধু মনে পড়িয়া

গেল,—'তপন তনয়া তুমি'! যমুনা কি শুধু তপন-তনয়া? রাধার কি সে কেউ নয়? নবীনা কিশোরী যে রসময়ী রাধা নবীন কিশোর রসময় কৃষ্ণের প্রেমে পড়িয়া ভরা কলসী শূন্য করিয়া বেলা পড়িয়া আসিলেই 'জলকে চল'-এর ভান করিয়া কৃষ্ণের দর্শন-আশে পাগলিনীর ন্যায় এই যমুনার কূলে ছুটিয়া আসিত,—যে রাধা 'কালো বরণ' শ্যাম বলিয়া যমুনার অতল-কালো জলের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকিত, আবার কখনও অভিমানভরে যমুনার কালো জল হইতে চোখ ফিরাইয়া লইত,—যে যমুনা রাধার প্রেমে জ্যোৎস্না-হসিত—রাধার অশ্রুপ্লাবনে উদ্বেল—সেই যমুনাকে দেখিয়া বিরহিণী রাধার আর কোন কথাই মনে পড়িল না, মনে পড়িল শুধু—

তপন-তনয়া তুমি; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে,—!

সত্যই মধুসূদনের রাধার বিরহের ভিতরেও বড় যুক্তি,—বড় তর্ক—বড় আইন-বিধির নজির, আবেগ অপেক্ষা তরল উচ্ছ্বাস এবং ছাঁদুনিই বেশী। দিব্যোন্মাদিনী রাধা প্রথমেই বলিতেছে,—

যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে,
মদন-রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর-অরি,
কে সংবরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে?

ইহা যেন ন্যায়শাস্ত্রের উত্তর পক্ষ! শুধু কি যুক্তি-তর্ক?—ঈর্ষান্বিত তীব্র খোঁচাই কি কম?

ফুটিছে কুসুম দল, মঞ্জুকুঞ্জ-বনে রে,
যথা গুণমণি!
হেরি মোর শ্যামচাঁদ পীরিতের ফুলফাঁদ
পাতে লো ধরণী।
কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী?

ইহাতে দহন অপেক্ষা দাহনই যেন বেশী! আবার অন্যত্র রাধা পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—

লোকে বলে, রাধা কলঙ্কিনী।
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি?
অনন্ত, জলদ-নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি
তবু তুমি মধু-বিলাসিনী!

সুরটি অতি নিম্ন স্তরের। রাধা তাহার স্বামীর জন্য (কৃষ্ণকে মধুসূদন রাধার স্বামীই করিয়া লইয়াছিলেন) আইনতঃ শোক করিতে পারে, বহু-ভর্তৃকা অসতী পৃথিবীর এসম্বন্ধে কোন বক্র দৃষ্টিই শোভা পায় না, ইহাই খোঁচাটির প্রতিপাদ্য বিষয়। বৈষ্ণব-কবিতার রাধার পৃথিবীর কয়জন স্বামী তাহা জানিয়া এই তীব্র খোঁচা দিবার মত ঝাঁজাল বুদ্ধি ছিল না। নিজেকে কলঙ্কিনী বলিলে তাহা স্থালন করিতে

রাধা কোন দিন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে নাই; অপবাদ যত দিন সহ্য করিতে পারে নাই, তত দিন,—

সই, লোকে বলে কালাপরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যাজিয়াছি কাজরের সাধ ॥
যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে ॥

তারপরে যখন প্রেমে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, তখন রাধা মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছে,—

ননদি, বল গে যা তুই নগরে।
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে ॥

শুধু তাহাই নয়ঃ—

বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে ॥

এ কলঙ্কের ডালি মাথায় লইতে রাধার লজ্জা নাই, দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই,—

কলঙ্কী বলিয়া ঘোষে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম তোমার চরণ খানি ॥

কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতার সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা'র বেশী তুলনা-মূলক

সমালোচনা করিয়া লাভ নাই, কারণ পূর্বেই দেখিয়াছি, মধুসূদনের মূল দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল অন্যরূপ। কিন্তু মধুসূদন যে 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' লিখিয়াছেন, ইহাই তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয়, এবং শুধু তাহাই নহে, বৈষ্ণব-কবিতার মোহিনী শক্তিও কত অমোঘ তাহারও পরিচয় পাই আমরা এই 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে'র মধ্যে। খাঁটি লোহা হইলে চুম্বক তাহাকে আকর্ষণ করিবেই; মধুসূদনের অন্তরে ছিল একটি সত্যকার কবিচিত্ত, তাই বৈষ্ণব-কবিতা তাঁহার অন্তরে সৃষ্টি করিয়াছিল একটি স্বকীয় প্রকাশের বেদনা, তাহারই ফলে 'ব্রজাঙ্গনা'র সৃষ্টি। এই সকল দেখিয়া শুধু নীরবে বসিয়া ভাবিতে হয়, মধুসূদনের ছিল একটা কি বিরাট প্রতিভা! যে বিরাট সম্ভাবনা তাঁহার চিত্তের মধ্যে ঘুমাইয়া ছিল, আমরা তাহার কতটুকু মাত্র আভাস পাইয়াছি!

দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা সত্ত্বেও মধুসূদন যে স্থানে স্থানে সত্যই বৈষ্ণব কবি হইতে পারিয়াছিলেন, এবং 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'ও যে প্রেম-কাব্য হিসাবে অনেক স্থানে মধুর হইয়া উঠিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে বিরহে ব্রজবাসী সকলেই কাতর; পশুপক্ষী, তরুলতা—কৃষ্ণের বিরহে সকলেই বিমর্ষ, গাছে আর ফুল ফোটে না, যাহা ফোটে তাহাতেও অলি-গুঞ্জন নাই,—তরুশাখে পাখীর কূজন নাই,—সকলই আঁধার,—বিষাদ-মলিন; কিন্তু রাধা বলিতেছে,—

দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন ;
নলিনীর যত জ্বালা এত জ্বালা কার ?

আবার সখীগণ রাধাকে সাজাইবার জন্য বনলতা হইতে ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, কিন্তু আজ রাধার আর ফুল-সাজের সাধ নাই। সুগন্ধ ও সৌন্দর্য ফুল আপনি আস্বাদ করিতে পারে না ; কাহাকেও নিঃশেষে তাহা বিলাইয়া দিয়া যদি আপনাকে একটি নিবিড়তম রসোপলব্ধির ভিতরে অনুভব করিতে পারে তবেই সে সার্থক। নারী-প্রকৃতিও ঠিক এই ফুল-প্রকৃতি। তাই কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার আজ আর ফুল-সাজের সাধ নাই ঃ—

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি,— ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হ'লে, পরে কি রজনী তারার মালা ?

রাধার ত আজ কেহই নাই, কিন্তু লতার ত অলি-বঁধু আছে, ঐ যে পুষ্প হইতে অলির মধু-আহরণ সেইখানেই লতার সার্থক জীবন। তাই,—

কেন লো হরিলি, ভূষণ লতার— বন-শোভিনী !
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার,— হতভাগিনী ?

যে বাঁশীর তান শুনিয়া বৈষ্ণবের রাধা পাগলিনী, সেই বাঁশী শুনিয়াই মধুসূদনের রাধা বলিতেছে,—

ওই শুন, পুনঃ বাজে, মজাইয়া মন রে, মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কানে,— আমি শ্যামদাসী।

আবার—

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি, মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ-বনে ?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি দ্বিগুন আগুন জলে গো মনে !
এ আগুনে কেন আহুতি দান ? অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?

কোথাও রাধার প্রেমোন্মাদিনী ছবিখানি সত্যই প্রাণ-স্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। সখীদিগের নিকট কৃষ্ণের আগমনের আশ্বাস পাইয়া রাধা বলিতেছে,—

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণে জ্বালা;
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

বিরহ-বিধুরা রাধার নয়ন-জলে আজ ব্রজের তরুলতা, শ্যাম তৃণদল, কাননের কুসুমরাশি সকলই সিক্ত। রাধা তাই বলিতেছে,—

হে শিশির ! নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে, ব্রজে আজি তব জলে
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার ;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল।

রাধা আবার একটি কৃষ্ণচূড়া ফুল হাতে করিয়া সখীকে বলিতেছে,—এই যে ফুলের পাপড়ির উপর মুক্তাফলের ন্যায়

বিন্দু বিন্দু বারিকণা, তুই ভাবিয়াছিস্ ইহা শিশির-পড়া জল! কিন্তু—সে ভুল,—

লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়নজলে, সেই জল এই দলে,
গ'লে প'ড়ে শোভিতেছে, দেখ লো, কামিনি!

'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে' বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির নিগূঢ় সংযোগ ইহার আর একটি অভিনব মাধুর্য। অন্তরের সুখদুঃখের গভীর অনুভূতিগুলি আত্ম-প্রকাশের জন্য নিজেদের সমপ্রাণ সখাসখী খোঁজে। প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিতার ললিতা-বিশাখার পরিবর্তে 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে' বিশ্ব-প্রকৃতিই অনেক-খানি সখীরূপ ধারণ করিয়াছে; তাহাতে ললিতা-বিশাখা হয়ত ছায়ামাত্র হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কাব্যের একটি নবসুর সহজেই পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। রাধার আজ জলধর, যমুনা, ময়ূর, পৃথিবী, প্রতিধ্বনি—সর্বত্রই এই সখীত্ব, তাই সকলকে ডাকিয়া আনিয়াই অন্তরের জ্বালা মিটাইবার সাধ। শুধু তাহাই নয়, বিরহের গভীরতার ভিতর দিয়া রাধার প্রেমের ভিতরে আসিয়াছে সর্বত্র একটা একাত্মবোধ এবং সহানুভূতি; তাই পিঞ্জরাবদ্ধা বিরহিণী সারিকাকে দেখিয়া রাধা বলিতেছে,—

ওই যে পাখীটি, সখি! দেখিছ পিঞ্জরে রে
সতত চঞ্চল,—

কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী প্রায়,
জলে যথা জ্যোতিবিম্ব তেমতি তরল।
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি।

আজ যে জাতি-কুল-মান, শাশুড়ী-ননদীর ভয়ে বদ্ধ রাধার প্রাণ কৃষ্ণ-বিরহে ঐ পিঞ্জরাবদ্ধা সারিকার মতই ছট্‌ফট্ করিতেছে,—আজ সারিকার ব্যথা রাধারই বুকের ব্যথা। তাই,—

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে,—
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী,
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়!

শুধু তাহাই নহে,—নিজের সম্বন্ধেও রাধা বলিতেছে,—

দেহ ছাড়ি যাই চলি যথা বনমালী;
লাগুক কুলের মুখে কলঙ্কের কালী।

বিরহের তীব্রাবস্থাই দিব্যোন্মাদে পরিণত হয়, তারপরেই ভাবসম্মিলন। দিব্যোন্মাদের আভাস আমরা 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে'র প্রথম হইতেই পাই; কিন্তু প্রথম প্রথম ভাবের আবেগ হইতে কথার ছাঁদুনিই ছিল বেশী। কিন্তু 'বসন্ত' কবিতাটিতে দেখিতে পাই,—

মুছিয়া নয়ন জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমালতলে বেণুর সুরব—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

যুক্তির বহর নাই,—শুধু 'আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব'! শুধু প্রেমের বিশ্বাস—হৃদয়ের অনুভূতি! কিন্তু রাধার এই উন্মাদিনী অবস্থা দেখিয়া সখীগণ শুধু নতমুখে কাঁদিতেছে, রাধা তবুও কিছু বোঝে না,—তবু যে কৃষ্ণ কুঞ্জে আসে নাই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি, করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদন-চাঁদ, কহ রূপবতি !

আজ রাধার পূজার উপচার,—

পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে।
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

এ যৌবন-ধন, দিব উপহার রমণে।
ভালে যে সিন্দূর বিন্দু হইবে চন্দন-বিন্দু ;
দেখিব লো দশ ইন্দু সুনখ-গগনে,
চির প্রেমবর মাগি লব, ওলো ললনে !

এখানে শ্রীমধুসূদন চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রভৃতিরই সমশ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারিয়াছেন।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে'র পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সব চেয়ে বেশী। অবশ্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

হেমচন্দ্রও বৈষ্ণব-কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মোটেই উল্লেখ যোগ্য নহে। হেমচন্দ্রের "চিত্ত-বিকাশে"র "স্মৃতি-সুখে"র ভিতরে দেখিতে পাই শ্রীরাধা ময়ূরকে বলিতেছে,—

তোর নাচে তিনি তুড়ি দিয়া দিয়া,
নাচাতেন আরো ঠারি আমায়,
কভু তোর নাচে উল্লাসে মাতিয়া,
নাচিতেন হেম-নূপুর পায়।

... ...

বড়ই সম্ভ্রম করিতেন তিনি,
সেই প্রিয় সখা তোয় আমায়।
তোর পাখা লয়ে বাঁধিয়া চূড়ায়
ধরিলেন কিনা আমার পায়।

ইহার ভিতরে হেমচন্দ্র বাঙালীর চির পরিচিত 'তিনি' ও 'উনি'র আমদানি করিয়া একেবারে মাটি করিয়াছেন। 'ব্রজবালক' কবিতাটি ভাল হইয়াছে।—

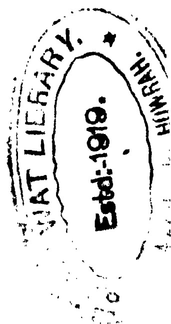
সুচারু সুন্দর বিনোদ রায়, কে সাজাল তোমা হেন শোভায়,
নয়ন বঙ্কিম কিবা সুঠাম, চারু গ্রীবাভঙ্গি ঈষৎ বাম,
ভালে ভুরূযুগ আকর্ণ টান, অপাঙ্গ ভঙ্গীতে চমকে প্রাণ,
মোহন মূরতি চিকণ কালা, রূপের ছটায় জগ উজলা।

... ...

বনফুল মালা গলায় সাজে, চলিতে চরণে নূপুর বাজে,
নটবর বেশ রসিক রাজ, সদাই বিহরে নিকুঞ্জ মাঝ।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। কাব্যের যে অনুপ্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেই জাতীয় অনুপ্রেরণায়ই সৃষ্টি হইয়াছে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। ধর্ম বিশ্বাস হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে কোন দিনই বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসবান্ নহেন একথা আর প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। সুতরাং ভানুসিংহ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের মুখোস মাত্র, এবং তাঁহার পদাবলীও অনেকখানিই বৈষ্ণব-কবিতার ছায়া। বৈষ্ণব-কবিতার ভাষা-মাধুর্য, তাহার ছন্দের ঝঙ্কার, তাহার অপরূপ রস-বৈচিত্র্য তরুণ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে একেবারে উন্মথিত করিয়া দিয়াছিল; মেঘ-গর্জনে ময়ূরের ন্যায় তাঁহার কবিচিত্ত শতবর্ণের শত সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল। সে উন্মাদনা, সে ভাবসম্বেগকে গভীর ধ্যানের মধ্যে আপনার অন্তরের ভিতরে সম্বরণ করিয়া লইতে পারেন, তাহাকে হৃদয়-বৃত্তির জারক-রসে একেবারে আপনার করিয়া লইতে পারেন, এতখানি পরিপাক শক্তি তাহার ছিল না। ফলে যে রসানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল তরুণ কবির প্রাণে তাহা আর কোন নিজস্ব রূপে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিল না,—তরল উচ্ছ্বাসের ভিতরেই 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে তাহা প্রকাশ পাইল। রবীন্দ্রনাথের পরিণত কালের সাহিত্যের উপর এই বৈষ্ণব-সাহিত্যের এবং বৈষ্ণব ভাবধারার যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে ইহা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট

কাব্য-সত্তার সহিত জড়িত হইয়া একটি নিজস্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গলে'র—



যুথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমাল কুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপ-শাখে সখী ফুল ডোরে বাঁধো ঝুলনা॥

হয়ত আমাদিগকে কালিদাসের 'ঋতু-সংহারে'র সহিত বৈষ্ণব কবিতাকেও স্মরণ করাইয়া দিবে; কিন্তু ইহা বৈষ্ণব-কবিতার নকল নহে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি, খণ্ড ও অখণ্ড, চিরন্তন ও ক্ষণিকের ভিতরে চলিতেছে যে অনাদি মধুর লীলা তাহাকে রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্রতায় প্রকাশ করিয়াছেন এই বৈষ্ণব রীতিতেই। তাইত 'জীবনদেবতা'র ভিতর দেখিতে পাই,—

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ যা কিছু আছিল মোর,
যত শোভা যত গান যত প্রাণ, জাগরণ, ঘুমঘোর।
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরা-বিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার নিশা আজি কি হয়েছে ভোর।
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আন নবরূপ, আন নব শোভা,

নূতন করিয়া লহ আর বার চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন-ডোরে॥

'গীতাঞ্জলি'র অনেক কবিতার ভিতরেই এই বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গিটি অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে,
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

অথবা,— আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি' হে প্রিয়তম,
চাহি যে বারে বার।
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।

অথবা,— বিরাম বিহীন বিজুলিঘাতে
নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষা-জলধারার সাথে
গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে
বাহির হ'লো তিমির তলে,
আকাশে খোঁজে ব্যাকুল বলে
বাড়ায়ে দুই হাত,

ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
করুণ আঁখি-পাত ॥

প্রভৃতি বৈষ্ণব অভিসারেরই নব ভঙ্গিতে একটি নিজস্ব রূপে সূক্ষ্ম প্রকাশ। বিশ্বসৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য-মাধুর্যের ভিতর দিয়া বিশ্বস্রষ্টা নিজেই যে তাঁহাব সৌন্দর্য-মাধুর্যের অনন্ত সম্ভাবনাকে অনন্তরূপে আস্বাদন করিতেছেন, সৃষ্টি-রহস্যের যবনিকান্তরালে ইহার চেয়ে বড় যে কোন গভীর তত্ত্ব নাই, ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি মূলসুর। এই দৃষ্টিতে বিশ্বের দিকে চাহিয়া দেখিলে ইহার কিছুই যে অর্থ-হীন মিথ্যা নহে,—শুধু অনাদি-অবিদ্যাজনিত মায়া নহে, এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব-মতবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোনও অমিল নাই।

সুতরাং দেখা যায় বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গিটি রবীন্দ্রনাথের ভিতরে পরিণত কালে একটি অভিনব নিজস্ব রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু 'ভানুসিংহের পদাবলী'র ভিতরে অনেকখানিই সুরের মোহ এবং ভাবের অপরিপাক; এখানে যেন কোন ভাবদৃষ্টি অপেক্ষা ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিতার বাহিরের রূপটিই তরুণ কবিচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বেশী। তবে যে বস্তু যে ধ্বনিকে ধরিয়া রাখিবার শক্তি রাখে যত বেশী, তাহার ভিতরে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনিও তত বেশী। রবীন্দ্রনাথের বিরাট মন্দির সম কবি-চিত্তে বৈষ্ণব-কবিতার যে সঙ্গীত প্রায় ধ্বনিটির তুল্য রবেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই রূপ লইল 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে; তাই

ধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনির যে সম্পর্ক, বৈষ্ণব-কবিতার সহিত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর সম্পর্ক তাহা হইতে কিছুই বেশী নহে। ব্রজবুলি ভাষাটি রবীন্দ্রনাথের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। ভাষাকে ভাবের সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্যের অনুরূপ যে যেমন ইচ্ছা ঢালাই করিয়া নেওয়া যায়,—সেখানে যে পদে পদে ব্যাকরণ এবং ভাষাতত্ত্বের কঠোর অভিভাবকত্ব না মানিয়া লইলেও চলে রবীন্দ্রনাথ তাহার সমগ্র কবিচিত্ত লইয়া একথায় সায় দিয়াছিলেন। খোকামণির 'লাল জুতা'জোড়া সকল ব্যাকরণ এবং ভাষাতত্ত্বের রক্ত আঁখিকে ফাঁকি দিয়া কখন যে 'লালজুতুয়া' হইয়া গিয়াছে ইহা বড়ই কৌতুকপ্রদ! বৈষ্ণব কবি গাহিলেন,—

যত চপলতা করে চঞ্চলিয়া। তত কাঁদে প্রাণ তাহারই লাগিয়া॥

সংস্কৃত 'চঞ্চল' শব্দটির সহিত কোন্ অর্থে কি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া কোন্ যুগে যে 'চঞ্চলিয়া' রূপটি বিবর্তিত হইয়াছে বলা শক্ত। বিদ্যাপতি বলিলেন,—

নমুঙা বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিম শশী॥

এখানকার "নমুঙা' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ধারণ করা ভাষাতত্ত্বের এক ফ্যাসাদ বিশেষ। ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বকেও যে এমন করিয়া ফ্যাসাদে ফেলা যায় এ লোভটি রবীন্দ্রনাথের নিকট একেবারে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনিও ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব কবিতা না লিখিয়া পারিলেন না।

ব্রজবুলি রবীন্দ্রনাথের নিকট একটা ঐতিহাসিক সত্যমাত্র ছিল না, ইহা ছিল তাঁহার কবিচিত্তে কাব্য-জগতের একটি অভিনব আবিষ্কার। শুধু ব্রজবুলি নয়, বাঙলা কাব্যের সকল ধ্বনিমাধুর্যকেও পয়ার ও ত্রিপদীর একটানা তানের ভিতরে ডুবাইয়া না দিয়া প্রত্যেকটি স্বরের ধ্বনিমাধুর্যকে যে ছন্দের ভিতরে বিশিষ্ট করিয়া রাখা যায় বৈষ্ণব কবিদের —বিশেষতঃ, গোবিন্দদাসের এই ছন্দোমাধুর্যটিও রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে গভীর ভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর—

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ
হরিণ নেত্রে বিমল হাস, কুঞ্জবনে মে আও লো॥

প্রভৃতি গোবিন্দদাসের—

শারদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি মত্ত-মধুকর ভোরণি।
হেরই রাতি ঐছন ভাতি শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান কুলবতী-চিত-চোরণি॥

প্রভৃতিকে সম্মুখে রাখিয়াই লেখা। এই ছন্দটি রবীন্দ্রনাথের খুবই ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর অনেক কবিতাই এই ছন্দটির নানারূপ রকম-ফেরে রচিত।

বৈষ্ণব-কবিতার ছন্দের ভিতরে আর এক একটি ছন্দ তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের মনকে খুব আকৃষ্ট করিয়াছিল ; ইহা পঞ্চমাত্রার ছন্দ। জয়দেবের সময় হইতেই বৈষ্ণব কবিতায় এই ছন্দটি খুব প্রিয় ছিল। জয়দেবের—

বদসি যদি। কিঞ্চিদপি। দন্তরুচি-। কৌমুদী॥
হরতি দর-। তিমিরমতি-। ঘোরম্
স্ফুরদধর-। সীধবে। তব বদন-। চন্দ্রমা॥
রোচয়তি। লোচন-চ-। কোরম্

প্রভৃতি এই পঞ্চমাত্রার ছন্দ। বৈষ্ণব কবিগণ বৈচিত্র্যের জন্য অনেক সময় ৫ + ৪ + ৫ + ৪ এইভাবেও পর্ব ভাগ করিয়াছেন। যথা—

গ্রাম্যকুল। বালিকা। সহজে পশু-। পালিকা
হাম কিয়ে। শ্যাম উপ-। ভোগ্যা।
রাজকুল-। সম্ভবা। সরসিরুহ-। গৌরবা
যোগ্যজনে। মিলয়ে জন্তু। যোগ্যা॥

ভানুসিংহের এগার সংখ্যক পদটি এই ৫ + ৪ ছন্দেই রচিত।

আজু মধু চাঁদনী প্রাণ উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী, শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর, কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর কুসুম-বনমাঝ॥
মলয় মৃদু কলয়িছে চরণ নাহি চলয়িছে,
বচন মহু খলয়িছে, অঞ্চল লুটায়।

আধ কট শতদল, বায়ুভরে টলমল,
আখি জনু ঢল ঢল চাহিতে নাহি চায় ॥

পঞ্চমপদ,— সজনি সজনি রাধিকালো, দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া।

প্রভৃতির ছন্দটিতে বৈষ্ণব কবিদের ৬+৬+৬+৪ মাত্রার ছন্দটিকে রবীন্দ্রনাথ বেশ মানাইয়া লইয়াছেন।

দ্বিতীয় পদ,— শুনহ শুনহ বালিকা রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জকুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যাম চন্দ্র নাহিরে।
ভুলই কুসুম-মঞ্জরী, ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।

প্রভৃতি ৬ মাত্রার ছন্দেরই নিপুণ রকম-ফের, ইহার সহিত আমরা বিদ্যাপতির পদ—

যব—গোধূলি সময় বেলি
ধনি—মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে বিজুরি-রেহা দন্দ পসারিয়া গেলী ॥

প্রভৃতির তুলনা করিতে পারি।

নবম পদ— সতিমির রজনী, সচকিত সজনী শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে— বালা-বিরহ বিষন্ন।
নীল আকাশে, তারকা ভাসে যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর নির্ঝর ঝরঝর কুসুমিত বল্লি-বিতান ॥

প্রভৃতি জয়দেবের 'রতি সুখসারে' প্রভৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু এই সকল কবিতার ভিতরে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ইহা জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতিরই অনুকরণ

হইলেও ইহা একেবারে কৃতিত্ববর্জিত নহে। যে কবিপ্রাণ পরবর্তী যুগে নিপুণ নিখুঁত শত সঙ্গীতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহার অস্ফুট স্পন্দন ইহার ভিতরেও লুক্কায়িত আছে। ভাবধারার দিক হইতে অবশ্য 'ভানু সিংহের পদাবলী'তে কবির নিজস্ব কোন বৈষ্ণব দৃষ্টি নাই, এবং পড়িতে পড়িতে অনেকস্থলেই মনে হইবে, ইহা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের পদের ফেনায়িত রূপমাত্র। তবে মাঝে মাঝে কবি নিজের ভাবধারাও দু'একটি কবিতায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,—সেখানে রবীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব অস্পষ্ট ভাব রাধাকৃষ্ণের পোষাক পরিয়াছে মাত্র। যেমন,—

মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর পুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুহুঁ মম শ্যাম সমান।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে সর্বাপেক্ষা দোষ হইয়াছে ইহার তরুণোচিত অসংযত ফেনায়িত রূপ। প্রায় সবগুলি কবিতাই বিরহের; কিন্তু এখানে বিরহের তীব্রতা অপেক্ষা উচ্ছ্বাসই বেশী। বৈষ্ণবকবিদের প্রসিদ্ধ বিরহের কবিতাগুলি লক্ষ্য করিলে দেখিব, সেখানে বিরহের তীব্রতায় হৃদয়ের বেদনা যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে,—তাই এই জাতীয়

পদগুলি স্বভাবতই অতি ছোট। কিন্তু ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলি প্রায় সবই দীর্ঘ, তাহাতে কথার বাহুল্যে বেদনা তরলায়িত। এ দোষটি মধুসূদনেরও ঠিক একইরূপ। কিন্তু ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী যতই অপরিপক্ক হাতের রচনা হোক না কেন, সকল দোষ সত্ত্বেও ইহার যে নিজস্ব মাধুর্য কোথাও কিছুই নাই, একথা বলিলে ভানুসিংহ ঠাকুরের উপর অবিচার করা হইবে। স্থানে স্থানে এখানেও হৃদয়ের আঁচড় পড়িয়াছে। সখী যখন শ্যামের উদ্দেশ্যে রাধিকার বিরহদশা বর্ণনা করিতেছে—

একলি নিরল বিরল পর বৈঠত নিরখত যমুনা পানে,—
বরখত অশ্রু, বচন নাহি নিকসত, পরাণ থেহ না মানে।
গহন তিমির নিশি ঝিল্লি মুখর দিশি শূন্য কদম তরুমূলে,
ভূমি শয়নপর আকুল কুন্তল, কাঁদয় আপন ভুলে।

তখন ইহা বৈষ্ণব কবিতার প্রতিধ্বনি হইয়াও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আবার রাধিকার খেদোক্তি—

ইথি ছিল আকুল গোপ নয়নজল, কথি ছিল ও তব হাসি?
ইথি ছিল নীরব বংশী-বটতট, কথি ছিল ও তব বাঁশি!

করুণ মধুর হইয়া উঠিয়াছে। আবার অভিসার বর্ণনা—

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনীরে।

অথবা—বাদর বরিখন, নীরদ গরজন, বিজুলী চমকন ঘোর;
উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে নিতি নিতি মাধব মোর।

অঙ্গ বসন তব, ভীখত মাধব ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়— কাহ উপেখবি দেহ ?

প্রভৃতিও একেবারে মাধুর্য বর্জিত নহে। আবার—

সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব—
মথুরাপুর যব যায়,
করল বিষম পণ মানিনী রাধা
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা
কঠিন হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায়।

কিন্তু যখন সত্য সত্যই—

মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা, বয়ানপান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল, দণ্ড দণ্ড সখি—চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল বিন্দু বিন্দু জলধার।

ইহা অপরূপ নিজস্ব মাধুর্যে সার্থক।

ট্র্যাজেডি ও তাহার বিবর্তন

পরিভাষার যুগেও 'ট্র্যাজেডি' কথাটাই ব্যবহার করিতে হইল। প্রত্যেক ভাষাতেই কতগুলি শব্দ আছে যাহারা কালের স্রোতের ঘূর্ণিপাকে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে এমন কতগুলি বৈচিত্র্যময় সূক্ষ্ম অর্থের জাল বুনিয়া আসিতেছে যে, হঠাৎ তাহাদিগকে ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া যায় না,—ভাষান্তরিত করিলেই তাহারা অনেকখানি যায় রূপান্তরিত হইয়া এবং তপোবনের বাহিরে সখীবিরহিতা খণ্ডিতা শকুন্তলার ন্যায় তাহাদিগকেও চেনা কঠিন হইতে পারে। আমরা বাঙলায় সাধারণতঃ 'ট্র্যাজেডি' কথাটিকে 'বিয়োগান্ত-কাব্য' রূপে ভাষান্তরিত করি; কিন্তু ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণতা এবং গভীরতা সেখানে প্রকাশ পায় বলিয়া মনে হয় না। বিয়োগই ট্র্যাজেডির ভিতরে সব চেয়ে বড় কথা নহে,—মিলনের ভিতরেও সে হয়ত গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। মহাভারতের ট্র্যাজেডি কুরুকুলের ধ্বংসের ভিতরে ততখানি নহে, যতখানি সেই কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের বুকে পাণ্ডবদের রাজ্যপ্রাপ্তিতে। তাই বিয়োগটা ট্র্যাজেডির অনেকখানি একটা বহিরঙ্গ লক্ষণ মাত্র,—উহা ট্র্যাজেডির স্বরূপলক্ষণ নহে।

সুতরাং সর্বপ্রথমে ট্র্যাজেডির স্বরূপলক্ষণটি চিনিয়া লওয়া দরকার। ট্র্যাজেডি জীবনের একটা গভীর তত্ত্ব,—একটা গভীর বেদনা—জীবনের একটা চিরন্তন বিষাদময় সমস্যা। এ বেদনা ঘটনাপরম্পরাগত কোনও একটা বিশেষ বিরহ, বিচ্ছেদ বা শোক মাত্র নহে,—এ বেদনা যেন রহিয়াছে আমাদের জীবনের মূলে। সেই জীবনের মূলে কোথায় রহিয়াছে একটা আকাশজোড়া ফাঁক, কিছুতেই যেন আর তাহাকে ভরিয়া তোলা যাইতেছে না,—সেই বিরাট ফাঁকের ভিতরে ক্রমান্বয়ে জমাট বাঁধিয়া ওঠে জীবনের ঘনীভূত বেদনা। এ সমস্যা—এ বেদনা মানুষের বুকে আঁচড় দিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দিন হইতে যেদিন হইতে সে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়াছে,—জীবন সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করিতে শিখিয়াছে। নিখিল বিশ্বসৃষ্টির এই যে অনাদি অনন্ত প্রবাহ—ইহার ভিতরে আমাদের জীবনের মূল্য কোথায় এবং কতটুকু? শৌর্যে বীর্যে, চরিত্রের নিশ্চল দৃঢ়তায়, ধনে জনে মানে যে ব্যক্তিপুরুষটি বিরাট বনস্পতির ন্যায় আপন ঐশ্বর্য ও মহিমায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাহিরের অকস্মাৎ একটি মাত্র আলোড়ন আসিয়া তাহাকে ধরণীর তৃণগুল্মের সহিত এক করিয়া পিসিয়া দিয়া গেল! কোথায় রহিল পৌরুষের মহিমা,—কি মূল্য জীবনের সেই সকল উপাদানের, যাহার সমবায়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল ব্যক্তিপুষের এই বিরাট মহিমা? জ্ঞান উন্মেষের প্রথম মুহূর্ত হইতেই মানুষ

চাহিয়া দেখিল, বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে যে অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য শক্তি, তাহার হাতে সে খেলার পুতুল মাত্র! বিশ্ব-সাগরের মধ্যে ক্ষুদ্র এক বালুকণা হইতে একটি জীবনের মূল্য কোথায় কতটুকু বেশী, ইহাই দাঁড়াইল মানুষের মস্তবড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ যদি সত্য সত্যই কখনও বুঝিতে পারিত, একটি জীবনের মূল্য একটি বালুকণা হইতে কোথাও কিছু বেশী নয়,—মানুষের ব্যক্তিপুরুষ অন্ধ প্রকৃতির হাতের একটি অসহায় ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নয়,—তবে হইতে পারিত জীবনের সকল ট্র্যাজেডির অবসান। কিন্তু অন্তরে মানুষ জীবনকে দিয়াছে গভীর মূল্য, তাহার ব্যক্তি-পুরুষটি আত্ম-প্রত্যয়ে আত্ম-মহিমায় আকাশ ফুঁড়িয়া মাথা জাগাইতে চাহিতেছে অসীম শূন্যে—সকলের ঊর্ধ্বে;—কিন্তু বাস্তবজীবনে সে পদে পদে অনুভব করিতেছে, জীবনের যেন কোন মূল্য নাই—এ যেন প্রকৃতির তাসের খেলাঘর। এইখানেই জমাট বাঁধিয়া ওঠে জীবনের ট্র্যাজেডি।

এই যে জীবনের অপমান—মনুষ্যত্বের অপমান—ব্যক্তি-পুরুষের অপমান,—ইহার বেদনাই ট্র্যাজেডির বেদনা। ট্র্যাজেডির মূলে তাই রহিয়াছে জীবনের একটা প্রকাণ্ড অর্থহীনতা, মনুষ্যত্বের তীব্র লাঞ্ছনা, পৌরুষের অহৈতুক অপমান। জীবনের সকল দুঃখ, সকল লাঞ্ছনা—অপমানকে আমরা ন্যায়ের দিক দিয়া, যুক্তির দিক দিয়া অন্ততঃ বরদাস্ত করিয়া লইতে পারিতাম যদি তাহার ভিতরে সন্ধান পাইতাম

অন্ততঃ একটা ব্যবহারিক হেতু-প্রত্যয়ের। কিন্তু জীবনের অনেক দুঃখ-নৈরাশ্য, অনেক লাঞ্ছনা-অপমানই এমন যে তাহাকে আমরা কোনও কার্য-কারণের আওতার ভিতরে টানিয়া আনিতে পারি না, সেইখানেই অন্তরের গভীরে শুধু এই রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস গুমরিয়া উঠিতে থাকে, যে বেদনা—যে অপমান-লাঞ্ছনার উপরে আমার বিশেষ কোন হাত নাই, যাহার জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ীও নহি, অথচ যাহার প্রত্যেকটি আঘাত আমাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক গ্রহণ করিতেই হইবে, সে বেদনায়—সে অপমানে জীবন যে একান্তই দুর্বহ। জীবনের এই নৈরাশ্যবাদ যে শুধু বাহির হইতে আঘাত খাইয়াই আসে তাহা নহে, আমাদের নিজেদের ভিতরেই অনেক সময় রহিয়াছে এই নৈরাশ্যবাদের মূল। আমাদের নিজেদের ভিতরেই রহিয়াছে এমন পরস্পর-বিরোধী উপাদান যে প্রতিনিয়ত আমাদিগকে বাধা দিতেছে জীবনকে নিবিড় করিয়া পাইতে। তাইত সারা জীবনের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের পর ম্যাক্‌বেথ একদিন জীবনের সত্য আবিষ্কার করিয়া বলিল,—

> Life's but a walking shadow, a poor player
> That struts and frets his hour upon the stage
> And then is heard no more ; it is a tale
> Told by an idiot, full of sound and fury,
> Signifying nothing.

জীবনটা একটা চলন্ত ছায়া—দু'দিনের রঙ্গমঞ্চ—একটা অবোধের উপাখ্যান,—বাগাড়ম্বর আছে—উত্তেজনা আছে,—কিন্তু কোনও অর্থ নাই! ম্যাক্‌বেথের জীবনে এইটাই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। ম্যাক্‌বেথ না হয় জীবনের ব্যর্থতার ভিতরেই লাভ করিয়াছিল এই নৈরাশ্যবাদ; কিন্তু ব্যর্থতার ভিতরেই যে আসে জীবনের এই নৈরাশ্যবাদ—এই মূল্যহীনতা—এ কথাও সত্য নহে. পরিপূর্ণ সফলতার ভিতর দিয়াও আসে জীবনের সেই মূল্যহীনতা—সেই নৈরাশ্য,—জীবনের সে ট্র্যাজেডি আরও দুঃসহ গভীর! মহাভারতে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের অন্য দিক হইতে যাহাই অর্থ হোক না কেন, কাব্যের দিক হইতে উহা জীবনের এমন একটা ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত যাহার উপমা সাহিত্যে বিরল। কত আয়োজন—কত বিরোধ-মৈত্রী—যুদ্ধ—হত্যা ধ্বংসের ভিতর দিয়া পাণ্ডবগণ যেদিন বিজয় লাভ করিল সেদিন যেন হঠাৎ মনে হইল, এ বিজয় সম্ভোগ্য নহে, জীবনে যেন তাহাদের অন্তরাত্মা তাহাকে সত্যই চাহে নাই,—তখন সেই পরিপূর্ণ সফলতাকে মৃৎপাত্রের ন্যায় মাটির পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিয়া তাহারা যেন জীবনের আরেকটি রাজ্যের সন্ধানে চলিয়া গেল! একদিন যাহাকে জীবনের প্রার্থিততম বস্তু বলিয়া মনে করি, কত স্বপ্ন—কত কল্পনার রঙীন আলোকে যাহাকে অফুরন্ত, মধুর, রহস্যময় করিয়া তুলি, জীবনের কোন এক সন্ধিক্ষণে হয়ত আবিষ্কার করিয়া বসি—

সে যেন একেবারেই মূল্যহীন,—তাহাকে পাইয়া যেন কিছুই সুখ নাই—সত্য সত্য হয়ত তাহাকে অন্তর হইতে কোন দিন চাহিও নাই! এইখানেইত জীবনের ট্র্যাজেডি!

মানুষের মনের গহনে এই যে একটি মূল বেদনার সুর, ইহাই জাগাইয়াছে তাহার মনে অসংখ্য সমস্যা—মানুষ তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে নানারূপ দার্শনিক তত্ত্ববিচারে, এবং সেখানে হয়ত কোথাও কোথাও সে পাইয়াছে একটা বুদ্ধির সান্ত্বনা; কিন্তু সেই বুদ্ধির সান্ত্বনার পাশ কাটাইয়া অন্তরের বেদনা ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে আবার সাহিত্যের ভিতরে,—সেইখানেই সৃষ্টি হইল ট্র্যাজেডির।

ট্র্যাজেডির ভিতরে প্রথমে পাইলাম তাই জীবনের মূলে একটা গভীর বেদনা,—প্রাচীন যুগে এই বেদনার সহিত মিশ্রিত ছিল একটা নিঃসহায়তার ভীতি। এই যে ভয়-মিশ্রিত ট্র্যাজেডির বেদনাবোধ তাহার আর একটি প্রধান লক্ষণ এই, সে কখনও মানুষকে আদালতের বিচারক করে না,—মানুষের মনের মধ্যে জাগায় অসীম করুণা—গভীর সহানুভূতি। ইহার কারণও খুব স্পষ্ট,—উহা মানুষের নিঃসহায়তা। দৈবরোষে অলঙ্ঘ্য নিয়তির বশে সে যেখানে বিপর্যস্ত, সেখানেও সেই নিঃসহায়তা, যেখানে নিজের অন্তরের পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির প্রকোপে সে বিপর্যস্ত সেখানেও যেন মনে হয়, অসহায় জীব—মানুষের যেন হাত নাই,—

অদৃশ্য কোন্ ভাগ্যনিয়ন্তা যেন তাহাকে টানিয়া লইতেছে, —সেখানেও সেই সূক্ষ্ম অসহায়ত্বের বোধ! আমার মনে হয়, গ্রীক্ ট্র্যাজেডির ভিতরে যে নিয়তির দেখা পাওয়া যায় উহাও যেন ট্র্যাজেডির একটি মূল সুর। বাহিরের দ্বন্দ্ব বা ভিতরের দ্বন্দ্ব যে কারণেই ট্র্যাজেডি হোক না কেন, সেখানে যেন একটা নিরুপায়ত্ববোধ—একটা ভাগ্য—একটা দৈব—একটা নিয়তির অতি সূক্ষ্মরূপ সর্বত্রই অনুস্যূত থাকে। এই সূক্ষ্ম নিয়তিবোধ হইতেই ট্র্যাজেডির বেদনার ভিতরে সর্বত্র মিশিয়া থাকে একটি গভীর সহানুভূতি; কারণ নিয়তিদেবীই মনুষ্যত্বের ঘনীভূত লাঞ্ছনা,—সে যেন পৌরুষের মূর্তিমতী অস্বীকার,—জীবনের মূলে সে যেন রহিয়াছে একটি গভীর ফাঁকি।

একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে উদিত হয়, এই যে মানব জীবনের এক নিষ্ঠুর বেদনা ইহা আমাদের সাহিত্যের মধ্যে রস হইয়া উঠিতে পারিল কেমন করিয়া? সে আমাদিগকে কোন্ আনন্দে মুগ্ধ করিয়াছে? পাশ্চাত্ত্য অনেক দার্শনিক ইহার নানাপ্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছেন। সোপেনহাওয়ের বলিয়াছেন যে, —ট্র্যাজেডি আমাদিগকে যে আনন্দ দান করে তাহা কোনও সৌন্দর্যের আনন্দ নহে, তাহা আমাদের চিন্তার আনন্দ—জ্ঞানের আনন্দ। ট্র্যাজেডির ভিতর দিয়া আমরা এই জ্ঞান লাভ করি যে জীবনে শান্তি নাই, সুখ নাই,

থাকিতে পারেও না,—জীবন শুধু দুঃখের, শুধু চিরন্তন ক্রন্দনের। জীবন সম্বন্ধে এই যে নিষ্ঠুর সত্যলাভ ইহার ভিতরেও আমাদের মনে আনন্দ আছে,—এবং শুধু তাহা নহে, —এই সত্যদর্শনের ফলে আমরা জীবনকে নিয়তির হাতে সঁপিয়া দিয়া অনেকখানি সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারি, —এইখানেই ট্র্যাজেডির আনন্দ। হেগেল এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ট্র্যাজেডির ভিতরে আমরা যে দুইটি শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই, তাহারা উভয়েই ন্যায্য—অর্থাৎ এখানে যে সঙ্ঘাত তাহা ঠিক ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, পুণ্যের সহিত পাপের বিরোধ নহে,—অনেকখানিই যেন ন্যায়ের সহিত ন্যায়ের বিরোধ। কিন্তু এই বিরোধের কারণ এই, এখানে একটি ন্যায়-শক্তি অপরের ন্যায় অধিকারকে অস্বীকার করিতেছে। পরিবার যাহা চায়, দেশ তাহা অস্বীকার করিতেছে, প্রেম যাহা চায়, মর্যাদাবোধ তাহার বিরুদ্ধে যাইতেছে। ট্র্যাজেডির বিষাদময় পরিণতিটি এই উভয়ের অন্যায় আব্দারকে অস্বীকার করে এবং একটা বেদনাময় পরিণতির ভিতর দিয়া আমাদের পরস্পরবিরোধী ন্যায়বোধের ভিতরে একটা সামঞ্জস্য, একটা ঐক্য সৃষ্টি করে। এই পরিণতির ভিতর দিয়া আমরা যতই ব্যথিত হই না কেন, সকল ব্যথার ভিতর দিয়া এই একটা আনন্দ আমাদের মনকে ভরিয়া দেয় যে, সমস্ত বিরোধের ভিতর দিয়া সনাতন ন্যায়ের অখণ্ডত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক--

প্রবর এরিষ্টট্‌লের মতবাদটিও আলোচনা করা যাইতে পারে। তিনি মনে করেন, ট্র্যাজেডি জিনিসটা অনেকখানি হোমিও-প্যাথিক ঔষধের ন্যায়। এরিষ্টট্‌লের মতে আমাদের মনের ভিতরে দুইটি সব চেয়ে বেশী বিক্ষোভকারী বস্তু হইল আমাদের 'করুণা' এবং 'ভয়'। এরিষ্টট্‌লের ভাষায় 'করুণা' এবং 'ভয়' এই শব্দ দুইটির দুইটি বিশেষ অর্থ আছে। 'করুণা' অর্থে তিনি মনে করিয়াছেন চিত্তের সেই অবস্থা যাহা কোনও একটা অহৈতুক দুর্দশা—একটা অবাঞ্ছিত দুরদৃষ্টের দ্বারা সৃষ্ট হয়। আর 'ভয়' অর্থ চিত্তের সেই ভাব যাহা আমাদের ন্যায় অসহায় জীবের ক্লেশের দ্বারা উৎপন্ন হয়। মনের মধ্যে এই দুইটি ভাব আমাদিগকে নিরন্তর বেদনা দিতেছে। ট্র্যাজেডির মধ্যেও আমরা পাই সেই 'করুণা' এবং 'ভয়'; আর্টের সেই 'করুণা' এবং 'ভয়ে'র দ্বারা আমাদের জীবনের 'করুণা' এবং 'ভয়ে'র বেদনা অনেকখানি উপশমিত হয়—এইখানেই ট্র্যাজেডির আনন্দ।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, ট্র্যাজেডির আনন্দ ইহা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম এবং গভীর,—ইহা সাহিত্যের রমণীয়তার ভিতর দিয়া আত্মোপলব্ধির আনন্দ। মনে হয়, সাহিত্যের রসবোধের ভিতরে এই আত্মানুভূতির বা আত্মোপলব্ধির ব্যাপারটি অনুস্যূত হইয়া আছে। পুত্রের জন্য যে পুত্র প্রিয় হয় না, বিত্তের জন্য যে বিত্ত প্রিয় হয় না,—আত্মার কামনায়ই সকল প্রিয় হয়, উপনিষদের এ সত্য সাহিত্যের

উপরেও অনেকখানি প্রযোজ্য। শুধু লোকোত্তর রমণীয়তা দ্বারাই সাহিত্য আমাদের প্রিয় হয় না—তাহার রস জমিয়া ওঠে না; তাহার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে সেই আত্মোপলব্ধির প্রশ্ন। সাহিত্যের ঘটনা বিশেষের ভিতর দিয়া আমরা আমাদিগকে বিশেষ করিয়া পাইতেছি,—কত বৈচিত্র্যে মাধুর্যে সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় যে আমাদের অন্তরপুরুষের সকল সত্তা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে,—সেই আত্মচেতনার ভিতরেই রহিয়াছে সাহিত্যের অনেকখানি রসবোধ। ট্র্যাজেডির ভিতরেও আমরা অতি নিবিড় করিয়া পাই আমাদের সত্তাটিকে—আমাদের বাস্তব জীবনটিকে। ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকার বহির্দ্বন্দ্ব এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আমাদের চিত্ত-ধাতুকে শতভঙ্গে দিতেছে দোলা,—সেই আঘাতের স্পন্দনে চিত্তরাজ্যে আসে একটা আলোড়ন,—তাহাতে বাস্তবের প্রচণ্ডতা নাই, আছে মনোময় রূপের রমণীয়তা, ট্র্যাজেডিও তাই করে রসসৃষ্টি।

ট্র্যাজেডির বেদনাকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব,--এই বেদনার মধ্যে একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। দ্বন্দ্ব-বিহীন যে বেদনা তাহা করুণ রসের সৃষ্টি করিলেও, ট্র্যাজেডি নহে। এই দ্বন্দ্বটি কিসের তাহা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এ দ্বন্দ্বের একদিকে রহিয়াছে মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিপুরুষ, অপরদিকে রহিয়াছে প্রাণহীন জগৎ-ব্যাপারের অনিবার্য প্রবাহ। মানুষের এই ব্যক্তিপুরুষটি বড়

আত্মাভিমানী, সে নিজের ছন্দে নিজের জীবনযাত্রাকে বহাইয়া দিতে চায়; কিন্তু জগৎ-ব্যাপারটি প্রতিনিয়তই তাহার পশ্চাতে লাগিয়া আছে—পদে পদে তাহাকে বাধা দিতেছে, এইখানেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। যে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে এই বিরাট স্রোতের প্রবাহের ভিতরে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মিলাইয়া দিয়া জীবনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে রাজি হয়, তাহার জীবনে যতই দুঃখ থাক, শোক থাক, বিরহবিচ্ছেদ থাক, তাহার ভিতরে ট্র্যাজেডি নাই; কিন্তু যে আত্মাভিমানী ব্যক্তিপুরুষ তাহা দিতে চায় না, যে নিজের অস্তিত্বই সার্থক করিয়া উপলব্ধি করিতে চায়, জগৎ-ব্যাপারের সহিত তাহার রহিয়াছে পদে পদে বিরোধ, এই বিরোধই আনে জীবনের ট্র্যাজেডি। এখানে আমি জগৎ-ব্যাপার শব্দটি শুধু বহির্জগতের ঘটনা অর্থেই ব্যবহার করিতেছি না, কথাটিকে আমি একটু গভীর এবং ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার বাহিরে যাহা কিছু তাহাকেই আমি এই জগৎব্যাপারের ভিতরে স্থান দিয়াছি। এই যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার বাহিরে জগৎ-ব্যাপারটি, ইহা কখনও রূপ লইয়াছে দৈবের বা নিয়তির; তাই গ্রীক্-ট্র্যাজেডির ভিতরে দেখিতে পাই, সেখানে যে দ্বন্দ্ব তাহা অনেকখানি এই ব্যক্তিপুরুষ এবং অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়তির দ্বন্দ্ব। গ্রীক্‌ট্র্যাজেডির বীরগণ সর্বত্রই বিপর্যস্ত লাঞ্ছিত—বিষাদময় পরাজয় এবং মৃত্যুতেই

দ্বন্দ্ব—ইহাই জীবনকে পরিণত করে ট্র্যাজেডিতে। তাই শেক্সপিয়ার তাঁহার নাটকে বাহিরের সঙ্ঘাতকে অনেকখানিই রাখিয়াছেন চরম বিষাদময় পরিণতির অবলম্বন বা উপলক্ষ্য হিসাবে,—কিন্তু সত্যকার দ্বন্দ্ব রহিয়াছে মানুষের মনের ভিতর পরস্পর-প্রতিক্রিয়াশীল প্রবৃত্তিগুলির ভিতরে। অন্তরের ভিতরে নিরন্তর বিভিন্ন ভাবের এই বিরোধ পদে পদে ব্যাহত করে ব্যক্তি-জীবনের স্বাধীন সহজ সরল গতিকে, চালিত করে তাহাকে শুধু বিরামবিহীন অশান্তির ভিতরে। পিতৃব্যের সহিত বিরোধই অর্ধ-উন্মাদ হ্যামলেটের দ্বন্দ্বযুদ্ধে শোচনীয় পরিণতির কারণ নহে,—সে কারণ রহিয়াছে তাহার প্রকৃতিতে,—তাহার একাধারে বীরত্ব এবং অতিমাত্রায় চিন্তাশীলতায়। হ্যামলেট শুধু বীর হইলে আসিত না তাহার জীবনে এমন শোচনীয় পরিণতি। মানুষের জীবনে যত জ্বালা রহিয়াছে তাহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা বড় জ্বালা এই অন্তর্দ্বন্দ্বে,—যেখানে মন মুহূর্তের জন্য পাইতেছে না একটু বিশ্রামের ঠাঁই—দেখিতেছে না সম্মুখের পথ,—শুধু সংশয় দ্বিধা, শুধু পলে পলে এদিকে ওদিকে ধাক্কা খাইয়া মরা। এই যে একটা মানসিক দ্বন্দ্বের অস্থিরতা, ইহা হইতে মৃত্যু অনেক শান্তির,—তাই মানুষ মৃত্যুর ভিতরে চাহে এই দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি। ম্যাক্‌বেথ, ব্রুটাস, কিঙ্গ্‌লিয়ার, ওথেলো প্রভৃতি সকল বীরের ভিতরেই রহিয়াছে সেই প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব,—মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যাহা মানুষকে

মুহূর্তের জন্যও একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে দেয় না।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডির ভিতরে ত দেখিতে পাইতেছি মানুষ নিজের অন্তর্বিপ্লবের জন্যই জীবনকে করিয়া তোলে ট্র্যাজেডি;—এখানে ত তবে আমাদের বিচারক মন কার্য-কারণের যোগ-সূত্র পাইতেছে! গভীর ভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, এই প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব—যাহার উপরে মানুষের যেন কিছু হাত নাই— যাহা শুধু মানুষকে তিলে তিলে নিষ্করুণ ধ্বংসের পথেই আগাইয়া দেয়, ইহাও সেই নিয়তির অতি সূক্ষ্ম রূপ। মানুষের হাত নাই—নিজের অন্ধ-প্রকৃতির হাতেই সে ক্রীড়নক! বিরাট ব্রুটাস্, বিরাট ম্যাক্‌বেথ,—কিন্তু তবু যেন নিরুপায় নিঃসহায়। দুর্বার প্রকৃতি যেদিকে টানিয়া লইতেছে, সমস্ত পৌরুষের গর্ব, ব্যক্তিত্বের মহিমা লইয়া মানুষ সেই দিকে ছুটিয়া চলিতেছে—কতবড় সে অসহায়, কতখানি সে নিরুপায়—কৃপার পাত্র! হ্যামলেট বা ব্রুটাসের মৃত্যুশিয়রে দাঁড়াইয়া আমরা কোনও বিচার করিতে পারি না,—তর্ক করিতে পারি না, আমাদের কার্য-কারণের সূত্রে গ্রথিত কোন ভাল-মন্দের যুক্তিই সেখানে ঠাঁই পায় না, শুধু অসীম করুণা ও সহানুভূতি এবং গভীর বিস্ময়-বিমথিত চিত্তে চাহিয়া দেখি আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ধরণীতে খসিয়া পড়িয়াছে, পর্বতের

উত্তুঙ্গ শিখর ধরণীর সমতল ভূমিতে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, ন্যায় হইয়াছে কি অন্যায় হইয়াছে এ প্রশ্নের কোন জবাবই আর যেন সেখানে যোগায় না।

শেক্সপিয়ার ট্র্যাজেডিকে বাহির হইতে মানুষের জীবনের ভিতরে আনিয়া মানুষের মূল প্রকৃতির মাঝে তাহার সন্ধান খুঁজিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছেন বটে; কিন্তু শেক্সপিয়ারও মৃত্যু ব্যতীত কখনও ট্র্যাজেডি করেন নাই, মৃত্যুই যেন ট্র্যাজেডির চরম পরিণতি। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, জীবনের সমস্যাগুলি আমাদের নিকটে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ইব্‌সেনের যুগে আমরা আসিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, মৃত্যু ট্র্যাজেডির কোন অপরিহার্য অঙ্গ নহে! জীবনের মধ্যে—বাঁচিয়া থাকিবার মধ্যে অনেক সময় এমন ট্র্যাজেডি রহিয়াছে, মৃত্যু যেখানে অতি তুচ্ছ। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার ভিতরেও থাকিতে পারে যে অতলস্পর্শ বেদনা, মনুষ্যত্বের যে লাঞ্ছনা, সে হয়ত আমাদের মনোরাজ্যে একটা ধ্বংস বা ঐ জাতীয় একটা বৃহৎ বিপদ হইতে গভীরতায় কিছু মাত্র কম নহে। ইব্‌সেন তাই দেখাইয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিবার ভিতরকার ট্র্যাজেডি। তাঁহার 'লোক-শত্রু' (An Enemy of the People) নাটকের নিরীহ বেচারা ডাক্তার 'ষ্টক্‌মান'-এর কথাই ধরা যাক। এই সরল সোজা সত্যকার

পরোপকারী লোকটি সারা জীবন ধরিয়া যে শহরে বাস করিতেন সেই শহরের অধিবাসিগণের শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সংস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি কার্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরস্কার মিলিয়াছিল 'লোক-শত্রু' উপাধি; এবং যবনিকা পতনের পূর্বে দেখিতে পাইলাম তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে অতি নিকটে ডাকিয়া তাহাদিগকে জীবনের আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় সত্য কথাটা বলিলেন,—"It is this, let me tell you—that the strongest man in the world is he who stands most alone."—জগতে যে সবচেয়ে বেশী একেলা সেই সব চেয়ে বলবান্! ইব্‌সেনের "প্রেতাত্মা" (Ghosts) নাটকে দেখিলাম, মানুষ তাহার সেই সকল দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্যই সমস্ত জীবনকে বিষাদময় করিয়া তুলিতেছে, যাহার উপরে তাহার নিজের কোন হাত নাই—যে সকল দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা তাহার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। তাঁহার 'পুতুলের ঘর' (A Doll's House) নাটকে দেখিলাম, অভিমানিনী নোরা অকস্মাৎ একদিন এক মুহূর্তে আবিষ্কার করিয়া বসিল, যাহাকে সমগ্র প্রাণ দিয়া সে ভালবাসিয়াছে, যাহার মঙ্গলের জন্য জাল-জুয়াচুরিতেও সে পশ্চাৎপদ নহে, সে বাহিরে যাহাই হোক, অন্তরে তাহার দরদ নোরা অপেক্ষা সমাজের মতামতের প্রতিই বেশী। এক নিমেষের ভিতরে নোরা আবিষ্কার করিতে পারিল, যে সংসারকে সুখের নীড় বলিয়া

বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল সেও পুতুলের খেলাঘর মাত্র; সে পুতুলের ঘর ছাড়িয়া নোরা উধাও হইয়া চলিয়া গেল। দেখিতে পাইলাম, ইব্‌সেনের যে ট্র্যাজেডির বেদনা তাহা কত সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়াছে। শুধু যে বেদনাই সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা নহে,—ভিতরে-বাহিরে দ্বন্দ্বের পাই একটি সূক্ষ্ম রূপ। ডাক্তার ষ্টক্‌মানের ভিতরে যে দ্বন্দ্ব সে তাহার পরোপকার বৃত্তি এবং পারিবারিক প্রীতিজনিত দুর্বলতার দ্বন্দ্ব। অস্‌ওয়াল্ড অ্যাল্‌ভিঙ্গ-এর (Oswald Alving) জীবনে যে দ্বন্দ্ব সে তাহার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার ভিতরে। নোরার মনের ভিতরে যে দ্বন্দ্ব তাহাও গভীর প্রেম এবং প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমানের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব,—মনের এ দুইটি বৃত্তি অন্য ক্ষেত্রে হয়ত একে অপরের সহিত সন্ধি করিয়া বনাইয়া চলিতে পারিত, কিন্তু নোরার ভিতরে তাহা পারে নাই,—এইখানেই ঘটিয়াছে ট্র্যাজেডি।

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ এবং মহাভারত ব্যতীত আর কোনও ট্র্যাজেডি গড়িয়া উঠে নাই। অবশ্য প্রসঙ্গ ক্রমে একথাটিও মনে হয় যে, সংস্কৃত সাহিত্যের—রামায়ণ ও মহাভারত ও কালিদাসের কিছু কিছু কাব্যাংশ বাদ দিলে জীবনের গভীরতার উপরে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যও খুব বিরল। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে দেখিতে পাই, ট্র্যাজেডি সাহিত্যে একেবারে অচল; কাব্যের ভিতরে যতই

দুঃখ-বেদনা থাকুক না কেন, ফলশ্রুতিটি যেন হৃদয়ে কোনও বেদনার রেখাপাত না করে। কিন্তু ভারতীয় কবিকল্পনায় ট্র্যাজেডির আদর্শ যে দাঁড়াইতে পারে নাই শুধু আলঙ্কারিক-গণের নিষেধেই, একথা মানিতে ইচ্ছা হয় না। সাহিত্যের ভিতরে জীবনের এই ট্র্যাজেডির দিকটি চাপা পড়িবার আরও কতকগুলি কারণ ছিল বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিয়াছি,—ট্র্যাজেডির সব চেয়ে বড় রহস্য এই, জীবনে আমরা পাইতেছি যে বেদনা—জীবনের যে অপমান,—আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না তাহার কোনও কার্য-কারণ সম্পর্ক, তাই সে আমাদের নিকট একটা চিরন্তন বেদনা-ঘন অজ্ঞাত রহস্য! কিন্তু কর্মবাদের দেশে সে রহস্যও অনেকখানি ঘুচিয়া গিয়াছে, জীবনের যে বেদনা—যে লাঞ্ছনা-অপমানকে এ জীবনের কিছু দিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না, তাহার পশ্চাতে জুড়িয়া দিলাম কর্মবাদের সীমাহীন সূত্রকে। আসলে অটুট ধর্মবিশ্বাস ভারতবর্ষের মজ্জাগত প্রকৃতি। বিধাতার মঙ্গলময়ত্বে অবিশ্বাস করিবার কোন অবকাশ নাই আমাদের চিন্তার ভিতরে। তাই আপাততঃ যাহাকে কার্যকারণবিহীন একটা প্রকাণ্ড দুঃখ ও অমঙ্গলের বলিয়া মনে করি পর মুহূর্তেই তাহাকে নিছক মোহাচ্ছন্ন মনের ভ্রান্তি বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। বিশ্বতশ্চক্ষু ভগবানের রাজ্যে কোথাও সত্যকারের কোন অনর্থক এবং অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা নই। এই সকল কারণে মনে হয়,

জীবনের যে ট্র্যাজেডির দিকটা তাহা আর ভারতীয় কবি-কল্পনাকে তেমন বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিতে পারে নাই, তাই ভারতীয় সাহিত্য হইতে ট্র্যাজেডি লাভ করিয়াছে চির-নির্বাসন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলাদেশের আকাশে বাতাসে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা যখন ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তখন বাঙলার চিরবিদ্রোহী কবি মধুসূদন বাঙলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডির আমদানি করেন। কিন্তু 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য বা 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর ভিতরে মধুসূদনের নিজস্ব কোনও ট্র্যাজেডির আদর্শ দেখিতে পাই না, সেখানে তিনি গ্রীক্ আদর্শকেই বাঙলা ছাঁচে ঢালিয়াছেন মাত্র। মেঘনাদ-বধের রাবণ বা মেঘনাদের ভিতরে কোনও অন্তর্বিপ্লব নাই,—প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব নাই,—সমগ্র কাব্যের যে নিদারুণ বিষাদময় পরিণতি তাহা যেন অলক্ষ্য নিয়তির বিধান মাত্র,—সেই অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য শক্তির হাতেই শৌর্য-বীর্যের প্রতীক রাবণ এবং মেঘনাদ পদে পদে বিপর্যস্ত। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র ভিতরেও দেখিতে পাই সেই নিয়তিরই খেলা,—কোনও মানসিক দ্বন্দ্ব ঘটনার পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। মরুদেশের রাজা মানসিংহ এবং জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ উভয়েই কৃষ্ণকুমারীর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণাকে বিবাহের প্রতিজ্ঞা করিল। এই উভয়-সঙ্কট হইতে পিতার এবং পিতৃরাজ্যের রক্ষার মানসেই কৃষ্ণা

আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু এ আত্মোৎসর্গ কোন সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্ব-জাত নহে,—সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিতও নহে,—বধার্থ-প্রেরিত পিতৃব্যের মুখে পিতার ইচ্ছা অবগত হইয়াই কৃষ্ণা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আকাশ হইতে পদ্মিনীর আহ্বান এবং কৃষ্ণার সরল চিত্তে তাহার গভীর প্রভাব যেন সেই নিয়তিরই রূপভেদ মাত্র। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের অব্যবহিত পরেই দীনবন্ধু মিত্রের ট্র্যাজেডির নাটক 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। এখানেও আমরা ট্র্যাজেডিকে অনেকখানি তাহার স্থূলরূপেই পাইয়াছি। নীলকর সাহেবগণের অত্যাচার, অবিচার এবং মিথ্যা জাল-জুয়াচুরির ফলে গ্রামের সম্মানিত ধীরকশরী গোলকচন্দ্র জেলে উদ্বন্ধনে প্রাণ দিল, —বীর পিতার বীর পুত্র নবীনমাধব নীলকর সাহেবের বক্ষে পদাঘাত করিয়া বড় সাহেবের হস্তেই প্রাণ দিল, মাতা সাবিত্রী স্বামী এবং পুত্রের শোকে উন্মাদিনী হইল,—শোকের উন্মাদনায় কনিষ্ঠ-পুত্রবধূ সরলতাকে গলায় পাড়া দিয়া মারিয়া ফেলিল,—পরে প্রকৃতিস্থা হইয়া একথা জানিতে পারিয়া নিজেও মূর্ছিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল,—গোলকচন্দ্রের সোনার সংসার পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। কিন্তু এখানে যে ট্র্যাজেডি তাহা সঙ্ঘটিত হইয়াছে বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে,—কোথাও যেন কোনও গভীর মানসিক দ্বন্দ্ব নাই, পরিণতিও শুধু মৃত্যু এবং শোকের ভিতরে। 'নীলদর্পণ' যতটুকু

ট্র্যাজেডি হইয়া উঠিয়াছে তাহা অন্যায়ের সহিত সঙ্ঘাতে ন্যায়ের তীব্র লাঞ্ছনা এবং পরাজয়ে।

মধুসূদন বা দীনবন্ধু কেহই আমাদের সাহিত্যে ট্র্যাজেডির সূক্ষ্ম রূপটি অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারেন নাই,—কিন্তু আমাদের বাঙালীর কোমল ধাতে ট্র্যাজেডির নিষ্করুণ কাঠিন্যকে তাঁহারাই প্রথম সহাইয়া গিয়াছেন,—অনেকখানি পাথর কাটিয়া পথ করিয়া দিয়া যাইবার মত। দীনবন্ধুর পরে নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভাব গিরিশচন্দ্রের। তিনিও যেন ট্র্যাজেডির মুক্তরূপটি বাঙালীর সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছেন। তাই তিনি কোথাও কোথাও পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির আদর্শের উপরে ফলাইয়াছেন একটু প্রাচ্য রঙ। তাঁহার 'জনা' নাটকে দেখিতে পাই প্রবীরের মৃত্যু, স্বামীর শোকে মদনমঞ্জরীর মৃত্যু এবং প্রতিহিংসাময়ী জনার গঙ্গাজলে আত্ম-বিসর্জনের ভিতরেই কবি 'জনা' নাটকের যবনিকাপাত করেন নাই; ক্রোড়অঙ্কে দেখিতে পাইলাম শ্রীকৃষ্ণ রাজা নীলধ্বজকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছেন; নীলধ্বজ দেখিলেন কৈলাস পর্বত—নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা;—সেখানে কৃষ্ণ দেখাইলেন,—

> হের, মতিমান,
> ওই পুত্র—পুত্রবধূ তব
> ভীষণ তুষারাবৃত কৈলাস-শিখরে—
> বিল্বদলে জবাফুলে

পূজিছে পার্ব্বতী হরে ;
নাই মনে মর্ত্ত্যের বারতা।
হের দুগ্ধময়ী সলিল মাঝারে
মকরবাহিনী ভাগীরথী।
হের, জনা প্রসন্নবদনা
চামর ঢুলায় পাশে,—
নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী।
প্রপঞ্চ বুঝিয়ে ভূপ, মন কর স্থির।

রাজা নীলধ্বজের চিত্তও শান্ত হইল,—তিনি বলিলেন,—

অজ্ঞান-তিমির—বিনাশন,
জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন !

নীলধ্বজের চিত্তের প্রশান্তির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক এবং দর্শকের মনেও নামিয়া আসিল গভীর প্রশান্তি। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ইহাই ভারতবর্ষের চিরাচরিত বিশ্বাস এবং ধাত। কিন্তু এই ক্রোড়অঙ্কের শান্তি-বচনের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, 'জনা' নাটকের ট্র্যাজেডির পরিকল্পনার ভিতরে ট্র্যাজেডির প্রধান লক্ষণ নায়ক-নায়িকার অন্তর্জগতের প্রবল দ্বন্দ্বের তেমন পরিচয় নাই। নাটকখানি রচিত গ্রীক্ ট্র্যাজেডির আদর্শে। অর্জুন বিনা বাধায় যজ্ঞের অশ্ব মাহিষ্মতী রাজ্যের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া বিজয়গর্ব লাভ করিবে, জরাতুর এবং ভক্তি প্রবণ বৃদ্ধরাজা নীলধ্বজ তাহা বরদাস্ত করিতে পারিলেও বীরপুত্র প্রবীর তাহা

পারিল না; সে অশ্ব বাঁধিল—অর্জুনকে সংগ্রামে আহ্বান করিল; কিন্তু হায়,—মানুষের পৌরুষের বিরুদ্ধে মানুষের অজ্ঞাত-রাজ্যে চলিতেছে যে কি ভীষণ ষড়যন্ত্র,—দৈবরোষে প্রবীরের পতন হইল। কিন্তু যেখানে তাহার পতন সেখানে দৈব-ষড়যন্ত্র, নির্মম নিয়তির অজ্ঞাত বিধান সত্ত্বেও যেন তাহার ভিতরে আমরা খানিকটা দ্বন্দ্ব আশা করিতে পারিতাম। প্রবীরের ন্যায় বীরের একটি স্বর্গ-নায়িকার হাতে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ভিতরে আমরা দৈব-মায়া ব্যতীত এতটুকু মানসিক দ্বন্দ্বেরও পরিচয় পাইলাম না।

'জনা' অপেক্ষা 'প্রফুল্ল' নাটকে আমরা ট্র্যাজেডির সূক্ষ্মতর রূপ দেখিতে পাই। এখানেও অবশ্য বহির্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া মৃত্যুর বাহুল্যে ট্র্যাজেডির বেদনা যেন স্থূলে একটু বেশী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু তাহা হইলেও এখানে ট্র্যাজেডির মূল সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে প্রধান নায়ক যোগেশের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া। এখানে অবশ্য গিরিশচন্দ্র শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঘটনাগত বহিঃবিপ্লবের সহিত প্রধান নায়ক যোগেশের অন্তর্বিপ্লবের যোগ করিয়া ট্র্যাজেডির সুরটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু যোগেশের এই অন্তর্বিপ্লব কোথায়? একদিকে তাহার শিবতুল্যপ্রকৃতি, বিষয়বুদ্ধি, স্নেহ-দয়ামায়া,—অন্যদিকে তাহার পানদোষ এবং গভীর আত্মাভিমান। এইখানে মনে

হয়, যোগেশের যে অন্তর্বিপ্লব, তাহা যেন তেমন সূক্ষ্ম হইয়া উঠিতে পারে নাই। পানদোষের দ্বারা জীবনের যে ট্র্যাজেডি সঙ্ঘটিত হয়, সেখানে তাহার বেদনার ভিতরে কোন গভীর মহত্ত্ব জাগিয়া উঠিতে পারে না। আমরা যোগেশের ভিতরে যে দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি তাহা অনেকখানিই প্রকৃতিস্থ যোগেশ এবং মাতাল যোগেশের দ্বন্দ্ব। অতিরিক্ত পানদোষে যে 'সাজান বাগান' শুকাইয়া গেল সে করুণ হইয়াও সূক্ষ্ম ট্র্যাজেডির মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে নাই। সেক্সপিয়ারের আদর্শে অবশ্য গিরিশচন্দ্র যোগেশের প্রবল আত্মাভিমানের উপরে প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ট্র্যাজেডির নায়কগণের ভিতরে আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই নিজেকে অতিরিক্তরূপে বাড়াইয়া দেখিবার একটা প্রকৃতি, নিজেকে সংসারে এইরূপ অসঙ্গতরূপে বাড়াইয়া দেখিবার ফলেই মানুষ হইয়া ওঠে অসম্ভব রকমে আত্মাভিমানী; সেই আত্মাভিমানের ফলে সে হারাইয়া ফেলে জীবনের সামঞ্জস্য, ফলে জীবনের ট্র্যাজেডি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই অসঙ্গত আত্মাভিমানের লক্ষণ যোগেশের চরিত্রে স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইলেও ইহার উপরে তিনি প্রফুল্লের ট্র্যাজেডি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই;—কারণ এই প্রবল আত্মাভিমান এবং তাহার বিষময় ফল সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, অর্ধশুষ্ক 'সাজান বাগান' আবার নবীন হইয়া হইয়া বাঁচিয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু যোগেশের অতিরিক্ত

পানদোষই কাল হইয়া উঠিল। আমরা এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিতে পারি যে, 'প্রফুল্ল' সামাজিক নাটক; আমাদের সমাজ জীবনের যে করুণ বেদনা তাহা কোন বাহ্যিক ঘটনাবিশেষ হইতে আমাদের মানসিক পরিণতির ভিতরেই প্রকাশ পায় বেশী। স্বার্থান্বেষী কূটবুদ্ধি উকিল রমেশ যেদিন যোগেশের ন্যায় আত্মভোলা সদাশিব ভাইয়ের সহিত বিষয়ের বখরার হিসাব-নিকাশ করিতে আরম্ভ করিল, যোগেশের জীবনের সে ট্র্যাজেডিও কি কম গভীর? কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটকে গিরিশচন্দ্র ট্র্যাজেডির এ সূক্ষ্ম দিকটির প্রতি আর তেমন কোন জোর দিলেন না।

আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভিতরেই আমরা বাঙলায় প্রথম পাইয়াছি ট্র্যাজেডির একটা নিজস্ব রূপ,—যাহা একটা কাব্যের কৌশল বা ধরণ মাত্র নহে,—যাহা প্রতিষ্ঠিত বাস্তব জীবনের প্রতিটি স্পন্দনের উপরে। 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি উপন্যাসের ভিতরে একটা গ্রীক্ ট্র্যাজেডির ছায়া রহিয়াছে সত্য; কিন্তু তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসগুলি মূলতঃ জীবনের ট্র্যাজেডির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জীবনের এই ট্র্যাজেডি কোথায়? ঐ সেই যেখানে ব্যক্তিপ্রাণ তাহার আপন সত্তাকে বিসর্জনও দিতে পারিতেছে না, জগৎ-ব্যাপারের সহিত নিজকে বনাইয়াও লইতে পারিতেছে না,—শুধু সংসারের দুর্নিবার্য লৌহচক্রের তলে নিষ্পেষিত হইয়া মরিতেছে। এখানেও এই যে লাঞ্ছিত

ব্যথিত, নিষ্পেষিত জীবন তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমের কবিচিত্ত,—অন্তরে তাঁহার তীব্র বেদনা, অসীম সহানুভূতি! কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল, এ তাহার স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার স্পন্দন; কিন্তু ইহার সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্ব বাধিল সেই জগৎ-ব্যাপারের,—ভালবাসিয়াই জীবন হইল ট্র্যাজেডি, সংসার-যন্ত্রের নিষ্পেষণে বুকভরা পরিপূর্ণ সুধাভাণ্ড লইয়া কুন্দ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু কে বলিতে পারে কুন্দের বুকভরা যাহা ছিল তাহা সুধা কি বিষ! আর সুধাই হোক, কি বিষই হোক, তাহার জন্য কুন্দ কতখানি দায়ী ছিল? কুন্দের উপর সংসার অবিচার করিয়াছে, একথা সংসারের চোখে চাহিয়া বলা শক্ত; কিন্তু কুন্দ যে এত অপমান ও নিষ্পেষণের উপযুক্ত ছিল, একথাই বা বলা যায় কেমন করিয়া? সেই দুর্নিবার স্রোত—সেই অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য শক্তি—সেই নিয়তির অতি সূক্ষ্ম রূপ, সেই মানুষের অসহায়ত্ব! নগেন্দ্রও সেই শক্তির কাছেই বিপর্যস্ত; সেই অন্ধ-প্রকৃতি—গহন অন্ধকারের মুখে ঠেলিয়া চলিয়াছে,—সেও দেখিতে দেখিতে 'না-না' বলিতে বলিতেই আগাইয়া চলিতেছে, উপায় নাই! গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবনের ট্র্যাজেডি, প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনের ট্র্যাজেডি—ঐ একই সূত্রে গ্রথিত। তাই ইহাদের কাহারও উপরেই যেন আমাদের নৈতিক বিচার প্রয়োগ করিতে পারি না,—করুণাময় ব্যথিত চিত্তে শুধু তাকাইয়া

থাকিতে হয়, আর শুধু মনে হয়, এই জীবন—কত নিঃসহায়!

সূক্ষ্মদর্শী রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডির আদর্শও চলিয়াছে সূক্ষ্মের দিকে,—'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' প্রভৃতির ভিতরে রহিয়াছে সেই সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বে জীবনের ট্র্যাজেডি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ধারা এত বহুমুখী এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদর্শনও এমন বিভিন্নমুখী যে ট্র্যাজেডির আদর্শটি তাঁহার সাহিত্যে একটা বিশেষ কিছু হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ট্র্যাজেডির একটি গভীর এবং বিশেষ রূপ জাগিয়া উঠিয়াছে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। শরৎচন্দ্র দেখিলেন, জীবনটি যেন মুক্তাফল, তাহাকে যত টুকরা করিয়া ভাঙা যায় প্রত্যেক টুকরার ভিতরেই প্রতিফলিত দেখিতে পাই অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্যের অগাধ রহস্য, মানুষ তাহাকেই বা কতটুকু জানিতে পারিয়াছে? বেদনা শরৎ-সাহিত্যে গ্রহণ করিয়াছে অতি সূক্ষ্ম রূপ। 'মেজদিদি'র মাতৃহারা কেষ্ট যেদিন বৈমাত্র বোন কাদম্বিনীর বাড়িতে ভাত খাইতে বসিয়া মন্তব্য শুনিয়াছিল, 'এ হাতীর খোরাক নিত্যি যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে!' তখন কাদম্বিনীর সেই মন্তব্যে মর্মান্তিক লজ্জায় চৌদ্দবছরের মাতৃহীন কেষ্ট যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। সে দুঃখিনী মায়ের একমাত্র ছেলে, স্বাচ্ছল্য কোনও দিন দেখে নাই; কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইবার অপরাধে মাতা

তাহাকে কোনও দিন অপরাধী করে নাই। এখানে রাজ্যনাশ ঘটে নাই, প্রাণনাশ ঘটে নাই, শুধু আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীর সূক্ষ্ম একটি তারে পড়িয়াছে করুণ-কোমল আঘাত—তাহাতেই হৃদয়ের অন্তস্তল ভরিয়া গিয়াছে একটি করুণ বেদনার সুরে। 'অরক্ষণীয়া' জ্ঞানদা যদি জীবনের দুর্বিষহ ভারে, সমাজের নিষ্করুণ গ্লানির ভারে একদিন আত্মহত্যা করিয়া বসিত, আমরাও একদিন 'আহা' বলিয়া নিষ্কৃতি পাইতাম, কিন্তু তাহার তিনগুণ বয়সের পাত্রদের কাছেও বারবার রূপের পরীক্ষায় প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সর্বজন-ঘৃণ্য ওপাড়ার বৃদ্ধ গোপাল ভট্টাচার্যের নিকটে যখন নিজে নিজে সাজসজ্জা করিয়া অপরূপ বেশে একবার শেষ পরীক্ষা দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে ট্র্যাজেডিরই জীবন্ত মূর্তি। এখানেও জীবনের সেই পুঞ্জীভূত অপমান, মানবাত্মার নিদারুণ লাঞ্ছনা। অথচ জ্ঞানদা নামক জীবটি ইহার কোন কিছুর জন্যই দায়ী নহে। সে যে গরীবের মেয়ে,—সে যে শৈশবে পিতৃহারা,—তাহার যে রূপ নাই,—ইহার কোন্‌টার জন্য সমাজ তাহাকে দায়ী করিতে পারে? কিন্তু তথাপি তাহাকে মুখ বুজিয়া নীরবে সহ্য করিতে হয় সমাজের সকল গ্লানি,—তাহার সকল অকৃত কর্মের ফল! বেদনা-জর্জরিত জীবনের শিয়রে জাগিয়া উঠিয়াছে সেই অন্ধ-নিয়তির ক্রূর হাসি!

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ট্র্যাজেডির যে বেদনা সে দ্বন্দ্বের

বেদনা—বাহিরের দ্বন্দ্ব অনেকখানিই উপলক্ষ্য মাত্র,—নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব মানুষের অন্তরে। জ্ঞানদার জীবনেও রহিয়াছে অন্তরের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব,—তাহার ভিতরে যে বাস করিত একটি অন্তরাত্মা সে তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সঙ্গে কিছুতেই নিজকে মিলাইয়া দিতে পারিতেছিল না। সমাজ-জীবনের সহিত তাহার ব্যক্তি-জীবনের অনেকখানিই ছিল অমিল,—তাই সে তাহার ব্যক্তি-জীবনকে ঊর্ধ্বে টানিয়া লইতে পারে নাই, সমাজ-জীবনকেও ব্যক্তিত্বের উপরে আন্তরিক প্রাধান্য দিতে পারে নাই,—এখানেই তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি। শরৎ-চন্দ্রের চরিত্রগুলির ভিতরে যেখানেই রহিয়াছে ট্র্যাজেডি, সেইখানেই রহিয়াছে এই মনুষের ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার নিরন্তর দ্বন্দ্ব। মানুষের জীবনের মধ্যেই এই যে ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ ইহাই বর্তমান যুগ-সাহিত্যের অধিকাংশ ট্র্যাজেডির মূল। সমাজ কথাটিকেও এখানে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের জীবনের যে দ্বন্দ্ব তাহা ব্যক্তির সহিত পারিপার্শ্বিকের—ব্যক্তি-মনের সহিত চিরাচরিত সংস্কার, চিন্তা, রীতি-নীতি, পদ্ধতির। সমাজের সংস্কারের বাহিরে আমাদেরও যে রহিয়াছে একটি স্বাধীন সত্তা, সমাজ করিতেছে সে অধিকারকে অস্বীকার; আবার ব্যক্তি-জীবনও করিতেছে সমাজের অধিকার অস্বীকার; এইখানেই দ্বন্দ্ব। ব্যক্তি যেখানে নিজেকে সমাজের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছে, সেখানে জীবনের কোন বিপর্যয়েই

নাই ট্র্যাজেডি। ধরা যাক 'শেষ-প্রশ্নে'র কমলের কথা। জীবনে তাহার কত দুঃখ, কত ব্যথা—মৃত্যু, বিরহ, বিচ্ছেদ; কিন্তু কমলের জীবনে খুব বড় ট্র্যাজেডি নাই। দুই দিনের জন্য ভালবাসিতেও সে প্রস্তুত,—দুইদিন পরে সে ছাড়িয়া যাইতেও তেমনইতর প্রস্তুত,—মন তাহার সকল রীতিনীতির বাঁধনের বাহিরে,—জীবনে তাই নাই কোনও দ্বন্দ্ব। কিন্তু ট্র্যাজেডি রহিয়াছে 'পল্লী-সমাজে'র রমার ভিতরে, ট্র্যাজেডি রহিয়াছে 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর ভিতরে। রমার ভিতরে পাশাপাশি বাস করিতেছে দুইটি জীব, একটি তাহার ব্যক্তিসত্তা, অপরটি তাহার সমাজ-সত্তা। তাহার ব্যক্তিপুরুষ যেমন বিধবা হইয়াও সমাজ-সংস্কারকে পদদলিত করিয়া রমেশকে ভালবাসিয়াছে,—তাহার সমাজ-সত্তাও তাহাকে দিয়া ভৈরব আচার্যের পক্ষ হইয়া রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইয়া রমেশকে জেলে পুরিয়া লইয়াছে তাহার প্রতিশোধ। ব্যক্তি ও সমাজের যে এই বিরোধ ইহাকে রমা কোন দিনই কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই,—তাই সমগ্র জীবন তাহার ট্র্যাজেডি। কিরণময়ীর ভিতরেও ছিল একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব; তাই সে বিধবা কুলবধূ হইয়া আবার শাড়ী পরিয়া দিবাকরকে লইয়া উধাও হইয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত দিবাকরকে নিজের হাত হইতে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ছিল বলিয়াই যে কিরণময়ী একদিন উপনিষদের নচিকেতা-উপাখ্যানকে নিছক মিথ্যা

গল্প বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই কিরণময়ীই গঙ্গার পথে অপরিচিত পথিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত,—ভগবানকে কি করিয়া পাওয়া যায়! এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতেই কিরণময়ী বিকৃত-মস্তিষ্ক, তাই উপেন্দ্র যখন উপরের ঘরে বসিয়া জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করিতেছে, কিরণময়ী তখন নীচের ঘরে শুইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে! অদৃষ্টের সেই ক্রূর হাসি!

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের একটি মূল সুরই এই,—মানুষের ভিতর রহিয়াছে একটা প্রকাণ্ড দ্বৈতত্ব;—একটি তাহার অন্তর-পুরুষ—তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, অপরটি তাহার সমাজ-পুরুষ। এই দ্বৈতের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া মানুষের অন্তর-পুরুষটিই লাভ করিতেছে অপমান লাঞ্ছনা,—মানুষের অন্তর-পুরুষটিকে চিরদিনই আমরা বুঝিয়াছি ভুল। এই-খানেই শরৎচন্দ্রের কবিচিত্তের গভীর সহানুভূতি লাঞ্ছিত মানবাত্মার করুণ বেদনায়। এই যে জীবন সম্বন্ধে একটা তীব্র বেদনা-বোধ এবং অসীম সহানুভূতি ইহাই দান করিয়াছিল শরৎচন্দ্রকে একটি সত্যকার ট্র্যাজেডির দৃষ্টি।

মধুস্দনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী

এক সময়ে আমাদের বিশ্বাস ছিল, মানুষের মধ্যে যাহারা বীর তাহারা আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে সর্বদা গদা ঘুরাইয়া ফেরে; যিনি ধার্মিক তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ধর্মের ধ্বজাটিকে এমন করিয়া তুলিয়া রাখেন যে কোন প্রতিকূল বাতাসেই তাহার আর এতটুকুও নড়চড় হইবার উপায় নাই; আবার জ্বলন্ত আগুনে পোড়াইয়াও সতীর সতীত্বে এতটুকু খাদ মিলিত না। জীবন সম্বন্ধে সেই ছিল একটা সহজ বিশ্বাস—সরল দৃষ্টির যুগ। আধুনিক যুগের আমাদের জীবনও জটিল, দৃষ্টি ততোধিক কুটিল। বিংশ শতাব্দীর কোনও দশরথ তাঁহার যুবক পুত্রকে তাঁহার একটা অসাবধান এবং অসঙ্গত প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বনে যাইতে বলিলে রামচন্দ্র যে শুধু গোয়ার্তুমি করিয়াই পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিত তাহা নহে,—পিতৃসত্য পালনের ন্যায় তুল্য-মূল্যের আরও বহু কর্তব্যের নজির দিয়া পিতাকে হয়ত যুক্তি-সঙ্গতভাবেই নিরস্ত করিতে পারিত; কিন্তু কলিযুগের রামের পক্ষে তাহা সম্ভব হইলেও ত্রেতাযুগের রামের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই,—কারণ যুবক রাম যখন পিতৃভক্ত তখন সে পিতৃভক্তিরই জীবন্ত বিগ্রহ—আর কিছুই নহে।

মধুসূদন সম্পর্কে এইটাই বড় কথা বলিয়া মনে হয় যে, নিজের প্রতিভার স্বরূপধর্ম সম্বন্ধে তিনি নিজেই আত্ম-সচেতন হইবার সুযোগ এবং অবসর পান নাই। তাঁহার নিজেরই ভাষায়—তিনি 'ধূমকেতু'র ন্যায় বাঙলা সাহিত্যে সহসা আবির্ভূত হইয়া আবার 'ধূমকেতু'র মতনই হঠাৎ নিভিয়া গেলেন। ইহার ফলে তাঁহার নিজের কবিধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ভিতরেই স্পষ্ট চেতনা জাগ্রত হইতে পারে নাই,—তাহার ফলেই প্রতিভা যে কোন্ পথে সবচেয়ে ভালরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারিবে এবিষয়েই তিনি মাঝে মাঝে সংশয়ের দোলায় দোল খাইয়াছেন। তবে তাঁহার কবি-প্রতিভা যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এবিষয়ে তাঁহার কোনও দিন মনে কোনও সংশয় জাগে নাই। এই দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ই রহিয়াছে মধুসূদনের সকল সাফল্যের মূলে।

মধুসূদনের জীবন এবং তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতিভার যেটুকু পরিচয় মেলে তাহা হইতে মনে হয়, তিনি আসলে কবি, এবং কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি মহাকাব্যকার। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ছিলেন তাঁহার শৈশবের সঙ্গী, বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিল, ট্যাসো, দান্তে, মিল্টন—ইঁহারাই ছিলেন তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন। এই জন্য 'মেঘনাদ-বধে'ই তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ স্ফূর্তি; তাঁহার বর্ণিত অঙ্গনারাও 'বীরাঙ্গনা'। "What say you ?

Or must I sink into a writer of occasional Lyrics and Sonnets for the rest of my days? The idea is intolerable! Give me the সিংহল, old boy. I like a subject with oceanic and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope." গীতিকবিতা আর সনেট লিখিতে মন উঠিতেছে না, এমন ঘটনা চাই যেখানে সামুদ্রিক এবং পার্বত্য দৃশ্য থাকে, সমুদ্র-যাত্রা থাকে—যুদ্ধ থাকে—দুঃসাহসিক প্রেম থাকে; নতুবা কল্পনার সম্যক স্ফূর্ত্তির ক্ষেত্র কোথায়? বিরাটত্বের এইরূপ একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই মধুসূদনের জন্ম—এই বীরধর্ম রহিয়াছে তাঁহার সাহিত্যেও—জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রেও।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর বীর কেবল মাত্র বীর নহে,—সে হয়ত গহন পার্বত্য দেশে অথবা খাখা করা মরুভূমির বুকে বসিয়াও গোলাগুলির ফাঁকে ফাঁকে আপন মনে গান গায়। তাহার প্রকৃতিগত ধর্ম্মে এই উভয় কর্ম্মের ভিতরে সত্যকার কোনও বিরোধ নাই। মহাকাব্যের কবি মধুসূদনও চমৎকার লিরিক্ লিখিয়াছেন, ইহার ভিতরেও তেমনই কোনও গভীর বিরোধ নাই। ইঁহার ভিতরে কোন্‌টা তাঁহার খাঁটি প্রতিভার দান কোন্‌টা নহে এ প্রশ্নই ওঠে না,—দুইটাই তাঁহার খাঁটি প্রতিভার দান

হইতে পারে, এবং এখানে হইয়াছেও তাহাই। আসলে এপিকের ধাত এবং লিরিকের ধাতের ভিতরে আমরা যেমন করিয়া একটা বিজাতীয়ত্বের ভেদরেখা টানিয়া দিয়া থাকি, বর্তমান যুগের জটিল কবি-মানসের ধর্মে সে ভেদবাদ অনেকখানিই অচল। আর আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিব, আমরা যাহাকে সুবিশুদ্ধ এপিক্‌ধাত বলি, মেঘনাদ-বধে শুধু তাহাকেই পাই এমন নহে,—মহাকাব্যের ধ্রুপদরাগিণীর মাঝে মাঝে কেমন করিয়া লিরিকের তান আসিয়া গিয়াছে। আসিবেই ত—কবিমনের এই যৌগিক ধর্মই যে যুগধর্ম।

'মেঘনাদ-বধে'র কোলাহলমুখরিত রণোন্মাদনার পাশে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের নিভৃত আপন মনের গান। এই নিভৃত মনের গানেই মানুষের অন্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা সাধারণতঃ কোনও বড় লোককে জানিতে এবং বুঝিতে চাই তাঁহার জীবনের বড় বড় কাজের ভিতর দিয়া। ওটা আমাদের ভুল; মানুষের অন্তরাত্মার পরিচয় সব সময় বড় বড় কাজের ভিতর দিয়াই নহে, সে পরিচয় ছড়াইয়া থাকে অনেক সময় জীবনের ছোট ছোট টুকরা টুকরা কাজ ও কথার ভিতর দিয়া—পাহাড়ের ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মত। অনেক কথা অনেকক্ষণ বসিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে হইলে আমাদিগকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বহু কলা-

কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিতে হয়। এই বহুভাষণ এবং কলাকৌশলের আড়ালে আমাদের সহজমনের পরিচয় অনেকখানি ঢাকা পড়িয়া যায়। 'মেঘনাদ-বধে'র ভিতরে ভিতরে মধুস্‌দনের মনের পরিচয় রহিয়াছে বটে,—কিন্তু মহাকাব্যজাতীয় কাব্যের একটা স্বধর্মও রহিয়াছে,—কবি-মনকে সেখানে এই কাব্যের স্বধর্মের আড়ালে খানিকটা চাপা পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু সেই কবিমনের সহজতম এবং সুন্দরতম প্রকাশ এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ভিতরে।

মধুস্‌দন এই কবিতাগুলিতে যে ইটালীয় সনেটের গঠনরীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন চতুর্দশটি পদই (পংক্তি) তাহার আসল ধর্ম নহে,—আসল ধর্ম নিজের মনের ভাবাবেগ প্রকাশের ভিতরে একটা কঠোর সংযম। সনেট লিখিবার সকল কৃতিত্বই এইখানে,—হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস যত বড়ই হোক তাহাকে ঘনীভূত করিয়া ছোট্ট একটি ছাঁচের ভিতরে নিটোল ভাবে ঢালিয়া দিতে হইবে,—একটুও বেশী কম হইলে চলিবে না;—এইখানেই বিপদ, এবং এই জন্যই সার্থক সনেট একান্ত বিরল। নবীন সেন কোনদিন সার্থক সনেট লিখিতে পারিতেন না,—ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ন্যায় উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসের আবেগ আসিয়া সনেটের ক্ষুদ্র পরিসরকে ছাপাইয়া কবিকে যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইত তাহার ঠিক-ঠিকানা থাকিত না। কিন্তু মধুস্‌দনের এই সংযম ছিল;—তিনি হৃদয়ের

তরল উচ্ছ্বাসকে ঘনীভূত করিতে জানিতেন, কল্পনার রাশ টানিয়া ধরিতে জানিতেন,—এই জন্যই বাঙলা-সাহিত্যে সনেটের যে তিনি কেবলমাত্র প্রথম লেখক তাহা নহে,—তিনি সার্থক লেখক। মধুসূদনের সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। সংযমধর্মে নবীন সেন মধুসূদনের প্রায় বিপরীত বলিয়া এ কবিতাটিকে নবীন সেন কিরূপ লিখিতেন দেখা যাক।

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

নবীন সেন ইহার পরেই তাঁহার জীবন-কাহিনী তুলিতেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত ঘূর্ণাবর্তে অনুতাপ ও তজ্জনিত বিলাপের উচ্ছ্বাস। তারপরে—

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি—
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মন,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি,
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।

এখানেও আমরা আর একদফা আত্ম-জীবনের ফিরিস্তি এবং উচ্ছ্বাসের পুনরাবর্তন আশা করিতে পারিতাম। তারপরে—

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

ইহার কোন ঘটনাই নবীনচন্দ্রের হাতে এত সহজে ঘটিতে পারিত না। প্রথমে থাকিত দেশ-কাল-পাত্রের বিস্তারিত বর্ণনাসহ একটি সুদীর্ঘ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত—জননী কুললক্ষ্মীও অত সহজে নিস্তার পাইতেন না; তারপরে সুদীর্ঘ উত্তর-প্রত্যুত্তর, তারপরে কবির প্রত্যাবর্তন—সাহিত্যের সাধনা ও সিদ্ধির অন্ততঃ সামান্য কিছু ইতিহাস। কিন্তু মধুসূদন কত অল্পকথায় মনের কত কথা কত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদনের প্রথম জীবনের উঞ্ছবৃত্তির অনুশোচনা—পরবর্তী কালে বাঙলা-ভাষার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা এবং সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার আত্ম-প্রত্যয় এখানে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

সনেটের আদি কবি (ইটালীয়) পেট্রার্কের কবিতাগুলির ভিতরে সনেটের আরও একটি মৌলিক ধর্ম দেখিতে পাই। এখানে চৌদ্দপংক্তির কবিতাটিকে সাধারণতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম আট ছত্র লইয়া যে ভাগ কবির রসময় বক্তব্যটিকে তাহার ভিতর দিয়াই উপস্থাপিত করিতে হইবে; পরবর্তী ছয় পংক্তির ভাগে থাকিবে

উপস্থাপিত বক্তব্যটিরই কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ। সনেট যাঁহারা প্রথম ইংরেজী কবিতায় আমদানী করেন সেই কবিদ্বয়, ওয়াট (Wyatt) এবং সারে (Surrey) এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছিলেন; মিল্টনও মোটামুটি এই নিয়মের অনুগামী ছিলেন, সেক্সপিয়ার এই বাঁধন মানেন নাই; তবে ঐ স্বল্পায়তনের ভিতরে যে কবিমনের একটি মাত্র কথাকে সুষ্ঠু এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে হইবে এই মৌলিক লক্ষণ সম্বন্ধে কাহারও কোথাও কোন শিথিলতা নাই। মধুসূদনও বেশীর ভাগ কবিতাতে এই আট লাইন ও ছয় লাইনের ভাগ রক্ষা করিয়াছেন, আবার অনেক স্থানে করেন নাই। তবে বক্তব্যের আত্ম-পরিপূর্ণ সুষ্ঠু প্রকাশের ব্যতিক্রম কোথাও নাই। অবশ্য দু'এক স্থলে মাত্র কবি একই বিষয়ের অবলম্বনে দুইটি সনেট পরস্পরে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন,—এই পরস্পর গ্রথিত দুইটি সনেটের ভিতরে বিষয়টি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিযাছে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ভিতর দিয়া মধুসূদনের কাব্যবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আমরা জানিতে পারি। প্রিয়তমা বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে মিত্রাক্ষরের স্বর্ণালঙ্কার-রূপ বন্ধন খুলিয়া ফেলাকে মধুসূদন তাঁহার জীবনের একটা মস্তবড় মহৎ কাজ বলিয়া মনে করিতেন। ওটা যেন চলিতেছিল অন্তরের প্রেমের অভাবকে অলঙ্কারের প্রাচুর্য দ্বারা ভরাট করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আশে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী। কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি ওঠে রাগে।
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে?

কবিতারাণীর প্রতি সত্যকারের সোহাগ থাকিলে যে মিত্রাক্ষরের অলঙ্কার দ্বারা তাহার মন ভুলাইবার প্রয়োজন করে না এ বিশ্বাস মধুসূদনের মনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। এই জন্যই সারা জীবন এই ছন্দ লইয়া পরীক্ষা। 'তিলোত্তমা'কাব্যে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম বড় পরীক্ষা,—এখানে মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দে বেশ জড়তা—একটা আড়ষ্টতা রহিয়াছে। 'মেঘনাদ-বধে' ভাষা ও ছন্দ অনেক উন্নত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নিখুঁত নহে; অনেকখানি নিখুঁত 'বীরাঙ্গনা কাব্য'; কিন্তু মধুসূদন সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল এই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে। নিগড়হীন মুক্ত কবিতা এখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, তাহার কারণ বাঙলা ভাষার প্রাণধর্মের সহিত এতদিনে তাঁহার নিবিড়তম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

সাহিত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রসগুলি সম্বন্ধে মধুসূদনের

সনেট রহিয়াছে। ইহার ভিতরে রৌদ্ররস—

বড়ই কর্কশ-ভাষী নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।

শৃঙ্গাররসের বর্ণনাও তেমন জমিয়া ওঠে নাই। জমিয়া উঠিয়াছে বীররস এবং করুণরস, মধুসূদন যে-দুইরসের সত্যকার রসিক।

ব্যোমকেশ-সমকায়ঃ ; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে।
বিজলি-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
... ...
"বীররস এ বীরেন্দ্র ; রসকুলপতি !"

বীরেন্দ্র বীররস 'রসকুলপতি' বটে ; কিন্তু করুণরস 'রস-কুলে রাণী'। রসকুলপতি হইতে রসকুলরাণীর প্রতিই মধুসূদনের হৃদয়ের আকর্ষণ বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়।

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে মলিনমুখী, শরদের শশী
রাহুর গরাসে যেন ! বিরলেতে বসি,
মৃদু কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি,—
গলে অশ্রুবিন্দু, যেন মুক্তাফল খসি !
সে নদের স্রোতঃ, অশ্রু পরশন করি,—
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,—



গন্ধামোদী গন্ধ বহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে, বিজনদেশ; হৈল দৈববাণী—
"কবিতা-রসের স্রোতে এ নদের ছলে;
করুণা বামার নাম—রসকুলে রাণী;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে।"

করুণরসের প্রতি মধুসূদনের এই আকর্ষণ শুধু একটা কাব্যিক উচ্ছ্বাস নহে; ইহাতে মধুসূদনের কাব্যধর্মের স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মধুসূদনকে আমরা বীররসের কবি বলিয়াই জানি; কিন্তু মেঘনাদবধ-কাব্যে জমিয়া উঠিয়াছে কোন্ রস সব চেয়ে বেশী? মনে হয় তাহা করুণরস। বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রধান রস কি? বীর না করুণ? বীররস এবং করুণরস পরস্পর বিরোধী নহে; করুণরস বীররসের ব্যভিচারী,—সুতরাং উভয়ে একসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে। মধুসূদনের সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রধানই হইয়া উঠিয়াছে বীরমিশ্রিত করুণরস।

অনেকে বলেন, করুণরসই একমাত্র রস, আর সকল রস করুণরসেরই প্রকারভেদ মাত্র; সুতরাং মূলতঃ করুণ-রসকে অবলম্বন করিয়াই সকল সাহিত্য গড়িয়া ওঠে। ইংরেজ কবি শেলীর বাণী আমরা অনেকেই জানি—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

কবি ভবভূতি তাঁহার "উত্তররাম-চরিতে" বলিয়াছেন,—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্-
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।
আবর্ত-বুদ্বুদ-তরঙ্গময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎ সমগ্রম্॥

রস এক, সে করুণরস; নিমিত্তভেদে ভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বহু বিবর্তের আশ্রয় গ্রহণ করে; সমুদ্রের জল যেমন বিভিন্ন কারণে আবর্ত, বুদ্বুদ এবং তরঙ্গ প্রভৃতি বিকার লাভ করে,—কিন্তু মূলে তাহার সবই জল। রস যে মূলে এক তাহা অনেক আলঙ্কারিকই স্বীকার করিয়াছেন; কেহ কেহ করুণরসকেই এই মূল রস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্য-সৃষ্টি সমগ্র-ভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, মনের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তিনিও যেন এই বিশ্বাসেই বিশ্বাসী ছিলেন, এবং এইজন্যই বোধ হয় রসকুলরাণী করুণরসের প্রতি মধুসূদনের হৃদয়ের এত আকর্ষণ।

মধুসূদন তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ভিতরে দেশবিদেশের পূর্বসূরিগণকে তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের ভিতরে যেমন ভিক্টর হিউগো, আলফ্রেড টেনিসন্ রহিয়াছেন—আবার ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতিও রহিয়াছেন, অন্যদিকে আবার বাঙালীর ঘরের কবি জয়দেব, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র এমন কি ঈশ্বর গুপ্তও রহিয়াছেন। এই পূর্ব-

সূরিবর্ণনা মধুসূদনের প্রতিভার ঔদার্য। সকলে এমন করিয়া করেন নাই, পারিতেনও না। কাশীরাম দাসের বন্দনায় মধুসূদন যে শুধু কাশীরামের প্রতি তাঁহার আশৈশব শ্রদ্ধাকেই সুন্দর এবং গম্ভীর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে, অল্পায়তনের ভিতরে অদ্ভুত সংযম লইয়া সংস্কৃত-মহাভারতের বাঙলা রূপে অবতরণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

> চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিল যেমতি
> জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
> ঢালি সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি,
> তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
> কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী—
> (সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
> সগর-বংশের যথা সাধিল মুকতি ;
> পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবনে ;
> সেইরূপে ভাষাপথ খননি স্ববলে
> ভারতরসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
> জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিষম জলে।
> নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
> মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
> হে কাশী ! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

জনম-দুঃখিনী সীতার জন্য মধুসূদনের হৃদয়ের নিভৃত-প্রান্তে চিরদিনই একটি কোমল আসন বিছান ছিল।

'মেঘনাদ-বধে'র ভিতরে ইহার স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে, এই সনেটগুলির ভিতরেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

অণুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি ! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে
চারিদিকে চেড়িবৃন্দ চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায় বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষু হ'তে অশ্রুধারা ঘনে।

'রামায়ণ' কবিতাটিতে মধুসূদন সীতাকে 'নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে' বলিয়াছেন।

এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীকে অবলম্বন করিয়া মধুসূদনের অন্তর্নিহিত স্বদেশ-প্রীতি এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস-বাহুল্য আজকাল বেশ একটা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগুলির ভিতরে আমরা দেখিতে পাই, বাঙলার নদ-নদী, মাঠ-ঘাট,—এমন কি বাঙলার প্রান্তরের বৃদ্ধ বটগাছটি এবং বাঙলার কাননের 'বউ কথা কও' পাখীটি পর্যন্ত বিদেশে মধুসূদনের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই ত গেল স্বদেশ-প্রীতির কথা। বাঙলার কবি, বাঙলার মনীষী, বাঙলার ভাষা ও সাহিত্য—বাঙলার পাল-পার্বণ, আনন্দ-উৎসবও মধুসূদনের মন ভরিয়া রাখিয়াছিল,—ইহা তাঁহার গভীর স্বজাতি-প্রীতির নিদর্শন। তারপরে বাঙলার 'শ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিন

মাস', 'বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির', 'বিজয়া দশমী', 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা' প্রভৃতি সম্বন্ধে কবিতা মধুসূদনে অন্তর্নিহিত স্বধর্ম (হিন্দু) প্রীতির পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে অনেকেই বলেন যে, মধুসূদন স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া গেলেও এবং বিদেশী সভ্যতা, শিক্ষা এবং ধর্ম—এমন কি বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার গ্রহণ করিলেও স্বদেশ-, স্বজাতি- ও স্বধর্মপ্রীতি তাঁহার অন্তরে ফল্গুস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া অনেকে আবার মধুসূদনের নামের পূর্ববর্তী 'মাইকেল' কাটিয়া সেখানে অপূর্ব 'শ্রী'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমার মনে হয়, এ কবিতাগুলিকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কাব্যের ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিপুরুষের পরিচয় স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজাতি-প্রেমিক বা স্বধর্ম-প্রেমিকরূপে তত নয় যতখানি কবিরূপে। একটি কবিমন এবং একটি সাধারণ মনের ভিতরে প্রভেদ কোথায়? একটি সাধারণ মন বাহ্যবস্তু বা ঘটনাকে গ্রহণ করে মুখ্যতঃ তাহার ব্যবহারিক রূপে; সেই ব্যবহারিক রূপের ভিতর দিয়া যেটা প্রধান হইয়া ওঠে তাহা বস্তু বা ঘটনার অর্থক্রিয়াকারিত্ব। কিন্তু প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার ব্যবহারিক রূপকে ছাপাইয়া তাহার আর একটি মূর্তি ধরা পড়ে কবিমনের কাছে—উহা বস্তু বা ঘটনার রসমূর্তি; এখানে অর্থক্রিয়াকারিত্বের প্রভাব কিছু কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কখনও প্রধান করিয়া

দেখিলে চলিবে না, প্রধান হইয়া ওঠে কবিমনের কাছে ঐ রসমূর্তি। উপরে যে কবিতাগুলির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা সবচেয়ে বেশী করিয়া যে কথাটি প্রমাণিত হয় তাহা এই যে, মধুসূদনের ভিতরে বাস করিত একটি সত্যকারের কবিমন,—যে দেশ, জাতি, সমাজ, ধর্মের সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া পারিপার্শ্বিক জগৎকে গ্রহণ করিতে পারিত তাহার বিশুদ্ধ রসমূর্তিতে। দেশ-কাল-পাত্রের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই একান্তভাবে পরিচ্ছিন্ন বস্তুর যে রূপ তাহা বস্তুর সাহিত্যিক রূপ নয়, দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে—সকল স্বার্থ ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে বস্তুর যে রসরূপ তাহাই যথার্থ সাহিত্যের সামগ্রী। আমার মনে হয় 'শ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিন মাস', 'বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির', 'বিজয়াদশমী', 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা' প্রভৃতিকে মধুসূদন প্রধানতঃ বাঙালী বা হিন্দু দৃষ্টিতে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন মূলতঃ কবিদৃষ্টিতে।

ধর্ম সম্পর্কে বলিতে গেলে বলিতে হয়, মধুসূদন হিন্দুও ছিলেন না, খ্রীষ্টানও ছিলেন না। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের গলদ বুঝিতে পারিয়াই যে তিনি ত্রাণকর্তা যিশুকে আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা নহে, আশৈশব যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া জীবনের পথে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিয়াছিল, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে স্বদেশ-, স্বজাতি- এবং স্বধর্মত্যাগী —এমন কি স্বভাষা-, স্ব-সাহিত্যত্যাগী করিয়া তুলিয়াছিল।

তিনি যে নিজের ভাষা এবং সাহিত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ভিতরেও প্রধান ছিল একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অদম্য যশোলিপ্সা। ইংরেজী কাব্য রচনা করিয়া সেই যশ লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে তিনি ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্মবিশ্বাসের ভিতরে ভিতরে হিন্দু বিশ্বাস ও সংস্কারের ফল্গুস্রোতের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

'নিশাকালে নদীর তীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির' দেখিয়া মধুসূদনের যে ভাল লাগিয়াছিল এবং সেই সুখময় স্মৃতিটি যে সুদূর ভর্‌সেলস্ নগরেও তাঁহার মানসনেত্রে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ কোন প্রচ্ছন্ন ধর্মসংস্কার নহে, তাহার কারণ 'নিশাকালে নদীর তীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দিরে'র একটি সৌন্দর্য এবং রহস্যমণ্ডিত রসমূর্তি; মধুসূদন ঐ মন্দিরকে দেখিয়াছিলেন সেই রসমূর্তিতে এবং তাহাকে কাব্যে প্রকাশও করিয়াছেন সেই রসমূর্তিতে। বিশ্বসৃষ্টি যে তাহার সকল আয়োজনের দ্বারা নিভৃত নিশিতে কোনও বিশ্বনাথের আরাধনায় মগ্ন তাহা কোনও ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত না হইয়া বিশুদ্ধ কাব্যবুদ্ধি-প্রণোদিতও হইতে পারে। কোজাগর-লক্ষ্মীকেও মধুসূদন এই জাতীয় দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন। নিত্যনূতন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফলে আমাদের নব্যশিক্ষিতদের মন হইতে অনেক ধর্মসংস্কার লোপ পাইয়াছে এ-কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু তথাপি

দেখিতে পাই, শুচিস্নাতা কুলবধূগণ পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বিচিত্র আলপনায় ঘর ভরিয়া দিয়া যখন আম্রের পল্লবসহ ভরাকুম্ভের স্থাপন করে এবং পুষ্পে, চন্দনে ধূপে দীপে একটা আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে তখন তাহা আমাদেরও মন্দ লাগে না। তাহার কারণ, এই সমস্ত আয়োজন এবং আবেষ্টনীর ধর্মগত মূল্য ব্যতীত আর একটা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য —একটা রসের দিক আছে,—উহা দেশ-কাল-পাত্রের বাহিরে। অবশ্য ধর্মসংস্কার যে এখানে কিছুই কাজ করে না, একথা বলা যায় না,—তবে তাহার কাজই এখানে প্রধান নহে; সে আমাদের অবচেতনে থাকিয়া অস্ফুট বর্ণচ্ছটায় সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া তোলে।

আমাদের সাহিত্যের জগৎটা অনেকখানিই স্মৃতির জগৎ, —'Emotion recollectedly in tranquillity'। স্মৃতি জীবনের আবর্জনাকে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া জীবনের সুখদুঃখ হাস্য-অশ্রুমাখা যাহা কিছু মর্মস্পর্শী তাহাকেই আঁচল ভরিয়া যত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখে; স্মৃতি আমাদিগকে যখনই একাকী নিরালা মনে পায় তখনই তাহার সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার হইতে সপ্তরঙের রত্নগুলি আমাদের মানসপটে ভাসাইয়া তোলে,—অতি মধুর তাহাদের আস্বাদন। সুদূর ফরাসীদেশের ভর্‌সেলস্ সহরে বসিয়া বাঙলা দেশের নদ-নদী বৃক্ষলতা—আকাশের পাখী—উৎসব-আনন্দ সকলের মধুময় স্মৃতি মধুসূদনের চিত্ত ভরিয়া দিয়াছিল। আমরা আমাদের

প্রিয়জন হইতে যত দূরে সরিয়া যাই, সে আমাদের নিকট একটা অপূর্ব মহিমা লইয়া ততই মধুর হইতে মধুরতম হইয়া ওঠে। স্বদেশ সম্বন্ধেও তাহাই; দূর হইতে কল্পনায় আমরা তাহার সকল ত্রুটি সকল দৈন্য ভরিয়া লই,—তখন কি মধুর তাহার স্মৃতি—কি অমোঘ তাহার আকর্ষণ! মধুসূদনের ক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাহাই,—তাই—

সতত, হে নদ. তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে—
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।—
বহুদেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

শৈশবের বহুস্মৃতিজড়িত কপোতাক্ষ নদ! 'আশ্বিন মাসে'—

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরি উমা, বৎসরের পরে,
... ...
কি আনন্দ! পূর্ব্বকথা কেন ক'য়ে স্মৃতি,
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?

শৈশবের ধর্ম-সংস্কার—আনন্দের স্মৃতি—তাহার ভিতরে একটা অপরূপ মাধুর্য রহিয়াছে; বঙ্গের আশ্বিন মাস তাই

সুদূর প্রবাসে কবিমনে একটি অপূর্ব রসমূর্তিতে উদ্ভাসিত।

স্নেহের দুলালী উমাকে লইয়া বাঙালীর হৃদয়তারে বাৎসল্য-প্রেমের করুণমধুর সুর চিরদিন ঝঙ্কার দিয়াছে। কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাগণের 'আগমনী' সঙ্গীত করুণরসের সুধাধারা। বাঙালীর সেই সুরটি মধুসূদনের হৃদয়েও ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। 'বিজয়া-দশমী' সেই সুরেই ঝঙ্কৃতা—"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।

গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বারো মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি; কি সান্ত্বনাভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা কুন্তলে
এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি।"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী।

ইহা বাঙলার আগমনী গানেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—অমিত্রাক্ষরেরও পরম সফলতা—সনেটেরও সফল উদাহরণ। এইখানেই মধুসূদনের লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয়।

কবি হেমচন্দ্র

কবি হেমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বাঙলা সমাজে, সভ্যতায় এবং সাহিত্যে আধুনিকতার বান ডাকিয়াছিল। এই বানের জন্য তখন বাঙলার বুক একটা নিরন্তর ভাঙা-গড়ার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল; সেই অব্যবস্থিত যুগধর্ম্মের ভিতরেই হেমচন্দ্রের আবির্ভাব। এ বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, "হেমবাবু কালস্রোতের যে ভাগে প্রথম দেখা দেন, সেই ভাগ অতি বিষম। কালস্রোত তখন কেবলই ভাঙ্গিতেছিল; ভাঙ্গিব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল, গড়িব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল। হেমবাবুর জন্ম-সময়ে (৬ই বৈশাখ, ১২৪৫ সাল) কোন কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অনাচারে অত্যাচারে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া, অকালে কালগ্রাসে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত। আর এখন, হেমবাবুর মৃত্যু সময়ে (১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ) বোধ হয়, যেন সিকস্তির পর একটু পয়স্তি হইতেছে। ভাঙ্গনের পর যেন অন্যদিকে গড়নের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই ভাঙ্গন-গড়নের মাঝ-

খানে হেমবাবুর জীবন। পরে দেখিবেন, তাঁহার কবিতাতেও এই ভাঙ্গন-গড়ন কিরূপ ভাবে অনুস্যূত আছে।”

বাঙলা-সাহিত্যের পয়ার-লাচাড়ীর ধীর-মন্থর একটানা স্রোতে প্রথম উজান-স্রোতের ধাক্কা দিয়াছিলেন বিদ্রোহী কবি মধুসূদন; কিন্তু স্রোতের জলকে ধরিয়া না রাখিলে সে আবার আপনিই নামিয়া যায়—তাই মধুসূদনের প্রবর্তিত এই স্রোতকে বাঙলা-সাহিত্যে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন ছিল,—তখনই আবির্ভাব হইয়াছিল কবি হেমচন্দ্রের, প্রতিভার শৌর্যে কাব্য-জগতের এই নবজীবনকে ধারণ করিয়া রাখিতে—বাঙলা-সাহিত্যে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেখিতে পাই,—যখনই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দিব্য ভাবোন্মাদনায় বিহ্বল হইয়া পড়িতেন তখনই তিনি বলিতেন,—নিতাই আমায় ধর’। এ ধরা শুধু বাহিরের অবশ শিথিল দেহকে ধারণ নহে,—এ ধরার ভিতরে একটি গভীর ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। মহাপ্রভুর যে প্রেমোন্মাদনা—যে অনবদ্য ভাব-প্রাচুর্য প্লাবনের উচ্ছ্বাসের মত বাঙলা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন ছিল,—নতুবা প্লাবনের উচ্ছ্বাসের মতই হয়ত সে আপনি নামিয়া যাইত। তাই ভাব-বিহ্বল মহাপ্রভু সর্বদাই বলিতেন,—‘নিতাই আমায় ধর।’ নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর বাহ্যদেহকেই শুধু ধারণ করেন নাই,—তিনি ধারণ করিয়াছিলেন মহাপ্রভুর ভাবময় দেহকে,—আর তিনি

সেই প্রেমধারাকে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম বাঙলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। মধুসূদন আমাদের কাব্য-সাহিত্যে ভাষা ও ছন্দের যে বন্ধনহীন আবেগ আনিয়াছিলেন, ভাবধারার ভিতরে যে স্বাধীন প্রবাহ, যে তেজোদীপ্ত মহিমা আনিলেন শস্য-শ্যামলা বাঙলাদেশের পেলব ভূমিতে তাহাকে বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন এই দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা লইয়াই হেমচন্দ্র বাঙলা-সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি পেলব ললিত কাব্যপ্রিয় বাঙালীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।............বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দ্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয় তাদৃশ ভাব তাহাতে কৈ? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ কৈ? বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাচ্ছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়,—বেগ নাই, গভীরতা নাই,—তরঙ্গ-তর্জ্জন নাই;—মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, অথচ নয়ন-শ্রবণ-তৃপ্তিকর।.........বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদ-বধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী

প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য তুরী, ভেরী এবং দুন্দুভিধ্বনি আবশ্যক; ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতীত সুশ্রাব্য হয় না।”

জনসাধারণের পক্ষে কোনও কিছুর ভালমন্দ বিচারের একটি প্রধান রীতি এই যে, যাহা কিছু তাহাদের চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহাকে কিছুতেই যেন তাহারা বরদাস্ত করিতে পারে না,—এবং তাহারই ললাটে তাহারা আঁকিয়া দিতে চায় অসমর্থনের ছাপ। মধুসূদন আসিয়া প্রথম যেদিন প্রাচীনের ভিত্তি ধরিয়া সজোরে নাড়া দিলেন তখন একদিক হইতে যেমন লাভ করিয়াছিলেন আদর এবং অভিনন্দন, অন্যদিক হইতে উঠিয়াছিল তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ। এই সময়েই আবির্ভাব হেমচন্দ্রের,—মধুসূদনের দরদী কাব্য-রসিক হিসাবে,—তাঁহার অনুগত শিষ্য হিসাবে। তিনি ‘মেঘনাদ-বধ’কে—তাহার বজ্রগম্ভীরনাদে প্রবাহিত মিত্র-চ্ছন্দের বাঁধ-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে বাঙালী পাঠকের নিকট শ্রদ্ধার সহিত তুলিয়া ধরিলেন,—এবং একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, কবি হিসাবে হেমচন্দ্র মধুসূদনেরই উত্তরাধিকারী,—তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য। জহুরী ব্যতীত কেহ মুক্তা চিনিতে পারে না; মধুসূদন যে বাঙলা-সাহিত্যে কি জিনিস আনিয়াছেন,—কতটুকু তাহার মূল্য, কাব্য-জহুরী হেমচন্দ্রই সর্বপ্রথমে পাইয়াছিলেন তাহার সন্ধান। তাঁহার অন্তরে ছিল সেই কবিচিত্তের কষ্টিপাথর যাহাদ্বারা মধুসূদনের

কাব্যকে পরীক্ষা করিয়া তাহার মূল্য নির্ধারণ করিতে তাঁহাকে আর বিলম্ব করিতে হয় নাই।

মধুসূদন বাঙলাকাব্য-সাহিত্যে সূচনা করিলেন একটি বীরযুগের এবং মধুসূদনের অন্তর্ধানের পর কাব্যের এই বীর-যুগের সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হেমচন্দ্র। নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি সেই একই সুরের কবি। বাঙলাকাব্য-সাহিত্যে যে শুধু মৃদুমধুর তবলার বোলই শোনা যাইত তাহার কারণ, বাঙালীর জীবনেই যে ছিল না 'রণতরঙ্গ-বিলাসী প্রমত্ত যোধগণের' রণোৎসাহ। পাশ্চাত্ত্যের দুর্নিবার গতিবেগ আসিয়া যেদিন আমাদের স্থাবর জীবনে তুলিয়াছিল শৌর্য-বীর্যের প্রবল আলোড়ন সেইদিনই বাঙলার কাব্য-সাহিত্যে জাগিয়া উঠিল গম্ভীর শঙ্খধ্বনি,—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতির হাতে বাজিয়া উঠিল তুরী, ভেরী এবং দুন্দুভির রণবাদ্য।

এই যে বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ—ইহার মূলমন্ত্র একটা মনুষ্যত্ব বোধ,—একটা আত্ম-মর্যাদা বোধ, একটা জাতীয়তা বোধ—একটা স্বাধীনতার শৌর্য-বীর্যের উন্মাদ বাসনা। পশ্চিমের দুয়ার খুলিয়া সহসা যখন প্রচুর আলোক সম্পাতে আমাদের প্রাচীরবদ্ধ জীবনের ভিতরটা আমাদের চোখের সম্মুখে একেবারে ধরা পড়িয়া গেল, আমরা সচকিত হইয়া উঠিলাম। মুক্তদ্বারের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে কত বড় বিরাট বিশ্বজীবন,—কত

আলো, কত হাওয়া—কত মৈত্রী, সংগ্রাম, সঙ্ঘর্ষ—কত অনু-সন্ধিৎসা—কত কর্মোন্মাদনা। বাস্তবতার তীব্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল জীবনের সকল রূঢ় সত্য, বিশ্বজীবনের পাশে জাগিয়া উঠিল বাঙালী-জীবনের বেদনাময় পার্থক্য; বুঝিতে পারিলাম, কত সঙ্কীর্ণ আমাদের জীবনক্ষেত্রের পরিধি, —তুচ্ছ ক্ষুদ্র কত শত বন্ধনে বাঁধা রহিয়াছে আমাদের কর্ম জীবন,—কত অপমান পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে আমাদের জাতীয় জীবনে,—কত গ্লানি সঞ্চিত হইয়াছে আমাদের ধর্মে! জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নবীন বাঙলার ভিতরে জাগিয়া উঠিল তাহার গতানুগতিক জীবনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। একটা সংস্কারের প্রয়োজন,—একটা স্বাধীনতার স্বপ্ন নব্য বাঙলাকে একেবারে আকুল করিয়া তুলিল। এই নবীন সুরের প্রকাশেই গড়িয়া উঠিল বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের বীরযুগ। এই বীরযুগের কবি হেমচন্দ্রের সাহিত্যের ভিতরেও আমরা পাই সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন—সেই জাতীয়তা বোধ —ব্যক্তিত্বের স্পন্দন—বীর্যের গরিমা।

হেমচন্দ্রের বাল্য-জীবনের প্রথম রচনা 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কাব্য হিসাবে যতই ক্ষুদ্র এবং অসার্থক হোক, ইহার ভিতরেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে নবীন বাঙলার সেই বিদ্রোহ। একটি নবীন যুবক স্বদেশের ও সমাজের তৎকালীন দুরবস্থার কথা চিন্তা করিতে করিতে পাগলপ্রায় হইয়া গেল এবং পারিপার্শ্বিক সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার ভিতরে সমাজ-সংস্কার,

ধর্ম-সংস্কার এবং স্বদেশের উন্নতি একটিও সম্ভব নয় দেখিয়া সে আত্মহত্যা করিল ;—মোটামুটি ইহাই কাব্যখানির বিষয়-বস্তু। বিষয়টি পড়িয়া আজ যতই হাস্যকর মনে হোক, ইহার ভিতরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে শিশু কবির আপন মনের প্রতিচ্ছবিটি। তখনকার বাঙলার ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়-দীক্ষায় চলিতেছিল যে কি ভাঙন-গড়ন তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় রহিয়াছে এই অপরিণত কাব্যের ছত্রে ছত্রে। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আসিয়াছিল যে নবভাব ও সুর তাহা একটা বিশেষ পরিণতি লাভ করিবার পূর্বে তুলিতেছিল আপনার ভিতরে জটিল আবর্তন,—সেই আবর্তনে পড়িয়া নবীন বঙ্গ যে কি হাবুডুবু খাইতেছিল তাহারই ইতিহাস রহিয়াছে এই কাব্যে। একস্থানে দেখিতে পাই,—

> "দুর্ব্বল মানব-মন সেই সে কারণ।
> পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥
> সাকার স্বরূপে তাই নিরাকার ভাবে।
> মাটি পূজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে॥
> একবার এরা যদি প্রকৃতি-মন্দিরে।
> প্রবেশি ডাকিতে পারে জগৎ-বন্ধুরে॥
> শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
> পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল॥
> .. ..
> কিবা জবা-বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
> ধরা পূর্ণ ফলে-ফুলে করেছে যে জনে॥

কিবা ধূপ দীপ গন্ধ, তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ-ধূনা-কস্তূরী-নিদান॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন?
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্ম নাম।
মুক্তিপদ জানি সেই পরব্রহ্ম ধাম॥

ইহার ভিতর দিয়া তৎকালীন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ঢেউটি একেবারে নিরাভরণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

'চিন্তাতরঙ্গিণী' হেমচন্দ্রের কোন সার্থক কাব্য রচনা নহে, ইহা অপরিণত কবির তরল উচ্ছ্বাস এবং ইহার ভিতরে রহিয়াছে যৌবনোচ্ছ্বাসে অপরিপক্ক ভাবপ্রবণতার অপ্রীতিকর পরিণতি। কাব্যখানির উপরে ইংরেজ কবি বায়রণের 'ম্যানফ্রেড্' কাব্যখানির প্রভাব স্পষ্ট। তবে একটা জিনিস লক্ষণীয়, অপরিণত কবিমনের এই জাতীয় কাব্যোচ্ছ্বাস এবং তাহার ভিতর দিয়া একটা নৈরাশ্যবিলাস যেন ঐ যুগেরই এক রকমের একটা কবিধর্ম ছিল। নবীন সেনের 'রঙ্গমতী' কাব্যকে এই দিক হইতে হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র সহোদরা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এ সকল কাব্য কবিগণের প্রচ্ছন্ন আত্মজীবন। নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনকেই যেন একটা উচ্ছ্বাসময় কাব্যরূপের ভিতর দিয়া কবিগণ আলোচন করিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য 'রঙ্গমতী'র উৎসর্গ-পত্রে নবীনচন্দ্র ত বঙ্কিমচন্দ্রকে স্পষ্টই

লিখিয়াছিলেন,—“রঙ্গমতী আমার জীবনের একটি বিষাদপূর্ণ অঙ্কের ইতিহাস।” এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্য-কবিতাগুলিও কবির অস্ফুট কবি-মানসের প্রচ্ছন্ন প্রতিলিপি, সেখানেও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে উচ্ছ্বাস এবং নৈরাশ্য। কাব্য-বর্ণিত সমস্ত কাহিনীর বুনাটটি এত পাতলা যে তাহার অন্তরাল হইতে তরল উচ্ছ্বাসময় এবং তরল নৈরাশ্যময় কবিমনকে খুঁজিয়া লইতে কষ্ট হয় না।

পরবর্তী রচনা ‘বীরবাহু কাব্যে’র ভিতরেও দেখিতে পাই, কবি এখানে কান্যকুব্জের যুবরাজ বীরবাহুকে দিয়া একটি কাল্পনিক পাঠানরাজকে হত্যা করাইয়া হিন্দুর শৌর্যবীর্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন। কাব্যের বর্ণিত সমস্ত ঘটনাটিই অনৈতিহাসিক ; কিন্তু এই কাল্পনিক বীরবাহু দ্বারা কাল্পনিক পাঠানরাজকে হত্যার ভিতরেও গভীর অর্থ আছে। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা সেই নবজাগ্রত স্বদেশ-প্রীতি, স্বাধীনতা-বোধ ও বীরত্বেরই অস্ফুট প্রকাশ,—আকাঙ্ক্ষিত বীরত্বের মানসিক সম্ভোগ। এই স্বদেশ-প্রীতি, স্বাধীনতা-প্রীতি, এই শৌর্য-বীর্য—ইহার সকলই একটি গভীর পরিণতি লাভ করিয়াছিল কবির ‘বৃত্র-সংহার’ কাব্যে। সেখানে অত্যাচারী বৃত্রাসুরের নিধন-কল্পে দধীচিমুনির আত্ম-ত্যাগের ভিতরে যেন কবির আশৈশব বাসনারই একটা পূর্ণ বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু একটা জিনিস খুব সহজেই হেমচন্দ্রের কাব্যের

ভিতর দিয়া ধরা পড়ে; প্রচলিত সমাজ, সংস্কার এবং ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম জীবনে যতই বিদ্রোহ ঘোষণা করুন, তাঁহার অন্তরের ভিতরে গভীর ভাবে বদ্ধমূল ছিল হিন্দু আদর্শ এবং সংস্কার। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মতবাদ ও ভাবধারাগুলির সংস্পর্শে আসিয়া কবি অনেক সময়ে নৈরাশ্যবাদী হইয়া উঠিয়াছেন,—কিন্তু শেষ অবধি দেখিতে পাই নৈরাশ্যবাদ তাঁহার মূলস্থুর নহে। 'আশা-কানন' কাব্যখানি 'সাঙ্গরূপক' কাব্য।* 'আশা-কাননে'র ভিতরে দেখিতে পাই, কবি মোহিনী দেবীমূর্তিধারিণী আশার সহিত

* 'সাঙ্গরূপক কাব্যে'র লক্ষণ সম্বন্ধে প্রকাশক তাঁহার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন,—"আশাকানন একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য। মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরেজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যতঃ সাদৃশ্যসূচক বিষয়ের বিবৃতি কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্যবোধক। এই ইংরেজি শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে এরূপ কোন শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত নাই। এবং কোন বিচক্ষণ পণ্ডিতের নিকট অবগত হইয়াছি যে সংস্কৃত ভাষাতেও অবিকল প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তবে আলঙ্কারিকেরা, যাহাকে অপ্রস্তুত প্রশংসা বলিয়া উল্লেখ করেন, যৌগিকার্থে তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু সাঙ্গরূপক শব্দ সম্যক্ অর্থবোধক হওয়াতে তাহাই ব্যবহার করা হইল।"

'আশা-কাননে' প্রবেশ করিলেন,—সেখানে তিনি বিভিন্ন দিকের কর্মক্ষেত্র অভিমুখে বিভিন্ন প্রাণি-সংবাহ দেখিতে পাইলেন; কর্মক্ষেত্রের ছয়জন দ্বারী (শক্তি, অধ্যবসায়, সাহস, ধৈর্য, শ্রম ও উৎসাহ), পুরীমধ্যে যশঃশৈল; দেখিলেন রত্নোদ্যান, আকাঙ্ক্ষা-ভবন, যশঃশৈলে আরোহণ প্রথা—তাহার ভিন্ন ভিন্ন শিখর—যশস্বী প্রাণি-মণ্ডলীর কীর্তিকলাপ,—প্রণয়সেতু,—তাহাতে প্রাণিগণের গতিবিধি,—প্রণয়োদ্যান,—সতী নির্ঝর,—স্নেহউপবন প্রভৃতি; কিন্তু এইভাবে মোহিনী আশার ছলনা অনেক দেখিয়া শেষটায় তাঁহার চক্ষে পড়িয়া গেল বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তর্নিহিত নিরাশার ভীষণ মরুক্ষেত্র,—তাহার ভিতরে চির-প্রদীপ্ত অনলকুণ্ড,—এই নিরাশার বেদনা লইয়াই নৈরাশ্যের মরুভূমিতে কবির ঘুম ভাঙিল।

কবির 'ছায়াময়ী' কাব্য দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া'র ন্যায় বাইবেলের অনন্ত নরক এবং অনন্ত স্বর্গবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। 'ডিভাইনা কমেডিয়া' কাব্যের 'কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে' কবি 'ছায়াময়ী' কাব্য রচনা করেন। কাব্যের মুখপত্রে তিনি স্পেন্সারের দুইটি পংক্তি—

I follow here the footing of thy feete,
That with thy meaning so I may there rather meete.

অনুবাদিত করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে, ধরি এই মনরথে।

কবি আরও বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন,—"সেই মহাকবি দান্তের নিকট আমি কতদূর ঋণী, তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোকদৃষ্টেই বিদিত হইবে। ফলতঃ বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবের ও রচনা-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।"*

এই কাব্যের আখ্যানভাগে দেখিতে পাই, কোন এক ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়তমা দুহিতার মৃত্যুতে কাতর হইয়া কন্যার শব ক্রোড়ে করিয়া বহুদেশ পরিভ্রমণ করিলেন; অবশেষে একদিন সন্ধ্যাকালে ভূতপ্রেতের লীলাভূমি এক শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্মশানবাসীদিগের বীভৎস ক্রীড়া দেখিয়া সেই ব্যক্তির মনে মানুষের পরকাল এবং সেই প্রসঙ্গে মনুষ্যজীবনের রহস্য সম্বন্ধে নানা চিন্তা ও প্রশ্ন জাগিতে লাগিল। ভূতপ্রেতগণকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে দেহান্তে জীবনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ভূতগণ প্রস্থান করিলে সেই ব্যক্তি বিজন শ্মশানে বসিয়া শুধুই তাঁহার নির্মলপ্রাণা পবিত্রতার পুত্তলিকা দুহিতার কথা ভাবিতে লাগিলেন। সে এখন কোথায়? সেও কি প্রেতমূর্তি ধারণ করিয়া পিশাচীদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? সেই ব্যক্তি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন

* এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'হেমচন্দ্র' বইখানির দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তখন জ্যোৎস্নাময় গগনের কোল হইতে অকস্মাৎ এক দেবী-মূর্তি আবির্ভূতা হইলেন। সেই দেবীমূর্তি পাপাচারী জীবাত্মারা কিরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে সেই ব্যক্তিকে তাহা সকলই দেখাইলেন। বিবিধ নরক প্রদর্শন করাইয়া এবং সর্বশেষে বিশ্বকেন্দ্রস্থ ধর্মরাজের বিচার প্রণালী দেখাইয়া দেবী তাঁহাকে মর্ত্যলোকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিলেন, এবং আত্মপরিচয়ে বলিলেন যে তিনি তাঁহার মৃতা দুহিতা।

দান্তের অনুকরণে লিখিত বলিয়া কবি 'ছায়াময়ী'তে বিবিধ নরকেরই বর্ণনা করিয়াছেন, স্বর্গের বর্ণনা করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে কবি মানব-জীবন সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধেও আর কোন যথাযথ আলোচনা করেন নাই। তবে একটা জিনিস মনে হয় যে, জীবনের পাপের দিকটা এবং বিবিধ নরকে তাহার বিষময় পরিণতিই যেন কাব্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জীবনের পুণ্যের দিক এবং পরলোকে তাহার শান্তিময় পরিণতি কাব্যে প্রধান হইয়া উঠিতে পারে নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ভাষায় "পরকালে স্বর্গ-নরক দুই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার; যিনি পাঠকদিগকে একটির বিভীষিকা দেখাইলেন, অপরটির প্রলোভনও তাঁহার দেখান কর্ত্তব্য ছিল।" আমাদের কিন্তু মনে হয়, কবির নৈরাশ্যবাদই এখানেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মানব-জীবনের মূল্য কি এবং তাহার চরম পরিণতি ও

সার্থকতা কোথায় এ প্রশ্নের আভাস কবির 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'আশা-কানন', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতির ভিতরে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার নৈরাশ্যবাদ তাহার সমাধান লাভ করিয়াছে 'দশমহাবিদ্যা'র ভিতরে।

ভাষা, ছন্দ ও ভাবের দিক হইতে 'দশমহাবিদ্যা'য় হেমচন্দ্রের প্রতিভার একটা পরিণত রূপ দেখা যায়। এই কাব্যে কবি তান্ত্রিক ও পৌরাণিক 'দশমহাবিদ্যা'র পরিকল্পনাকে একটি আধুনিক সাহিত্যিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ, পৌরাণিক বিশ্বাস তখন মানুষের ভাঙিয়া গিয়াছে। আসলে এ যুগটা বিশ্বাসের যুগ নয়,—যুক্তির যুগ। এই যুক্তির আলোতে একদল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুদের প্রাচীন সকল শাস্ত্র—বিশেষ করিয়া তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিকে অবজ্ঞার হাসিতে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, আর একদল হিন্দুর প্রাচীন ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সকল পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিশ্বাসগুলিকে দর্শন ও বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তির উপরে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় যতই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠুক না কেন, ধর্মবিশ্বাসে হেমচন্দ্র খাঁটি হিন্দু; এই জন্যই 'দশমহাবিদ্যা'য় তিনি আদিশক্তির দশরূপকে নূতন কবিত্বময় ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছিলেন। এই ঝোঁকটি তৎকালীন সকল লেখকের ভিতরেই

অল্পবিস্তর দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণজীবনের পৌরাণিক এবং অলৌকিক সকল উপাখ্যান এবং কিংবদন্তিগুলিকেই যথাসম্ভব ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; যেখানে যেখানে তাহা মোটেই সম্ভব হয় নাই সেগুলিকে তিনি কৃষ্ণ-চরিত্র হইতে বাদ দিয়াছিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' দুর্গোৎসবের ভিতরে 'দশপ্রহরণ-ধারিণী' দুর্গার তিনি যে মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দুর্গার কোন তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মূর্তি নহে ; সেই তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মূর্তিকে অস্বীকার না করিয়া তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসক্তি সকল মিশ্রিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছিলেন দুর্গার নবমূর্তি। নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং প্রভাসের ভিতরে এই জিনিসটি দেখিতে পাই বহুস্থানে। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের জীবনের অলৌকিক বৃত্তান্তগুলিকেই যে শুধু তিনি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন তাহা নহে, পুরাণাদিতে বর্ণিত দশ-অবতারেরও তিনি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন।

পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, সতী দক্ষযজ্ঞে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিনা নিমন্ত্রণে যজ্ঞে যোগদানে শিব তাঁহার কঠোর আপত্তি জানাইলেন। সতী প্রথমে বহু অনুনয় বিনয় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শিবের মন টলিল

না দেখিয়া তিনি কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা এই দশ মহাবিদ্যারূপে শিবের নিকটে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং শক্তির ঐশ্বর্যময় স্বরূপ দর্শনে ভীত ও মুগ্ধ শিব সতীকে পিতৃযজ্ঞে গমনের অনুমতি দিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের কাব্যের আরম্ভ সতীহীন কৈলাসের বর্ণনা দ্বারা। এ বর্ণনাটি হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার একটি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। শোকের গভীরতায় এবং বর্ণিত স্থান-কাল-পাত্রের মাহাত্ম্যে সমস্ত বর্ণনাটি একটি গম্ভীর মহিমা লাভ করিয়াছে।

শুষ্ক কল্পতরু-সারি শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি
শূন্যকোলে সতীসিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগৎ-প্রাণ, নিরুদ্ধ সৌরভ ঘ্রাণ,
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গকূজন॥
নন্দী শুয়ে রেণুপর, কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্র বাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর দূরে রাখি বাঘাম্বর
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন॥

... ...

মুখে "সতী—সতী" স্বর বিনির্গত নিরন্তর
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন।
করে জপমালা চলে মুখে বববম্ বলে
অন্য শব্দ সকলি মলিন॥

জলমগ্ন ফণিমালা মিশাইয়ে জিহ্বাজ্বালা
লুকাইল জটার ভিতর।
নিস্পন্দ পবনস্বন নিরানন্দ পুষ্পগণ
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণুপর॥
থামিল গঙ্গার রব নির্ব্বাক প্রমথ সব
কৈলাস জগৎ অচেতন।
কদাচিৎ "মা মা" নাদে অসংবিৎ নন্দী কাঁদে
বম্ শব্দ সহ সম্মিলন॥
কৈলাস-অম্বরময় তারা সূর্য্য অনুদয়
ক্ষণকালে নিবিল সকল।
তমশ্ছন্ন দিগাকাশ কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল॥
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্কন্ধে কভু তুলি হাত
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার সুকুমার তনু তাঁর
মমতার অভ্যাস যেমন॥

ইহার পরে কবি যে শিবের বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও ভাষা, ছন্দ এবং বর্ণনার ভিতর দিয়া দেবাদিদেবের মহিমা ও গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়াছে।—

"রে সতি রে সতি" কাঁদিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যতদিন তত দিন না ছিল ক্লেশ॥

শোকাচ্ছন্ন কৈলাসে নারদের আগমন হইল,—হাতে

ঝঙ্কৃত হইতেছে বীণা। সে বীণায় বাজিয়া উঠিল অনন্ত জিজ্ঞাসা,—কি করিয়া এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল,—কিরূপে তাহারা বিরাট শূন্যপথে অবিরাম আবর্তিত হইতেছে,—এ আবর্তনের মূল রহস্য কি? কি করিয়া সৃষ্টি হইল চেতনের—অসংখ্য প্রাণিকুলের—অনন্ত জীবন ধারার?—আর—

সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ!
মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা;
মিটে না মনের সাধ, হৃদয় বেদনা!

নারদের আগমনে মহাদেবের সাময়িক মোহ কাটিয়া গেল,—সতীর স্বরূপ তাঁহার ধ্যাননেত্রে আবার ভাসিয়া উঠিল—সতী বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তর্নিহিতা, বিশ্ব-সৃষ্টির কারণরূপা অনাদি শক্তি! নারদকে জ্ঞান দান করিবার জন্য মহাদেব বিশ্ব-সৃষ্টির উপর হইতে মায়ার আচ্ছাদন সরাইয়া দিলেন। নারদ দেখিতে পাইলেন, বিশ্বসৃষ্টি একটা জড়-অণুপরমাণুর অর্থহীন প্রবাহ মাত্র নহে,—এক অনাদি শক্তি এই অসীম অনন্ত শূন্যপথে অসীম অনন্ত কালে এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারটিকে সৃষ্টি করিতেছে এবং পরিচালিত করিতেছে। মহাশূন্যে মহাকাশে ক্রমাবর্তনের রীতিতে বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একটি মঙ্গলের পথে ধাবিত হইতেছে; মঙ্গলের পথে ক্রমাবর্তনের ভিতরে দশটি স্তরে ব্রহ্মাণ্ডের দশটি পৃথক্ পৃথক্ রূপ ভাসিয়া উঠিয়াছে—

অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী—
ক্রমে জীব পূর্ণ-কামনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা॥
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিত মণ্ডলী॥

নারদ বিশ্বসৃষ্টির মূলতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন,—বুঝিলেন, এক অলক্ষ্য মঙ্গলময় বিধানে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত হইতেছে; ক্রমবিবর্তনের নিয়মে স্তরে স্তরে চলিয়াছে সুখ-দুঃখের খেলা; কোনও বিশেষ অবস্থায় তাহাকে সমগ্রতার সহিত যুক্ত করিয়া না দেখিতে পারিলেই তাহার অর্থ এবং তত্ত্ব কিছুই অবগত হওয়া যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের এই দশ স্তরে প্রকাশিত হইয়াছে মূল আদ্যাশক্তির দশরূপ এই দশ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে,—এই দশ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দশ দেবীই দশমহাবিদ্যা। দশব্রহ্মাণ্ডই যেমন মূলে এক, দশমহাবিদ্যাও তেমনি মূলে অদ্বৈতরূপিণী।

সাধারণ তন্ত্রমতে শিব জ্ঞানমাত্রতনু,—নির্গুণ—নির্বিকার; ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার আবর্তিত হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির লীলায়। সাঙ্খ্য-দর্শনের ভিতরে দেখিতে পাই, পুরুষ এবং প্রকৃতি অন্যোন্যনিরপেক্ষ পৃথক্ পৃথক্ সত্য হইলেও প্রকৃতি যে মূলে পুরুষের আনন্দবিধানের জন্যই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড রূপে আবর্তিত হইতেছেন, এমন আভাস স্থানে স্থানে রহিয়াছে। তন্ত্রে শিব এবং শক্তি অভিন্নস্বরূপ,—শক্তি আপন লীলায় যতই উন্মাদিনী হইয়া নৃত্য করুন,

দৃষ্টি তাঁহার নিবদ্ধ রহিয়াছে শিবের দিকে,—শিবের বুকেই শক্তির খেলা। ব্রহ্মাণ্ডলীলার ভিতর দিয়া শক্তি শিব-সাধিকা,—সুতরাং সকল সুখদুঃখ, ভাঙাগড়া, আশা-নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া সকল প্রাণী মঙ্গলের পথেই নিরন্তর আগাইয়া চলিতেছে।

'দশমহাবিদ্যা'কার কবি,—দার্শনিকও নহেন, বৈজ্ঞানিকও নহেন; সুতরাং তাঁহার কাব্যে আমরা 'দশমহাবিদ্যা' সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লাভের আশা করিতে পারি না। কিন্তু কাব্যধর্মের দোহাই দিয়াই যে বক্তব্যকে যতখানি ইচ্ছা অস্পষ্ট এবং এলোমেলো করা যাইতে পারে এমন কথাও শ্রদ্ধেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। হেমচন্দ্রের কাব্যের ভিতর দিয়া তাঁহার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার বর্ণিত দশব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার অধীশ্বরী দশমহাবিদ্যার রূপ এবং গুণ কিছুই স্পষ্ট বা যুক্তিসম্মত হইয়া ওঠে নাই। কবি দশমহাবিদ্যার যে বিশেষ বিশেষ রূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে যে বিশেষ বিশেষ গুণের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে কোনও গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। কবির স্বকপোলকল্পনাকেও কোথাও অর্থহীন হইলে চলিবে না। 'কাব্য-কুহেলী' সর্বাবস্থায় এবং সর্বরূপে গ্রাহ্য নহে; বিশেষতঃ প্রাচীন রূপকে নবরূপে অঙ্কিত করিতে গিয়া এরূপ

'কাব্য-কুহেলী' অচল। আসলে হেমচন্দ্রের নিজেরই 'দশ-মহাবিদ্যা' সম্পর্কে কোনও যুক্তিসম্মত স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না; তাঁহার মনে প্রথমাবধি বিশ্ব সৃষ্টির মূল-রহস্য সম্বন্ধে যে একটা নৈরাশ্যবাদ ছিল, ভারতীয় শিব-শক্তির আদর্শকে অবলম্বন করিয়া সেই নৈরাশ্যবাদই এখানে একটা মঙ্গলময়ী আশার আলো লাভ করিয়াছে মাত্র।

'বৃত্র-সংহার' মহাকাব্যেই কবি হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার চরম বিকাশ। দোষে গুণে 'বৃত্র-সংহার' কাব্য বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ-কাব্য' লিখিয়াছিলেন হোমার, দান্তে, ভার্জিল, ট্যাসো, মিল্টন প্রভৃতির আদর্শে; কিন্তু হেমচন্দ্রের আদর্শ অনেকখানিই ছিলেন মধুসূদন। কাব্যাদর্শের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, 'বৃত্র-সংহারে'র পৌরাণিক উপাখ্যানের কঙ্কালে রক্তমাংস সংযোগ করিতে গিয়া জ্ঞাতে অজ্ঞাতে হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধে'র বিষয়বস্তু দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছেন বেশী; ফলে 'বৃত্র-সংহারে'র বৃত্র 'মেঘনাদবধে'র রাবণেরই সম-জাতীয়; মেঘনাদের সহিত রুদ্রপীড়ের সাদৃশ্যের কথা স্বতঃই মনে আসে; ইন্দুবালা প্রমীলারই সহোদরা, ইন্দ্র রামেরই প্রতিচ্ছবি, শচী সীতারই প্রতিমূর্তি, চপলা সরমা সখীর সম-জাতীয়া,—নৈমিষারণ্যে বন্দিনী শচী অশোকবনে বন্দিনী সীতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এমন কি রুদ্রপীড়ের মৃত্যুর পর শোকে উন্মাদিনী

মাতা ঐন্দ্রিলা যখন বৃত্রাসুরের সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল, তখনকার বর্ণনা—

হেনকালে তথা শিশুহারা কেশরিণী
বন আন্দোলিয়া ভ্রমে যথা গিরিমাঝে
আইলা ঐন্দ্রিলা বালা—আলুলিত কেশ
বিশৃঙ্খল বেশভূষা, সুঘন নিশ্বাস
কম্পিত নাসিকারন্ধ্রে, অঙ্কিত কপোলে
শুষ্ক অশ্রুজলধারা ;—

ইহা আমাদিগকে বীরবাহুর শোকে পাগলিনী চিত্রাঙ্গদার বর্ণনাই মনে করাইয়া দিবে।—

হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল সাথে
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলুথালু, হায়, এবে কবরী বন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতনহীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন!

কিন্তু আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, অনেকস্থলে অনুকৃতি অপেক্ষা অনুকার্যের শ্রেষ্ঠতা বজায় রহিয়াছে। শচী ও চপলার কথোপকথন হইতে সীতা ও সরমার কথোপকথন অনেক সুন্দর। রুদ্রপীড়ের যুদ্ধযাত্রার কালে ইন্দুবালার নিকট হইতে বিদায় লইবার দৃশ্যে ইন্দুবালা

নিরেট অবলা বাঙালী মেয়ে হইয়া গিয়াছে, সে দানব-নন্দিনী প্রমীলার সজাতীয়া নহে।

কিন্তু দুইটি বিষয়ে শিষ্য হেমচন্দ্র গুরু মধুসূদনকেও হারাইয়া গিয়াছিলেন,—ইহা প্রথমতঃ তাঁহার কাব্যের বিষয় নির্বাচনে, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মহাকাব্যের সুদৃঢ় সংযত বলিষ্ঠ কঠোর বাঁধুনীতে। মহাকাব্যের আখ্যানভাগের বৈশিষ্ট্য ইহার লোকোত্তর অনন্যসাধারণতা, ইহার মহান গাম্ভীর্য। মধুসূদনের আখ্যান-বস্তুর এইখানে ছিল একটা প্রকাণ্ড দুর্বলতা। 'মেঘনাদ-বধে'র বিরাটত্ব এবং গাম্ভীর্যকে অনেক-খানি সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে মধুসূদনকে নিজের। রাবণ যে পরস্ত্রী হরণ করিয়া আনিয়াছিল এ-কথাটাকে মধুসূদনকে ভুলাইয়া লইতে হইয়াছে এবং এই জন্য মধুসূদনকে বাল্মীকির রামায়ণকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া সাজিতে হইয়াছিল। রাম-লক্ষ্মণ রাবণ-ভগ্নী শূর্পণখার অপমান করিয়াছিল,—রাবণ রামের স্ত্রীকে হরণ করিয়া তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছে, এই দৃষ্টিতেই কবিকে 'মেঘনাদবধে'র আখ্যানবস্তুকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে হইয়াছে। কিন্তু শুধু এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই 'মেঘনাদবধ' যতটুকু মহাকাব্যের মহিমা লাভ করিয়াছে তাহা করিতে পারিত না; কাব্যকে এই মহিমা দান করতে হইয়াছে আরও এক উপায়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের মহিমাতেই 'মেঘনাদবধ' মহিমান্বিত। রাম-লক্ষ্মণ কোন্ দেশ হইতে

আসিয়া সাগর বন্ধন করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিয়াছিল,—প্রত্যেক স্বদেশভক্ত রাক্ষসের উচিত জীবনের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়া পরপীড়ন হইতে দেশকে রক্ষা করা ; মেঘনাদ তাহাই করিয়াছিল, তাই সে বীর ; আর বিভীষণ তাহা করে নাই, তাই সে ভীরু, বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী। এই দেশপ্রেম এই স্বাধীনতার সুরের জোগান দিয়া মধুসূদনকে মেঘনাদ-বধের উপাখ্যানকে দাঁড় করাইতে হইয়াছে। এই সুর-মিশ্রণ হেমচন্দ্রকেও করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উপাখ্যান-ভাগের নিজস্ব মহিমাই ছিল অনেকখানি। 'বৃত্রসংহারে'র ভিতরে দেবগণ কর্তৃক স্বর্গের পুনরুদ্ধারের ভিতরে স্বদেশ-উদ্ধার ও স্বাধীনতা লাভের মহিমা যে জড়িত ছিল না তাহা নহে ; পরাজিত এবং পলায়িত দেবগণকে দেবসেনাপতি স্কন্দ তিরস্কার করিয়াছিলেন—

> ধিক্ দেব ! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়ে
> এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
> দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া
> দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।

বৃত্রাসুর-পত্নী ঐন্দ্রিলা কর্তৃক লাঞ্ছিতা শচী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া দেবী মহামায়া সখী জয়াকে বলিতেছেন,—

> এতদিনে ইন্দ্রজায়া বুঝিল রে জয়া,
> বিজিতের হৃদিদাহ কিবা বিষময়
> কি বিষম কালকূট-জ্বালা অধীনতা !

বন্দিনী শচী যখন স্বর্গে নীতা তখনও কবি মন্তব্য করিয়াছিলেন—

কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
স্বদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনম-ভূমি তার) নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণিকুল,
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে
"এই জন্মভূমি মম !" কে আছে রে হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ !
বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত,
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে ! *

এই স্বদেশ-প্রীতি—এই স্বাধীনতার মন্ত্র যুগবাণী ; রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যও এই স্থরে ঝঙ্কৃত। কিন্তু মধুস্থদনের ন্যায় হেমচন্দ্রকে এই যুগবাণী দ্বারাই কাব্যের আখ্যানবস্তুকে মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা করিতে হয় নাই। দেবগণের অস্থরহস্তকবলিত স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের ভিতরে গৌরব ত আছেই, অধিকন্তু অত্যাচারীর ধ্বংস এবং জগতের

* এ ছত্র কয়টি অবশ্য ইংরেজ কবি Scott-এর "Breathes there the man with soul so dead"—প্রভৃতি কবিতাটিরই ছায়া মাত্র।

মঙ্গলের জন্য দধীচিমুনির অপূর্ব আত্মত্যাগ সমগ্র 'বৃত্র-সংহারে'র উপাখ্যান-ভাগটিকে একটি নিজস্ব গাম্ভীর্য এবং লোকোত্তর মাহাত্ম্য দান করিয়াছে।

'বৃত্র-সংহারে'র দ্বিতীয় গুণ ইহার ভাস্কর্যের ন্যায় কঠোর বাঁধুনি,—সমগ্র কাব্যখানি যেন পাথরে-খোদিত বিরাট-মূর্তির ন্যায় স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও এতটুকু অনাবশ্যক বা অসংলগ্ন বিষয়ের অবতারণা নাই। আখ্যানবস্তুর অখণ্ডত্ব এবং সমগ্রত্ব খুব সহজেই চোখে পড়ে। মধুসূদনেরও মহাকবির উপযুক্ত সংযম ছিল, কিন্তু 'মেঘনাদ-বধে'র আখ্যানবস্তু 'বৃত্র-সংহারে'র আখ্যানবস্তুর ন্যায় সুসম্বদ্ধ নহে। এই দিক হইতে নবীনচন্দ্রের রচনারীতি ছিল হেমচন্দ্রের বিপরীত। বস্তুতঃ 'বৃত্র-সংহারে'র বিরাট এবং মহান আখ্যানবস্তু—এবং হেমচন্দ্রের সুদৃঢ় রচনারীতি উভয়ে মিলিয়া 'বৃত্র-সংহার' কাব্যকে একটি অপূর্ব গাম্ভীর্য দান করিয়াছে। 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছিলেন,—"যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ-সমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব-দানব-মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত

হইতে হয়, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখনও বা ক্রোধ এবং কখনও বা করুণ রসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি ?" হেমচন্দ্র মধুসূদন সম্পর্কে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকখানি তাঁহার নিজের কাব্য সম্বন্ধেও প্রযুজ্য।

'বৃত্র-সংহার' কাব্যও নিয়তি বা অদৃষ্টবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু এই অদৃষ্টবাদ 'মেঘনাদ-বধে'র অদৃষ্টবাদ হইতে পৃথক্। 'মেঘনাদ-বধে'র অদৃষ্টবাদ গ্রীক্ অদৃষ্টবাদ হইতে গৃহীত ; সে অদৃষ্ট বা নিয়তি মানুষের পুরুষীয় সকল শক্তির ঊর্ধ্বে এবং সর্বশক্তিনিরপেক্ষ একটি অদৃশ্য এবং অলঙ্ঘ্য অলৌকিক শক্তি। কিন্তু হেমচন্দ্রের মন ছিল হিন্দুবিশ্বাসে ভরা, তাই তাঁহার অদৃষ্ট বা নিয়তি প্রতিষ্ঠিত কর্মবাদের উপরে। কিন্তু যাহাই হোক, বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পূর্বে দেবগণকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই ত্রিমূর্তির ইচ্ছায় এবং আদেশে 'বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত' করিয়া লইতে হইয়াছে।

> হেথা ভাগ্যদেব গাঢ়-চিন্তা-নিমজ্জিত ;
> বসিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রান্তে বিনত সম্মুখে
> বিশাল প্রাক্তন-লিপি—দৃশ্য মনোহর।
> ছায়া ইন্দ্রজালে যথা ধূর্ত্ত যাদুকর

দেখায় অদ্ভুত রঙ্গ—অদ্ভুত তেমতি
অনন্ত আলেখ্য অঙ্গে ক্রীড়া নিরন্তর

... ...

বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্য পরে
কত শোভা-বিভূষিত, কত আভাময়
জ্বলিছে উজ্জ্বলমূর্ত্তি—প্রদীপ্ত ছটায়
ত্রিভুবন প্রজ্জ্বলিত !—হেরিলেন ভাগ্য
কুতূহলে ! হেনকালে অম্বর বিদারি
ধ্বনিল ভৈরবমূর্ত্তি—আকাশবাণীতে
প্রকাশিয়া ব্রহ্মরূপী ত্রিমূর্ত্তি আদেশ।
সভয়ে প্রাক্তন শীঘ্র ফিরায়ে নয়ন
নিরখিল চিত্রপটে—দেখিলা সহসা
বৃত্রের বিশাল চিত্র কালিমা-মণ্ডিত,
মিশাইছে ধীরে ধীরে শোভা-বিরহিত !

তারপরে বৃত্রাসুর যেখানে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে—

"হে দৈত্য দৈত্যমহিষি,
জানি সে কঠোর বিধি করিছে নির্ম্মূল
বৃত্রের হৃদের আশা কুঠার আঘাতে।"

অথবা— "হের মন্ত্রি বিধাতার বিধি অদভুত—
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে এক কালে ! ...

... ...

মৃত্যুর সময়ে
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে !
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে ?

তখন আমাদের বিধাতার ক্রূর বিধান স্মরণ করিয়া ধ্বংসপ্রায় রাবণের খেদোক্তির কথাই মনে পড়িয়া যায়। তবে অনেকস্থানেই এগুলি রাবণের কাতরধ্বনির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিয়াছে।

নানাপ্রকার বিশিষ্টতা সত্ত্বেও যে 'বৃত্র-সংহার' 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র তুল্য হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার কারণ হেমচন্দ্রের রচনায় কবিত্ব, সরলতা এবং প্রাঞ্জলতার অভাব। এদিক হইতে আবার নবীনচন্দ্র ছিলেন হেমচন্দ্রের বিপরীত ; তাঁহার ছিল না সংযম ও সঙ্গতিবোধ,—কিন্তু কবিত্ব, সরসতা এবং প্রাঞ্জলতা ছিল তাঁহার হেমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশী। হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহারে'র ভাষা অনেক স্থলে অস্পষ্ট এবং গদ্যাত্মক, বচনবিন্যাস আড়ষ্ট। হেমচন্দ্রের কাব্যে যে জিনিসটির অভাব সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয় তাহা প্রসাদগুণ। মাঝে মাঝে পদসমষ্টির ভিতরকার অন্বয় যেমন শিথিল, বাক্য-সমষ্টির অন্বয় তদপেক্ষাও শিথিল। মহাকাব্যের গঠনের ভিতরে আধুনিক ঔপন্যাসিক রীতি এবং নাটকীয় রীতি পরস্পরে জড়িত হইয়া থাকে ; সেই মহাকাব্য ভাঙিয়াই একদিকে উপন্যাস এবং অন্যদিকে নাটকের উৎপত্তি। নাটকীয় গুণ এই জন্য মহাকাব্যের পক্ষে

অপরিহার্য। এই নাটকীয় সংলাপে হেমচন্দ্র খুব বেশী স্থানে রসোত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই ; বচনভঙ্গির দুর্বলতায় অনেক বর্ণনাই একান্ত গদ্যাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব ত্বিষাম্পতি
উঠিলা প্রখর তেজা—কহিলা সবেগে—
"বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্ব্বজন,
ভাবিও সে বৈধাবৈধ বাঞ্ছনীয় শেষে।"

অথবা— কহিলা প্রচেতা—"কিন্তু অবসর পেয়ে
ঘটায় উৎপাত যদি কি উপায় তবে ?"

* * *

তখন কহিলা সূর্য্য—"বিপদ যদ্যপি
ঘটে কোন দেবে মর্ত্ত্যে, তখনি স্মরণ
করিবে সে অন্য দেবে মানসে ডাকিয়া,
দূত মাত্র একজন প্রেরণ উচিত।"

প্রভৃতিকে কাব্যের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকেরই হয়ত আপত্তি হইতে পারে। মধুসূদনের ন্যায় যথাতথা উপমাদি অলঙ্কারের সমাবেশ করিতে গিয়া হেমচন্দ্রও অনেক স্থানে তাল সামলাইতে পারেন নাই। ইন্দ্র দধীচি মুনির আশ্রমে গিয়া—

ভগ্নচিত্ত আখণ্ডল নেহারি নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ,—ভগ্নচিত্ত যথা
দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে,
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার,

মহিষমর্দ্দিনী—দশভুজা-মূর্ত্তি আগে,
অসহায় ছাগ-মেষ পূজায় অর্পিতে !

এ আলঙ্কারিক বর্ণনা একান্তই ক্ষমার অযোগ্য।

'বৃত্র-সংহারে'র আর একটি দোষ হইয়াছে ইহার ছন্দোবৈচিত্র্য। কবি মনে করিয়াছিলেন,—একটানা অমিত্রাক্ষর ছন্দে সমস্ত কাব্যখানি লিখিত হইলে, তাহাতে রসবৈচিত্র্য নষ্ট হইয়া কাব্যের সুর একঘেয়ে হইয়া পড়িবে। কিন্তু 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' একমাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে কোথাও রসবৈচিত্র্য ব্যাহত হইয়াছে বা কাব্যের সুর কোথাও একঘেয়ে এবং নীরস হইয়া উঠিয়াছে একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। বরঞ্চ ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহারে' এবং নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' 'প্রভাস' প্রভৃতি কাব্যে ওজোগুণের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। নবীন সেন এবং হেমচন্দ্রের ছন্দোব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের ধারণা ছিল, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বীররস বর্ণনার জন্যই বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য; মধুর রস, করুণ রস প্রভৃতির স্থলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত কমনীয় এবং তরল ছন্দের ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। সকল রসই যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ণিত হইয়া একটা সজীবতা এবং নবীনতা লাভ করিতে পারে এ দুই কবির এ বিশ্বাসের অভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। 'বৃত্র-সংহারে'র প্রথম সর্গে নিপীড়িত স্বর্গচ্যুত দেবতাগণের ক্ষোভ এবং স্বর্গোদ্ধারের বীরত্ব-

ব্যঞ্জক সঙ্কল্প অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়াই দ্বিতীয় সর্গে কবি দানব-নন্দিনী ঐন্দ্রিলার নন্দন-কাননে বিলাস বর্ণনা করিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত চটুল ছন্দ ব্যবহার করিলেন ; কিন্তু মধুসূদন দানব-নন্দিনী প্রমীলা এবং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের প্রেম কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দেই বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহাতে প্রেমের কমনীয় মাধুর্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয় সর্গেই আবার কবি অমিত্রাক্ষরে মিত্রাক্ষর যোগ করিয়া এবং ছেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাকে পয়ারের সহোদরই করিয়া তুলিয়াছেন। একাদশ সর্গে বীররস বর্ণনায় একটানা পয়ার ব্যবহার কুৎসিত হইয়াছে।

এই ছন্দোবৈচিত্র্য ব্যবহারের পশ্চাতে রহিয়াছে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব। বাঙলা-সাহিত্যে এক মধুসূদন ব্যতীত অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি ও মাধুর্যকে আর কেহই সম্যক বুঝিতে বা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র পয়ার-লাচাড়ীর সংস্কারকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথও সামান্য কিছু রচনা ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই অমিত্রাক্ষর ছন্দেও মিলটি বজায় রাখিয়াছেন।

কিন্তু কাব্য-শৈলতে একটা বিষয়ে হেমচন্দ্র গুরু মধু-সূদনকে ছাড়াইয়া যাইতে না পারিলেও তাঁহার সমকক্ষ হইয়া

উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়,—উহা বীররস ও রৌদ্ররসের বর্ণনা। বীররস এবং রৌদ্ররসের বর্ণনায় হেমচন্দ্রের স্বাভাবিকই একটা চিত্তের স্ফূর্তি ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং এই কারণেই বীররস এবং রৌদ্ররসের বর্ণনায় অনেক স্থানেই কবি তাঁহার স্বাভাবিক আড়ষ্টতা ঝারিয়া ফেলিয়া একটা স্বচ্ছন্দ বেগ আনিতে পারিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র প্রধানতঃ বীররস ও রৌদ্ররসের কবি,—অন্য কোন রসই তাঁহার হাতে ভাল ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। যেখানেই বীরত্ব, গাম্ভীর্য, অলৌকিক মহিমা—সেইখানেই কবি যেন তাঁহার প্রতিভার যথার্থ ক্ষেত্র লাভ করিয়াছেন। মধুসূদনও বীররসের কবি বলিয়া খ্যাত; কিন্তু মধুসূদনের সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে; অন্ততঃ 'মেঘনাদ-বধ' বীররস প্রধান কি সত্য সত্য করুণরস প্রধান কাব্য ইহা ভাবিবার কথা। নবীন সেন যেটুকু পারিয়াছেন, বীররস, মধুররস, করুণরস সমানে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ প্রধানতঃ বীর—এবং রৌদ্ররসে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা জিনিস লক্ষণীয়। হেমচন্দ্রকে কেহ কেহ 'অন্তরীক্ষের কবি' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হেমচন্দ্র সম্পর্কে এই আখ্যাটিও সুপ্রযুক্ত বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর বর্ণনায় কবি কোথাও তেমন জমাট বাঁধাইয়া তুলিতে পারেন নাই; স্বর্গের বর্ণনাও দুর্বল; কিন্তু হেমচন্দ্রের ভিতরে একটি অন্তরীক্ষবিহারী—মহাশূন্য-বিহারী কল্পনা

ছিল—স্বাধীন পক্ষ মেলিয়া মহাশূন্যের ভিতরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবুদ্বুদের উত্থান, নিরন্তর গতিবেগ এবং বিনাশ দেখিয়া লইতেই ছিল সে কল্পনার আত্মপ্রসাদ। মহাশূন্যে ক্রমবিবর্তমান এবং ক্রমপ্রকাশমান বিশ্ব-সৃষ্টির আদিরূপটি তাহার অব্যক্ত বিরাট বিস্ময় লইয়া কবি-মনটিকে যেন নিরন্তর বিক্ষুব্ধ এবং বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের এই ছোট মাটির পৃথিবীটির বাহিরে অনন্ত শূন্যে চলিতেছে যে কোটি কোটি ঘূর্ণ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনির্দেশ যাত্রা তাহার নির্ঘোষ যেন কবির রক্তে নিরন্তর দোলা দিত। তাই 'বৃত্রসংহার' এবং 'দশমহাবিদ্যা'য় কবি যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন এই স্বর্গ এবং মর্ত্য হইতে ছুটি লইয়া মহাশূন্যে মহাকালের নৃত্য দেখিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয়ে বাঙলা-সাহিত্যে হেমচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বিরল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বিবিধ বিষয়ে খণ্ড কবিতাও হেমচন্দ্রের কম নহে,—তাহার সাহিত্যিক মূল্যও একেবারে নগণ্য নয়। হেমচন্দ্রের কতগুলি কবিতা অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবিগণের কবিতা অবলম্বনে রচিত। এই জাতীয় কবিতায় হেমচন্দ্র তেমন কোন বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই কবিতাগুলির ভিতরে দুইটি নূতন সুর আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে সর্বাপেক্ষা অধিক,—ইহার প্রথমটি তাঁহার নিসর্গপ্রীতি। প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্যে

প্রকৃতির বর্ণনা আছে, কিন্তু মানুষের মনের সহিত তাহার নিবিড় অন্তরঙ্গতা নাই। বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরে আমরা মানুষের মনের সহিত প্রকৃতির নিকটতম রস-সংযোগের আভাস পাই বটে, কিন্তু তাহাও খুব অস্পষ্ট। মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদ কাব্যগুলিতে এ জিনিসটি একরূপ পাওয়াই যায় না। তাই হেমচন্দ্র যেদিন গাহিলেন,—

হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী ?

তখন বাঙলা-সাহিত্যে একটি নূতন সুরের সন্ধান পাইলাম। এ সুরটি যে হেমচন্দ্রে সর্বত্র ভাসা-ভাসাই রহিয়াছে তাহা নহে,—স্থানে স্থানে সুরটি বেশ গভীর হইয়া উঠিয়াছে।

সুধাংশু গগন-বুকে শীতাংশু ঢালিছে সুখে
জগৎ শীতল হয়ে সে আলোকে ভিজিছে ;
সুধীর সমীর বয় ছুলিছে পল্লবচয়
উদ্যানে রজনী গন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে,
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।
স্বভাবের ভাবে ভোর স্বপনে ছুটিছে জোর
পরাণ হৃদয় মম কত স্রোতে ডুবিছে ;
অসাড় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, বিশ্বপ্রাণে যুক্ত প্রাণ
মধুর মুরলী গানে যেন শুধু শুনিছে,—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।



কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, নিসর্গ-কবিতায় কবি হেমচন্দ্র অনেকখানি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-পন্থী। প্রকৃতিকে দর্শনের সময়ে কবির মনের ভিতরে সর্বদাই রহিয়াছে মনুষ্য-জীবনের কথা; তাই যখনই তিনি প্রকৃতির কোনও রূপ বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, বা কোনও তরুলতা, ফল-ফুল বা পশুপক্ষীর বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই আসিয়া পড়িয়াছে মানুষের জীবনের সহিত তাহার সাদৃশ্য বা পার্থক্য। তখন সেই সাদৃশ্য বা পার্থক্য অবলম্বন করিয়া কবি অনেক তত্ত্বকথা শুনাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তত্ত্বের প্রাচুর্যে অনেক সময় তাঁহার নিসর্গ-প্রীতি একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে,—এইখানেই সাহিত্যের দিক হইতে আমাদের অভিযোগ। অবশ্য সর্বত্রই যে এমন ঘটিয়াছে সে কথা বলা যায় না। 'পদ্মের মৃণাল', 'পদ্ম ফুল', 'হের ঐ তরুটির কি দশা এখন', প্রভৃতি কবিতা-গুলি হেমচন্দ্রের এই ধরণের কবিতার স্পষ্ট নিদর্শন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খণ্ডকবিতা জাতীয়তাবোধক। পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম হইতেই আমাদের আত্ম-চেতনার পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতরে জাগিয়া উঠিয়াছিল একটা জাতীয়তাবোধ—স্বাধীনতার জন্য একটা ব্যাকুল বাসনা। 'প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্'-এর ভারত আগমন উপলক্ষ্যে 'ভারত-শিক্ষা' নামক কবিতাটির ভিতরে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব,

সকল উৎসব আয়োজনের পশ্চাতে কবির মন ভিখারিণী ভারতমাতার জন্য কি গভীর ভাবে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! চারণ কবির ন্যায় হেমচন্দ্র যেদিন সুপ্ত বাঙালী জাতিকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন,—

আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি
দেখ দেখ চেয়ে অবনী মণ্ডলী,
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতূহলী,
বিবিধ-মানব-জাতিরে লয়ে।

সেদিন সুপ্ত বাঙ্গালী জাতি সহসা ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল;—আজও হেমচন্দ্রের সেই শিঙ্গাধ্বনি জীমূতমন্ত্রে আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত করে শোণিতের দুর্নিবার প্রবাহ,—

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

কাব্যে নবীনচন্দ্র

একটা পার্বত্য পাগলাঝোরার ধারার ন্যায় অনিয়ন্ত্রিত কল্পনা এবং হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য লইয়া বাঙলা-সাহিত্যে আবির্ভাব হইয়াছিল কবি নবীনচন্দ্রের। মধুসূদন বা হেম-চন্দ্রের ন্যায় তিনি কোনও কবির মন্ত্রশিষ্য ছিলেন না। কবি বায়রণের মহৎ দোষ এবং গুণগুলি নবীনচন্দ্রেও অনেকখানি বর্তাইয়াছিল বটে; এবং মধুসূদন বাঙলার মিল্টন, হেমচন্দ্র পিণ্ডার এবং নবীনচন্দ্র বায়রণ এরূপ একটা কথা বাঙলাদেশে বহু প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু কবির সমগ্র কাব্য-সাধনার ভিতরে বায়রণ তাঁহার আদর্শ কবি ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোন কবির সহিতই নবীনচন্দ্রের ঠিক ঠিক মিল হয় না; তাঁহার উন্মাদ প্রতিভা লইয়া তিনি কাব্যক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র মূর্তি। যদি তাঁহাকে যথার্থ কাহারও মন্ত্রশিষ্য বলা যায় তবে তিনি সমুদ্র-মেখলা পর্বতবাসিনী চট্টলেশ্বরী।

নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভাকে একটু গভীর করিয়া বুঝিতে গেলে দেখিতে পাইব, তাঁহার প্রতিভার দিব্যশিশু তাহার শৈশব কাটাইয়াছে স্নেহময়ী চট্টলেশ্বরীর মাতৃক্রোড়ে, তাহার কৈশোর এবং যৌবন কাটিয়াছে চট্টলেশ্বরীর গৃহ-আঙিনায়।

কবি চোখ মেলিয়া একদিকে দেখিয়াছেন শুধু উচ্চশির পাহাড়-পর্বতের লীলা—অন্যদিকে দেখিয়াছেন সীমাহীন সাগর—অন্তরাবেগে সে শুধু উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে,—বিরাম-হীন প্রবাহে শুধু ফুঁসিয়া গর্জিয়া উঠিতেছে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া খেয়াল-খুশী মত শুধু এদিকে ওদিকে ভাঙিয়া পড়িয়া দুইকূল প্লাবিত করিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে! দুর্বার সেই গতি, কেহ তাহাকে রোধও করিতে পারে না, নিয়ন্ত্রিতও করিতে পারে না। এই পর্বতের মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব এবং সমুদ্রের বিশালতা এবং দুর্বারতা দিয়াই গঠিত হইয়াছে নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা।

আমরা নবীনচন্দ্রের কাব্য সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, পর্বত এবং সমুদ্র তাঁহার কাব্যের এক চতুর্থাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে স্থানে অস্থানে কবি পর্বত এবং সমুদ্রের দীর্ঘ বর্ণনা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। শুধু যে লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই তাহা বলিলেই সমস্ত সত্যটিবলা হইল না,—এই সকলের বর্ণনায় তাঁহার প্রতিভার একটা বিশেষ স্ফূর্তি ছিল,—কারণ, এই সকল দিয়াই তাঁহার অন্তরধাতু গড়া ছিল। পর্বত এবং সমুদ্র কবির কাব্যে শুধু তাহাদের জড় রূপেই স্থান লাভ করে নাই—কবির কাব্যে তাহাদের ব্যাপকতর স্থান একটা সূক্ষ্ম মনোময় রূপে, কবিমনের দুইটি প্রধান প্রবণতা রূপে। পর্বতের প্রভাব রহিয়াছে তাঁহার কাব্যের উপাখ্যান

ভাগের নির্বাচনে—প্রধান প্রধান চরিত্র নির্বাচনে; ইহাদের ভিতরে সাধারণতঃ রহিয়াছে পর্বতসুলভ বিরাটতা এবং বলিষ্ঠ উচ্চতা। সমুদ্রের প্রভাব তাঁহার রচনারীতিতে—কল্পনার প্রসারতায়—বর্ণনার বিস্তারে—তাহার দুর্বার বেগে—অসংযত চাঞ্চল্যে—পদে পদে স্খলন-পতন-ত্রুটিতে।

মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমার জয়গান করিতেই নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাসে'র ভিতরে তিনি গাহিয়াছেন আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের জয়গান,—'অমিতাভে' কবি "যাঁহার অমিত আভায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর কাল বক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এখনও ইউরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত যাঁহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সেই বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের"ই জীবন-মহিমা গান করিয়াছেন,—'অমৃতাভে' প্রেমের মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবের এবং 'খৃষ্টে' মর্ত্যে স্বর্গের প্রতিষ্ঠাকারী যিশু খ্রীষ্টের জীবনের জয়গান করিয়াছেন,—আর পলাশীর যুদ্ধের ভিতর দিয়া ভাষা পাইয়াছে স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষের উন্মাদ দেশপ্রেম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য মানুষের সাহিত্য,—নবীন সেন মানুষের কবি।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তুর ভিতরে মোটের উপরে সর্বদাই একটা আভিজাত্য আছে বটে, কিন্তু সে আভিজাত্য মানুষের জীবন-মাহাত্ম্যকে কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হাতে বৈকুণ্ঠের দেবতা নহেন,—তিনি

মানবতারই পূর্ণ আদর্শ। দয়া, প্রেম, শৌর্য-বীর্য, জ্ঞান-ভক্তি, কর্ম—মানুষের সকল সবলতা-দুর্বলতা, রুদ্রত্ব ও কমনীয়তা—সকলই একটি সুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের ভিতরে,—এই জন্যই তিনি আদর্শ মানুষ, তিনি সকলের নমস্য—তিনি সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি। এই মানবতার মাহাত্ম্যেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বিরাট হইয়া উঠিয়াছে। কবি মনে করেন, এই মনুষ্যত্বের পূর্ণতায়ই মানুষ তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, এবং সেই আত্মোপলব্ধির ভিতরে মানুষ বুঝিতে পারে,—তাহার অসীম আশা আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত শক্তি ও প্রসারের ভিতর দিয়া সেও অসীম অনন্ত—সেও বিরাট, তাই সে ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের পূর্ণাবতার নহেন,—তিনি মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শ,—তাঁহার আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়াই তিনি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেন, তিনিও ব্রহ্ম—ইহাই কবির 'সোঽহম্'-বাদ।

'অমিতাভে'র ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই, কবি ভগবান বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই,—আমাদের এই মর্ত্যের দুঃখ-বেদনা নিরাশার ভিতরে শুভ্র-শান্ত সান্ত্বনার সমুজ্জ্বল মূর্তি করিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন, পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ "সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্পাধিক অতি মানুষিক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন

করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে, তাহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়।”

এই যে মনুষ্য-প্রীতি এবং মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ইহা সর্বত্রই নবীনচন্দ্রের কাব্যকে একটা গৌরব দান করিয়াছে। স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া হাজার হাজার বৎসরের সাহিত্য-পুরাণ-ইতিহাসে যে কিংবদন্তি, অলৌকিকতা—যে অতিরঞ্জনের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া একটি পূর্ণাদর্শের মানবচরিত্র খুঁজিয়া বাহির করার কৃতিত্ব নবীনচন্দ্রেরই সর্বাপেক্ষা অধিক। অবশ্য ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নাকি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এই আদর্শ প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় “শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম” নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে এই আলোকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু নবীনচন্দ্রের ন্যায় এমন স্পষ্ট এবং গভীর করিয়া এ জিনিসটি ইতিপূর্বে আর কেহ অনুভবও করেন নাই, প্রকাশ করিতেও পারেন নাই। এই কৃষ্ণচরিত্রের নবীন কল্পনা লইয়া নবীনচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে যে পত্রালাপ হইয়াছিল, তাহা হইতে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ‘কৃষ্ণচরিত্রে’র আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য নবীনচন্দ্রের নিকটে হয়ত কিছু ঋণী।

রও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রীকৃষ্ণ-

চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের সাহায্যে; কিন্তু নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ-মূর্তি পাণ্ডিত্য-লব্ধ নহে,—উহা তাঁহার অন্তরের গভীর প্রেরণায় প্রকাশিত। আদর্শের অনুরোধে তিনি পুরাণের শ্রীকৃষ্ণকে ভাঙিয়া-চূরিয়া আপনার মত করিয়া লইয়াছেন,—যেখানে প্রয়োজন কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তবে তাঁহার মূল আদর্শের প্রতি যে পুরাণাদির সমর্থন মোটেই নাই এ কথা বলা চলে না। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, কিশোর শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসবধের জন্য মল্লভূমিতে আগমন করিলেন তখন কবি তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

> মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
> গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
> মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
> বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥
>
> (১০।৪৩।১৭)

অগ্রজ বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন রঙ্গভূমিতে আগমন করিলেন তখন তিনি মল্লদের নিকটে বজ্র, মানুষের ভিতরে শ্রেষ্ঠ মানুষ, স্ত্রীলোকের নিকট মূর্তিমান মদন, গোপগণের স্বজন, অসৎ রাজাদের শাসক, নিজের পিতার নিকটে শিশু, ভোজপতির নিকটে সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞানীদের নিকটে তিনি বিরাট, যোগীদের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদের পরমদেবতারূপে প্রকাশ পাইলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-

চরিত্রের ভিতরে নবীনচন্দ্র মনুষ্যত্বের যে একটি পূর্ণ পরিণতির সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার বীজ ভাগবতের ভিতরেই লুক্কায়িত আছে। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, নবীনচন্দ্র এ আদর্শ শাস্ত্রজ্ঞানের ভিতর দিয়া লাভ করেন নাই, এ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার কবিচিত্তের অনুপ্রেরণায়,—এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

শুধু শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনার মৌলিকতা এবং মহত্ত্বের জন্যই নহে, কাব্যের বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনাতেও নবীনচন্দ্র যথেষ্ট মৌলিকতা এবং অনন্যসাধারণতার পরিচয় দিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনকে মোটামুটি বিচার করিতে হইলে আমরা তাঁহার সমসূত্রে গ্রথিত 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস'কেই গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের আদি, মধ্য ও অন্তলীলাকে অবলম্বন করিয়া কবি যে এক ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই রূপ গ্রহণ করিয়াছে 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে'র ভিতরে। এই তিনখানি গ্রন্থের ভিতরে প্রকাশ করিবার জন্য কবি যে আখ্যানবস্তুটির পরিকল্পনা করিয়াছেন, অন্ততঃ বাঙলা-সাহিত্যে উহাই একমাত্র মহাকাব্যের উপদান হইয়া উঠিয়াছে। 'মহাকাব্য' নামটির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, এজাতীয় কাব্য ক্ষণিকের নহে, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটি-নাটি কথা লইয়া নহে,—ইহা ব্যক্তি বিশেষের কথা নহে,—বিরাট তাহার কালের পরিধি,—বিপুল তাহার

পরিসর ; সে একটা সমগ্র যুগের, একটা সমগ্র জাতির জীবন-ইতিহাস! এতখানি পরিসর—এতখানি গভীরতা—এতখানি গাম্ভীর্য লইয়া তবে সে মহান হইয়া ওঠে, তাই সে মহাকাব্য,—তাই সে নগাধিরাজ হিমালয়ের মত শ্যামল কোমল সমতল ভূমির পাশে আপন অনির্বচনীয় মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে। নবীনচন্দ্রের এই মহাকাব্যের পরিকল্পনাতেও আমরা এই জাতীয় একটা বিরাটত্ব এবং মহত্ত্বের আভাস পাই। কবি অস্পষ্ট অতীতের ইতিহাসের সহিত আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের এমন একটি যোগসূত্র নিপুণ কল্পনা দ্বারা স্থাপন করিয়া দিয়াছেন যে, আজ সেই আলোকে চাহিয়া দেখিলে অনুভব করিতে পারি,—আমাদের আজিকার এই বিংশশতাব্দীর জীবনের—ইহার সমস্ত ধর্ম, রাষ্ট্র এবং সমাজগত সমস্যার সহিত সেই সুদূর অতীতের অস্পষ্ট ছায়াটির সহিত যেন একটি নিবিড় ক্রমবিবর্তনের যোগ রহিয়াছে। আজ আমরা জাতীয় অবনতির মূলে রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে,—জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে এক অনৈক্যের মহীরুহ আবিষ্কার করিয়াছি—তাহার মূল শুধু বর্তমানের জলাভূমিতে নহে,—তাহার শিকড় পৌঁছিয়াছে অনৈতিহাসিক যুগের গভীর ভূমিভাগে। নবীনচন্দ্রের মহাভারতের পরিকল্পনার ভিতরেই আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই সেই অনৈক্যের প্রাচীন ইতিহাস।

মহাভারতের যুগ হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গড়িয়া

উঠিবার যুগ। আমরা যাহাকে আজ হিন্দু জাতি বলি তাহা বিশুদ্ধ কোনও একটি জাতি নহে,—হিন্দু সভ্যতাও কোনও বিশেষ একটি জাতির একটি সুস্পষ্ট সভ্যতা নহে,—হিন্দু ধর্মও একটি যৌগিক ধর্ম। একটি মহাদেশ সদৃশ ভারতবর্ষের বিপুল ভৌগোলিক আয়তনের ভিতরে ঘটিয়াছে বহুজাতি, বহু সভ্যতা এবং ধর্মবিশ্বাসের সংঘাত সমন্বয় এবং সম্মিলন; সহস্র সহস্র বর্ষের সেই সংঘাত, সমন্বয় এবং সম্মিলনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে হিন্দু জাতি, হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দুধর্মের মিশ্র রূপ। এই মিশ্রণ এবং মিলনের প্রক্রিয়া প্রবল ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল মহাভারতের যুগে, নবীন সেন তাঁহার কাব্যে দিতে চাহিয়াছিলেন তাহারই একটি চিত্র।

জাতির দিক হইতে দেখিতে গেলে সে যুগে দেখিতে পাই, বিজয়ী আর্য এবং বিজিত অনার্যগণ উভয়ে উভয়ের প্রতি ঘোর বিদ্বেষী ছিল; এত বড় দুইটি জাতির ভিতরে একটা জাতিগত দ্বেষ ভারতের উন্নতির মূলে প্রধান অন্তরায় ছিল। এক আর্যজাতির ভিতরেও আবার চতুর্বর্ণের বিরোধ কম নহে; ব্রাহ্মণের দম্ভজনিত ক্রোধ এবং অভিশাপের দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলি সর্বদাই নিপীড়িত। গুণগত ভেদ একটা জন্মগতভেদের রূপ গ্রহণ করিয়া সমাজদেহে গভীর ক্ষতের কারণ হইয়া উঠিল।

রাষ্ট্রের দিক হইতে দেখি, আর্যগণের এদেশে

আগমনের পূর্বে অনার্যগণের একটা নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ঐহিক সভ্যতা ছিল। আর্যগণ দস্যু বিজেতার ন্যায় এদেশে আগমন করিয়া অনার্যগণের রাজ্য অপহরণ করিল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাড়িয়া লইল,—তাহাদের ধনরত্ন ভূমিসম্পদ কাড়িয়া লইয়া তাহাদের রাষ্ট্র এবং সভ্যতা ধ্বংস করিয়া দিল। অর্জুনের প্রতি শরাহত নাগরাজ চন্দ্রচূড়ের ভৎর্সনার ভিতর দিয়া এই কথাটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নাগরাজ! তস্কর সে আজি!
তাহার সাম্রাজ্যধন করিয়া হরণ
ইন্দ্রপ্রস্থে ইন্দ্রসুখে বিহরে যাহারা
সাধু তারা—নাগরাজ তস্কর সে আজি!
অষ্টমবর্ষীয়া শিশু বালিকা তাহার
কাঁদে দুগ্ধ লাগি; কাঁদে জননী তাঁহার
অনাহারে—নাগরাজ তস্কর সে আজি!
একটি বিশালরাজ্য হরিল যাহারা
পশুবলে, নররক্তে ভাসায়ে ধরণী,
করিল খাণ্ডবপ্রস্থ এই বনস্থলী,
হিংস্র নর জন্তু বাস, অগ্নিতে, অসিতে,—
সাধু তারা! মহাসাধু তাদের সন্তান!
আর সে প্রাচীন জাতি মরিয়া পুড়িয়া,
সাধু আর্য্যজাতি-ভয়ে লইল আশ্রয়
বনে বন্য শ্বাপদের, তাদের সন্তান

জ্বলিয়া জঠরানলে করিল গ্রহণ
মুষ্ট্যন্ন সে আর্য্যদের,—তস্কর তাহারা!
একটি প্রাচীন জাতি করিল যাহারা
জঘন্য দাসত্বজীবী, ভিক্ষা ব্যবসায়ী;
নিষ্পেষিয়া মনুষ্যত্ব দলিয়া চরণে
পশুত্বতে পরিণত করিল যাহারা,—
সাধু তারা!

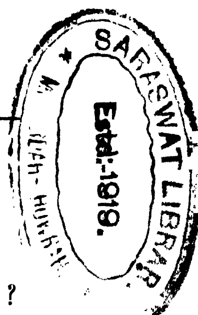
ইহাই আর্য ও অনার্যগণের ভিতরকার সম্পর্ক। অন্যদিকে আবার আর্যগণের রাষ্ট্রীয় শক্তিও এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসংহত ছিল না। সমগ্র দেশটি খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য সামন্ত নৃপতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে শাসিত হইতেছিল। ইহারা যে শুধু পরস্পরে বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা নহে, পরস্পরপ্রতিস্পর্ধী ছিল; ফলে আত্ম কলহের ক্লিন্নতা এবং গৃহবিবাদের তপ্তশ্বাসে সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত।

ধর্মের দিক হইতেও দেখিতে পাই,—প্রথমতঃ আর্য বৈদিক ধর্ম এবং অনার্যগণের আদিম নাগপূজা, বৃক্ষপূজা এবং অন্যান্য আদিম দেবতা এবং অপদেবতায় বিশ্বাসের ভিতরে রহিয়াছে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে আর্য-গণের বৈদিক ধর্মও প্রতিষ্ঠিত ছিল একটা ভেদের উপরে। একদিকে জড় প্রকৃতির উপাসনা এবং তাহা লইয়াই বহুদেবতায় বিশ্বাস—সেই বহুদেবতা লইয়াই গড়িয়া

উঠিয়াছিল বহু সম্প্রদায়;—পরস্পরপ্রতিস্পর্ধী সামন্তরাজগণের বিবাদ-বিসংবাদ হইতে ইহাদের ধর্ম বিবাদও কোন অংশে কম ছিল না। ইহা ব্যতীত বৈদিক যজ্ঞের নামে চলিতেছিল একটা নিষ্ঠুর রক্তাক্ত অনাচার।

জাতিতে, রাষ্ট্রে এবং ধর্মে এই বিভেদ এবং তজ্জনিত বিবাদ বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে; তিনি মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিলেন, যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে জাতিগত, রাষ্ট্রগত এবং ধর্মগত সকল ভেদ এবং বৈষম্যকে দূর করিয়া একটা দৃঢ় ঐক্যের ভিতরে একজাতি, একরাষ্ট্র এবং একধর্মে সমগ্র দেশকে বাঁধিয়া তোলা না যাইবে ততদিন ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। বাল্য-স্মৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া 'রৈবতকে' শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"একাকী নির্জ্জনে এক তরুর ছায়ায়,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি,—জীবনের ভাবনা প্রথম,—
একই মানব সব; একই শরীর,
একই শোণিত মাংস ইন্দ্রিয় সকল;
জন্ম মৃত্যু একরূপ; তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ?
চারি বর্ণ; চারি বেদ; দেবতা তেত্রিশ;
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর;"।



সেই বাল্যেই শ্রীকৃষ্ণ ঐক্যে বিধৃত এক মহাভারতের চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

শুনিলাম—'এক জাতি মানব সকল ;
এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম ;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয় ;
একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম্ম-সাধন ;
যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ।'

'এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন'—এই ছিল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানলব্ধ মহাভারতের মূর্তি।

'রৈবতকে'র সপ্তদশ সর্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন,—

গৃহভেদ, জাতিভেদ, রাজ্যভেদ, ধর্ম্মভেদ,
নীচ মানবের নীচ দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
জ্বালিছে যে মহাবহ্নি, করিবে নিশ্চয়
ভস্ম এই আর্য্যজাতি। চাহি আমি বক্ষ পাতি
নিবাইতে সে বিপ্লব। বাসনা আমার
চির শান্তি ; নহে সখে! সমর দুর্ব্বার।

... ...

শিখাব একত্ব মর্ম,— এক জাতি এক ধর্ম ;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—
সমগ্র মানব প্রজা রাজা নারায়ণ!

এই যে সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্ম সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র

একত্রিত করিয়া এক ধর্ম এক রাজ্য একমাত্র জাতীয়তা-বোধের ভিতর এক অখণ্ড 'মহাভারতে'র পরিকল্পনা ইহা আদর্শের দিক হইতে—মানবতার দিক হইতে সত্য সত্যই বিরাট এবং অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। সাম্যবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই যে একজাতি একরাষ্ট্র এবং এক ধর্মের বন্ধনে মহামানবের মিলনের আদর্শ, নবীন সেনের মতে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরেই আবদ্ধ রাখিতে চান নাই; ভারতবর্ষকে অবলম্বন করিয়া এই মহামানবের মিলনাদর্শ সমগ্র জগতে একদিন প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন। এই জন্য 'প্রভাসে'র শেষদিকে দেখিতে পাই, পঞ্চ-পাণ্ডবের যে রাজ্য ছাড়িয়া মহাপ্রস্থানে যাত্রা, তাহা নবীন সেনের মতে মহাভারত প্রতিষ্ঠার পরে দেশবিদেশে এই আদর্শ প্রচারের জন্য যাত্রা; বলরাম যে সমুদ্রে গিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নাগরূপে যে তাঁহার প্রাণ ব্রহ্ম-রন্ধ্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল তাহার ব্যাখ্যায় কবি বলিয়াছেন যে, আর্যবীর বলরাম অনার্য নাগজাতির সহিত একত্রিত হইয়া সমুদ্র পাড়ি দিয়া দূর দূর দেশে নব আদর্শ 'কর্ষণ' ও বপন করিতে গিয়াছেন।

মহাভারতের এই নব আদর্শ লইয়া নবীন সেন প্রাচীন মহাভারতের উপাখ্যানভাগকে এবং চরিত্রগুলিকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা দেখিতে পাইব,

কবি উনবিংশ শতাব্দীর লোক, তাই তাঁহার রচিত মহা-ভারতও মুখ্যতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত; অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আমাদের জাতীয় জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং ধর্মজীবনের জটিল সমস্যাগুলি এবং তাহার কল্পিত সমাধানগুলিকে আরোপ করিয়াই মূল মহাভারতের উপাখ্যান এবং চরিত্রগুলিকে ভাঙিয়া চূরিয়া সাজান হইয়াছে। নবীন সেনের অবলম্বিত উপাখ্যান-ভাগটি যথার্থ মহাকাব্যের উপযুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং আমার মনে হয় বাঙলায় যে কয়খানি মহাকাব্য রচিত হইয়াছে তাহার ভিতরে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে'র একসূত্রে গ্রথিত উপাখ্যানটিই সর্বাপেক্ষা বেশী মহাকাব্যের উপযোগী ছিল। বিষয়-বস্তু নির্বাচনের দিক হইতে মধুসূদন এবং হেমচন্দ্র হইতে নবীন সেনের বাহাদুরী স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রাচীন মহাভারতকে ভাঙিয়া চূরিয়া নবরূপে ঢালিয়া সাজিবার কাজে নবীনচন্দ্র তাঁহার কল্পনার মত্তগজকে একেবারে নিরঙ্কুশভাবে বিচরণ করিতে দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য কাব্যবিচারের আদর্শে নবীন সেনের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস'কে আমরা যদি 'এপিক্' কাব্য বলিয়া গ্রহণ করি তবেও ইহা খাঁটি এপিক্ (Authentic Epic) বলিয়া গৃহীত হইবে না; কারণ এ-কাব্য তৎকালীন্ জলবায়ুর সাহচর্যে এই দেশের মাটিতে প্রকৃতিরই দানরূপে অঙ্কুরিত

এবং পল্লবিত হইয়া ওঠে নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহাকে অনেকাংশেই কল্পনার দ্বারা একটা 'সাহিত্যিক ধরাণ' রূপে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল, সুতরাং ইহাকে এপিক্ বলিতে গেলেও মূলতঃ ইহা 'সাহিত্যিক এপিক্' (Literary Epic)। এই জাতীয় কাব্যে কালধর্মে প্রভাবান্বিত কবিমনকে কিছু কিছু স্বাধীনতা দিতে হইবেই। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার একটা মাত্রা আছে. সেই মাত্রা অতিক্রম করিলেই পাঠকের বাসনাভঙ্গজনিত বেদনা রসপ্রতীতিতে বাধা দিবে। কাব্যের ক্ষেত্রে অবশ্য—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা, তা, সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে, পুরাণ, ইতিহাস বা সাহিত্যে বর্ণিত প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যানগুলিকে ঘিরিয়া আমাদের চিত্তে একটা 'বাসনা' সৃষ্ট হইয়া থাকে,—সেই দৃঢ়বদ্ধ বাসনার উপরে যথেচ্ছ আঘাত করিয়া কবি কিছুতেই কাব্যের রস জমাইয়া তুলিতে পারেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনায় কবি নবীনচন্দ্র এ-কাজ অনেক স্থানে করিয়াছেন, এবং তাহা রসাস্বাদের অন্তরায় হইয়া কাব্যের অগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতবর্ষের ধর্ম এবং সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে অবশ্য এ-কথার কিছু কিছু সমর্থন লাভ করা যায় যে, সমাজ.

রাষ্ট্র এবং ধর্মের ক্ষেত্রে আর্য ক্ষত্রিয়গণ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ হইতে অনেকবেশী উদারচেতা এবং সাম্যবাদী ছিলেন; ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্মসংস্কারক রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব। * কিন্তু তাই বলিয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের যে কলুষিত বিরোধের চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহা কাব্যের অনুরোধেও গ্রাহ্য নহে। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল এবং সেই উদ্ধত বিদ্রোহের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণগণ অনার্যগণের সহিত হীনতম অসাধু উপায়ে মিলিত হইয়া মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, ইহা শুধু অনৈতিহাসিক বলিয়া অগ্রাহ্য নহে, বাসনাবিরোধী বলিয়াই অগ্রাহ্য। 'কুব্জপৃষ্ঠ ক্ষুদ্রকলেবর', ঘোর কৃষ্ণ দুর্বাসা মুনির উপরে অবিচার করিয়া কবি পাঠকের উপরেই অবিচার করিয়াছেন। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিতেছেন—

আর্য্যধর্ম্মনীতি
—প্রীতিময়, প্রেমময়, শান্তিসুধাময়,
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্ঞে পরিণত।
রাজ্যভেদ, গৃহভেদ, জাতিভেদ, প্রভু!
ভারতের যে দুর্দ্দশা ঘটাইছে হায়!

---

* এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' গ্রন্থে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

বলবান্ কোনো জাতি পশ্চিম হইতে
আসিলে ঝটিকাবেগে, নিবে উড়াইয়া
ভেদপূর্ণ আর্য্যজাতি তৃণরাশি মত,—
অহো! কিবা পরিণাম!—

তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক সমর্থন লাভ করিলেও দ্বাপরযুগে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে কলির শেষের (?) এই দুর্ঘটনা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী একান্ত হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে।

নবীন সেনের কাব্যের বিচার করিতে গিয়া একটা কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়, আদর্শের বৈশিষ্ট্যের জন্য, চিন্তার ব্যাপকতা এবং গভীরতার জন্য কেহ হয়ত শ্রদ্ধা পাইতে পারেন, কিন্তু কাহারও কাব্য বিচার করিতে এই আদর্শবাদ বা চিন্তাশীলতাই যথেষ্ট হইতে পারে না। কাব্যের বক্তব্য বিষয়ই যে কাব্য-বিচারের একমাত্র বা প্রধান লক্ষ্য তাহা বলা যায় না—কাব্যবিচারে এখানেই আমাদের হয় একটা মস্ত বড় ভুল। কবির কাজ শুধু চিন্তা নহে, তাঁহার প্রধান কাজ সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির নিপুণতায়, প্রকাশের সৌন্দর্য-মাধুর্যের উপরই তাঁহার কবি-প্রতিভার বিচার চলিবে প্রধান ভাবে।

এই শিল্প-সৃষ্টি এবং রসসৃষ্টির দিক হইতে আমরা কবি নবীনচন্দ্রকে যে একেবারে সফল বলিতে পারি তাহা নহে। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আমার

দেখিতে পাইব, এক্ষেত্রে তাঁহার অনেক কৃতিত্বও যেমন অসাধারণ,—অনেক দোষও তেমনই একান্ত মারাত্মক।

এই 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে'র কথাই ধরা যাক। আমরা দেখিয়াছি, কবি যে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা মহাকাব্যের উপাদান হিসাবে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এই বিরাট পরিকল্পনা সত্ত্বেও এই কাব্যত্রয় একত্রিত হইয়া একখানি সত্যকার মহাকাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার কারণ, এখানে বিষয়বস্তুর যে বিরাটত্ব সে সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়া সমগ্র কাব্যসৃষ্টিকে বিরাট করিয়া তোলে নাই—এ পরিকল্পনার বিরাটত্ব অনেক স্থলেই শুধু শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ বক্তৃতায়। বক্তৃতায় মানুষ জানে মাত্র,—কিন্তু আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব ব্যতীত উহা রস হইয়া ওঠে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত কাহারও কথার ভিতর দিয়া বিরাট হইয়া ওঠে নাই; ঘটনার বিপুল প্রবাহের ভিতর দিয়া—শত শত জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া যে বিরাটত্ব আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে আসিয়া পড়ে, তাহাকে আমরা শুধু সংবাদের মত জানি না—সমগ্র হৃদয় দিয়া তাহাকে অনুভব করি। বিপুল মহাভারতের সমস্ত জীবন-সংগ্রাম—আশা-নিরাশা—জয়-পরাজয়কে তুচ্ছ করিয়া বিজয়ী পঞ্চপাণ্ডব যেদিন দ্রৌপদী সহ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিলেন, সে বিরাট

বৈরাগ্যকে আমরা কোন কথার বাঁধুনির ভিতরে খুঁজিয়া পাই নাই,—তাহাকে পাইয়াছি নিরন্তর ঘটনাপ্রবাহে। নবীন-চন্দ্রের মহাকাব্যের পরিকল্পনাও যদি এইরূপ ঘটনার স্বাভাবিক গতিতেই রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারিত তবেই কাব্যসৃষ্টির দিক হইতে তাহা সার্থক হইয়া উঠিতে পারিত।

কাব্যরূপের ভিতরে নবীনচন্দ্র তাঁহার পরিকল্পনার মহিমা ও অনন্যসাধারণতাকে অনেক স্থলেই ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মহাকাব্যে বর্ণিত যে জীবন সে আমাদের ছোটখাট সুখ-দুঃখের আশা-নিরাশার কাহিনী লইয়া নহে, সে সর্বত্র অলৌকিকও নহে—সে অসাধারণ। এখানে মানুষ হাসিতে পারে কাঁদিতে পারে,—কিন্তু সে হাসি-কান্নার ভিতরেও একটা অনন্যসাধারণতার গাম্ভীর্য থাকা চাই। বিরাট হিমালয়ের বুকে আলো জ্বলিতে পারে,—কিন্তু সে তুলসীতলার প্রদীপ নহে,—সে গভীর নিশীথের দাবাগ্নি; ওই দাবাগ্নির সহিত হিমালয়ের অসাধারণতার একটা নিগূঢ় যোগ থাকে, কিন্তু মাটির প্রদীপ নিরালা তুলসীতলায় যতই কমনীয় এবং মধুর হোক, পাহাড়ের বুকে সে যে শুধু নিরর্থক তাহাই নহে,—সে হাস্যাস্পদ। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের ভিতরেও বক্তৃতা ছাড়িয়া কবি যেখানে কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে মন দিয়াছেন সেখানেই মানুষের জীবনের সূক্ষ্ম জটিলতা,—তাহার সকল তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা এমন লৌকিক এবং তরলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে,

উহা পদে পদে রসজ্ঞ পাঠকের মনে আঘাত করে। মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে' ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, সে প্রেম রসের দিক হইতে গভীরতায় কিছু কম হয় নাই,—কিন্তু তাহা একেবারে সাধারণ, একান্ত লৌকিক হইয়া ওঠে নাই,—কবি তাহার ভিতরে বেশ একটি আভিজাত্য রাখিয়াছেন; কিন্তু 'রৈবতকে'র কৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রেম, 'কুরুক্ষেত্রে' কিশোর-কিশোরী অভিমন্যু ও উত্তরার প্রণয়-চপলতা অনেক স্থানে এমন লৌকিক—এত তরল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাকে মহাকাব্যের ভিতরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। নবীনচন্দ্রের প্রায় সকল কাব্যের ভিতরেই কারণে অকারণে এত হাসি এত কান্না, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্যার এত প্রাধান্য যে সমগ্র জিনিসটি একত্রিত হইয়া কোন বিরাটত্বকে উপলব্ধি করিতে দেয় না।

মহাকাব্যের বিপুল বপুটি বড় কঠিন বন্ধনে বাঁধা। ইহা সঙ্গীতের ধ্রুপদ-রাগিণী, ইহার ভিতরে খেয়ালের তান নাই। কোথাও থামিয়া দাঁড়াইয়া সপ্তসুর লইয়া যাদুবিদ্যা দেখাইবার সময় নাই, এখানে প্রত্যেকটি ধ্বনি প্রত্যেকটি ধ্বনির সহিত এমন নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ যে একটু খেই হারাইয়া গেলেই সুরভঙ্গ। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কাব্যের সকল দৃশ্যগুলি এইরূপ একটা অখণ্ড সমগ্রতার ভিতরে নিবিড় ভাবে সম্বদ্ধ নহে; অনেক স্থলেই দৃশ্যগুলি ভাষা ও ছন্দের লালিত্যে—বর্ণনার নৈপুণ্যে অপূর্ব লিরিক হইয়া

উঠিয়াছে,—কোথাও চমৎকার উপন্যাস হইয়াছে, কোথাও নাটক হইয়াছে; কিন্তু বিভিন্ন তানগুলি যেন একটি রাগিণীর মূর্ছনায় আপনাদিগকে সংহত করিয়া কোন একটি ফলশ্রুতি দান করে না।

কোন কোন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলিয়াছেন যে, বড়কাব্য আসলে কতগুলি ভাল ভাল লিরিক কবিতারই সমষ্টি। কাব্যবিচারে সাধারণভাবে একথা গ্রাহ্য না হইলেও নবীন সেনের কাব্য সম্বন্ধে এ-কথা খুব ভালভাবেই খাটে। কাব্যের ঘটনাকে লইয়া একটু চলিতে না চলিতেই কবি এদিকে তাকাইয়াছেন, ওদিকে তাকাইয়াছেন,—এবং এই তাকানোর ফলে যেখানে যেটা তাঁহার ভাল লাগিয়া গিয়াছে তাহা লইয়াই তিনি যতক্ষণ মন চায় মাতিয়া রহিয়াছেন,—বর্ণনার পর বর্ণনা চলিয়াছে—বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলিয়াছে উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস চলিয়াছে,—কিন্তু ঘটনা যেন কিছুতেই চলে না,—তাহার জন্য কবির কোন তাগিদও নাই। সত্যভামা এবং সুলোচনা পরস্পর পরস্পরের গালে 'ঠোন্‌কা মারিয়া', খোঁপা আকর্ষণ করিয়া মোটা রসিকতার হুলুস্থুলু দিয়াই প্রায় একটি সর্গ জমাইয়া তুলিল, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বিরাট মহাভারত প্রতিষ্ঠার কথা ততক্ষণে কবি যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। মূল কাব্যের পক্ষে অসার্থক এবং অনর্থক কতগুলি জটিল প্রেমের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করিয়া কবি নিজেও বসিয়া তাহার ভিতরে পাক

খাইয়াছেন, কোথাও তাঁহার মহাভারত রচনার ব্যস্ততা নাই।

নবীনচন্দ্রের কাব্যবিচার করিতে গিয়া একটা কথা অবশ্য মনে রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্ত্য এপিকের লক্ষণ মিলাইয়া তাঁহার কাব্য বিচার করিলে কবির উপরে আমরা খানিকটা অবিচার করিব; কারণ মধুসূদন মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য এপিকের আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া যে-ধরণের এপিক লিখিতে গিয়াছিলেন এবং হেমচন্দ্রও মধুসূদনের মারফতে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া যে-জাতীয় এপিক লিখিতে গিয়াছিলেন, সেই জাতীয় এপিক রচনা করিবার বাসনা নবীনচন্দ্রের কোনদিনই ছিল না। নবীনচন্দ্রের ধাতটা অনেকখানি ভারতীয় তথাকথিত মহাকবিগণের ধাত। ভারতীয় আলঙ্কারিক মহাকাব্যে যেমন দেখিতে পাই, চলিল ত এক সর্গ ধরিয়া একটি পর্বত বর্ণনাই চলিল, কোথাও হয়ত একটি সর্গ জুড়িয়া একটি ঋতু বর্ণনাই চলিল,—কোথাও হয়ত পূরা একটি সর্গ ধরিয়া রমণীগণের জলকেলি বর্ণনাই চলিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যও সেই রকমের। নবীনচন্দ্র মহাভারতের অবলম্বনে তাঁহার কাব্যরচনার ইতিহাস বলিতে গিয়া 'রৈবতকে'র উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন,—"কতিপয় বৎসর অতীত হইল, মহাভারতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আদিতীর্থ "গিরিব্রজপুর" বা আধুনিক "রাজগৃহে" রাজকার্য্যে অবস্থানকালে স্থান-মাহাত্ম্যে উদ্বেলিত হৃদয়ে কাব্যজগতের হিমাদ্রিস্বরূপ বিপুল মহাভারত গ্রন্থ আর এক-

বার পাঠ করি।···মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল-উপত্যকার, সেই শেখরমালার, অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার সানুদেশে—সেই দৃশ্য ভাষাতীত—ভগবান্ বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর —পতিত মানবজাতির—উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম,—পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। সেখানে রৈবতক সূচিত, এবং মধ্যভারতের সেই পবিত্র শৈলমালার ছায়ায় তাহার প্রথমাংশ রচিত হইল।" এখানে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, মহাভারতের বিপুল মহিমায় চিত্তের উদ্বেলতা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমই 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে'র জন্ম-রহস্য। এই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—এই কৃষ্ণপ্রেমই সব কাব্যের ভিতর দিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই কাব্যের খণ্ড খণ্ড লিরিক বর্ণনা ব্যতীতও সমগ্র কাব্য জুড়িয়া একটা লিরিক সুর প্রবাহিত,—সমগ্র ঘটনাস্রোত—সমগ্র বর্ণনা জুড়িয়া কবি-হৃদয়ের একটা উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীত যেন থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। সেই সুর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে 'কুরুক্ষেত্রে'র শেষে,' যেখানে অভিমন্যুর মৃত্যু বর্ণনার উপসংহারে কবি বলিতেছেন—নিগুর্ণ নবীন তৃণে অঙ্কুরিয়া দু'টি ফুল,

একটি পড়িল ঝরি অকালে পুষ্প-মুকুল

তোমার পবিত্র অঙ্কে। নির্ম্মল কোরক আর
আছে তার প্রেম বৃন্তে। এই কলি সুকুমার
ফুটাইয়া প্রেম করে, হৃদয়েতে দলে দলে
লিখিও তোমার নাম পিতৃপ্রেম-অশ্রুজলে।
দিও জ্ঞান, ভক্তি, বল! দিও শিক্ষা আত্মদান
দিও পদাম্বুজ-ছায়া! ধর্ম্মরাজ্যে দিও স্থান!
শুনিতে শুনিতে যেন পুত্রমুখে কৃষ্ণনাম,
নবীনের হয় এই অপরাহ্ণ অবসান।”

‘প্রভাসে’র শেষে যেখানে কাব্যশেষ সেখানেও দেখিতে পাই শৈলজা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,—

যাও মা মানবী-দেবী! পূর্ণ ব্রত মা! তোমার!
যাও মা করুণাময়ি! পূর্ণব্রত মা! আমার!
চতুর্দ্দশ বর্ষ মা গো! এরূপে বসিয়া ধ্যানে
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে!
পাইয়াছি শোকে শান্তি; পাইয়াছি দুঃখে সুখ;
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র; প্রেমে ভরিয়াছে বুক।
ফলিয়াছে বহু আশা; ফলে নাই বহু আর;
বহিয়াছি এ জীবন আশার ও নিরাশার।
গীত শেষ অপরাহ্নে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে!
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস-তীরে।
সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী।
এই তীরে সন্ধ্যা; ঊষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী!

কবির ‘পলাশির যুদ্ধ’ও মূলতঃ এই হৃদয়-

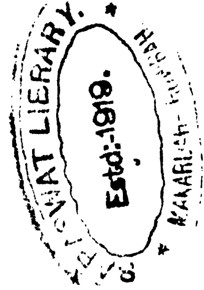
অবলম্বনে রচিত,—সমগ্র কাব্যখানিই তাই লিরিকধর্মী। পরাধীনতার বেদনা এবং স্বাধীনতার উন্মাদ বাসনা প্রকাশই এখানে লক্ষ্য, পলাশির যুদ্ধ উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু স্বল্প আয়তনের ভিতরে হৃদয়ের যে উচ্ছ্বাস—যে উন্মাদনা কাব্যের চমৎকারী গুণ হইয়া উঠিয়াছে, 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে' তাহাই অনেক স্থানে মহৎ দোষরূপে দেখা দিয়াছে। তা ছাড়া 'পলাশির যুদ্ধ' উচ্ছ্বাসপ্রধান কাব্য হইলেও সেখানে ঘটনাপ্রবাহেরও একটা গতি রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে একটু মাত্রাধিক্য হইলেও মোটের উপরে হৃদয়স্রোত এবং ঘটনাস্রোতের ভিতরে একটা সঙ্গতি রহিয়াছে।

কাব্যকলার দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়,—নবীনচন্দ্রের ভিতরে শ্রেষ্ঠ কবির গুণ অনেক ছিল,—কিন্তু ছিল না শুধু কাব্য-সৌন্দর্যের মূলসূত্র সংযম। কবির ভিতরে এত উচ্ছ্বাস রহিয়াছে—এত ভাবাবেগ রহিয়াছে,—ভাষার উপরে এমন দখল রহিয়াছে—এমন বর্ণনা-নৈপুণ্য রহিয়াছে, কিন্তু সকলের ভিতরে একটি সূক্ষ্ম সঙ্গতি স্থাপন করিবার ক্ষমতাটি নাই। ভাবাবেগ এবং উচ্ছ্বাসই কবি-চিত্তকে এমন ভাবে ভাসাইয়া লইয়া যাইত যে, কোন্‌খানে যে মাত্রা পূর্ণ হইল,—কোথায় যে কোন্ প্রবাহের বিরাম-যতি আবশ্যক সেদিকে তিনি দৃষ্টি দিতে পারিতেন না। এ যেন অনেকখানিই আনন্দের প্রাচুর্যে 'বালনৃত্যবৎ'। কিন্তু নৃত্যকে

যেখানে শিল্পকলায় পরিণত করিতে হইবে সেখানে শুধু আনন্দের প্রাচুর্যে পা ফেলিলেই চলে না,—সেখানে রহিয়াছে পদে পদে ছন্দের বাঁধন,—এবং সেই ছন্দের বন্ধনের ভিতর দিয়াই সে লাভ করে একটি অখণ্ড পরিণতি। নবীনচন্দ্রের কাব্য যেন অনেক স্থানেই তাঁহার ভাবাবেগের প্রচণ্ড প্রবাহ মাত্র,—নিজের গতিতে সে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে,—কোথাও হয়ত সে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া তটস্থ শ্যামল শস্যভূমির ভিতরে অনেকখানি অনধিকার প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে,—কিন্তু কবি নিজেই সে জলতরঙ্গকে সংহত করিতে পারিতেছেন না। নাচিয়া কুঁদিয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া অন্তরের অনিবার্য উন্মাদনাকে প্রকাশ করাই যেন কবির কাজ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকেই আমি পূর্বে বলিয়াছি কবি-প্রতিভার সাগরধর্ম। এদিক হইতে আমরা নবীনচন্দ্রকে ইংরেজ কবি বায়রণের সহিত তুলনা করিতে পারি ; বায়রণের দোষগুণ কবি প্রায় সকলই পাইয়াছিলেন। তুচ্ছ ক্ষুদ্র বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মুহূর্তে তাহাকে কল্পনার বিদ্যুৎ-ছটায় উদ্ভাসিত করিতে নবীনচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরিয়া তাহাকে একটি বিশেষ পরিণতি-দানের ধাতটিই যেন কবির ছিল না।

ভাষা, ছন্দ এবং বর্ণনার দিক হইতে কবির শিথিলতা, অসাবধানতা এবং অতিরেক বহুস্থানে পরিস্ফুট। আমি দু'একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। 'রৈবতকে'র প্রথম দৃশ্যে

অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখস্থ মহাসিন্ধুর দিকে বিমুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া আছেন।—



মহাদৃশ্য! মহাধ্যান! নীরবে উভয়
রহিলা সে ধ্যানমগ্ন। চিন্তার প্রবাহ
অনন্তের মহাগর্ভে প্রবেশে যখন,
ভাষা তার—নীরবতা! শরতের মেঘ
অনন্ত আকাশগর্ভে মিশায় যখন
ভাষা তার—নীরবতা!

এ পর্যন্ত সুন্দর এবং গম্ভীর; কিন্তু কবি এখানে থামিতে জানেন না,—ইহারই সঙ্গে—

নীরবতা ভাষা,
পতঙ্গ সাগরগর্ভে পতিত যখন!

পূর্ব বর্ণনার সকল মাহাত্ম্য একটি উপমায় নাশ করিয়া দিলেন! অন্যত্র বাসকি দুর্বাসার অন্ধকার ভয়াবহ পার্বত্য গুহার বর্ণনা দিতেছেন—

যেই এই বনপ্রান্তে করিনু প্রবেশ,
কি যেন দারুণ শীত হইল সঞ্চার
সর্ব্বাঙ্গে, পড়িল বুকে বৃহৎ পাষাণ।
ফেলি এক পদ, শুনি পদশব্দ দুই;
আসিতেছে সঙ্গে সঙ্গে কি যেন পশ্চাতে!
কহিতেছে কাণে কাণে কি যেন সতত!

কিন্তু কবির এইখানে থামিবার নামটি নাই; বর্ণনা চলিতে লাগিল,—

দাঁড়াইলে সে দাঁড়ায়, ছুটিলে সে ছুটে,
কাশিলে সে কাশে সঙ্গে, হাসিলে সে হাসে।

'রৈবতকে' ব্যাসাশ্রমের বর্ণনাটি সংস্কৃত কাব্যের খানিকটা অনুগামী হইলেও কবি বর্ণনার গুণে ইহাকে একটা নূতন চমৎকারিত্ব দান করিয়াছেন। পার্বত্য অবস্থান, তরুলতা, পশু-পাখীর বর্ণনায় আশ্রমের গাম্ভীর্য এবং মহিমা প্রথমদিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্ণনা করিতে করিতে বর্ণনাই কবিকে একেবারে পাইয়া বসিল, তিনি তখনই মাত্রাজ্ঞান হারাইলেন। কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়কে দেখিয়া আশ্রমের ক্ষুদ্র শিশুগণ কোলাহল করিয়া ছুটিয়া আসিল; তাহার ভিতর হইতে—

আধ আধ কণ্ঠে
পঞ্চমবর্ষীয় এক শিশু কর তুলি
কহে হাসি—"মহালাজ! আছীব্বাদ কলি।"

কৃষ্ণার্জুন হাসিলেন, শিশুকে সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার পুষ্পনিভ মুখখানি চুম্বন করিলেন; শুধু তাহাই নহে—

খাদ্য, বস্ত্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়ার পুতুল,
দারুকের হস্ত হ'তে করিয়া গ্রহণ
বিলাইল শিশুগণে।

তাহার পর আসিল একটি আশ্রমব্যাঘ্রের বর্ণনা। সে বর্ণনা পড়িয়া কাহারও ভীত ত্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ,—

"আছে দুই পালিত শার্দ্দুল
মহর্ষির, নাম তার 'সুশীল', 'সুবোধ',
ব্যাঘ্রজাতি মধ্যে শান্ত ঋষি দুই জন।

আশ্রমে আসিয়া ব্যাঘ্রদ্বয় যে শুধু 'সুশীল' এবং 'সুবোধ' হইয়া ঘুমাইয়া আছে তাহা নহে,—

"হিংস্র মাংসাহারী
আপন স্বভাব ভুলি, শোণিত লোলুপ,
ফলমূলাহারী এবে !"

তাহার পরে—

জনৈক বালক
কহিল—"সুবোধ ! পথ দাও হে ছাড়িয়া !"
মাথা তুলি, শান্ত নেত্রে চাহি মুহূর্ত্তেক
আগন্তুক পানে, ব্যাগ্র করিয়া জৃম্ভণ,
সরি' পাদদ্বয় পুনঃ করিল শয়ন।
একটি বালক গিয়া করি আলিঙ্গন
গায়ে বুলাইয়া হাত, বলিল—"সুবোধ !
বড় ভাল ছেলে তুমি।"

বাঙালী কবি আশ্রমের ব্যাঘ্রটিকেও 'প্রথম পাঠে'র 'গোপালে'র ন্যায় ভাল ছেলে না করিয়া ছাড়িবেন না। কবি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তাঁহার বর্ণনার 'আদিখ্যেতা'য় তাঁহার পূর্ব বর্ণনার ফল সবটুকুই পাঠকের মন হইতে এতক্ষণে বাষ্পাকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! ষষ্ঠ সর্গেও অর্জুনের ছবি অঙ্কনে অপরাধিনী, সত্যভামা কর্তৃক

নির্জন উদ্যানে বন্ধনগ্রস্তা সুভদ্রার সম্মুখে অর্জুনের অতর্কিত আগমন অতি মনোরম একটি নাটকীয় পরিস্থিতি ঘনাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু কবি ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; সেখানেও 'পঞ্চমবর্ষীয় ক্ষুদ্র শিশু মনমথে'র আবির্ভাব ঘটাইয়া যে সস্তাদরের তরল আদিরসে কবি মাতিয়া উঠিলেন, তাহাতে সমস্ত নাটকীয় অবস্থানটি নষ্ট হইয়া গেল। এইরূপ অসাবধানতা ও অতিরেক কবির কাব্যে খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে হয় না, চোখ মেলিলেই চোখে পড়িবে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের আর একটি অসৌষ্ঠব তাঁহার চরম আদর্শবাদ। অবশ্য তখন পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে 'Art for Art's sake'-এর ধুয়া তেমন করিয়া জাঁকিয়া ওঠে নাই, এবং মানুষের চিত্তবৃত্তির উন্মেষের ভিতরে তাহার রসবোধ এবং সৌন্দর্যবোধকে তাহার অন্যান্য সকল বোধ হইতে এইরূপে একেবারে ছাঁকিয়া তোলা যায় কি না, সে প্রশ্নেরও এখন পর্যন্ত সমাধান হয় নাই ; কিন্তু সাহিত্য যদি আবার শুধু বেত্রহস্তে 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'—এই শাসন-বাণীই প্রচার করিতে থাকে, তবে তাহার ব্যবহারিক মূল্য যাহাই থাকুক, ললাটে সে সাহিত্যের শিরোনামা বহন করিতে অক্ষম। শিল্পক্ষেত্রে আদর্শবাদের কোন প্রবেশ অধিকার নাই—এ মতও যেমন গোঁড়ামি,—আবার একথাও স্বীকার্য যে শিল্পক্ষেত্রে আদর্শবাদের একটা সীমা

আছে; সে যখন এই সীমা লঙ্ঘন করিয়া আপনারই মাহাত্ম্য প্রচার করিতে চায়, কলালক্ষ্মী সেখানে আপনার সম্মান বাঁচাইয়া আত্মগোপন করেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাঁহার সার্বজনীন মঙ্গলের আদর্শ যেমন একদিকে তাঁহার কাব্যের একটা গৌরব দান করিয়াছে, অন্যদিকে মাত্রাধিক্যে সে অনেক স্থলে শিল্পকলাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তাই তাঁহার কাব্যমঞ্চে অনেক আদর্শের অন্তরাত্মা অশরীরী দেবতার মতই ভাসিয়া বেড়ায়,—তাহারা বাস্তব শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়া আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে আসে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন,—'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম বাবু অমর। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অতি উচ্চ শিল্প ও শিক্ষা আছে। কিন্তু আদর্শ চরিত্র নাই। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদর্শ কন্যা, এমন কি আদর্শ ভৃত্য পর্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই। বঙ্কিম বাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন,—গড়িতে পারেন নাই।.........বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।" এখানে ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শ বলিতে কবি সেই সাহিত্যকেই বুঝিয়াছেন যাহার ফলশ্রুতি চতুর্বর্গলাভ—এবং সাহিত্য-জীবনে কবি নিজেও এই আদর্শকেই গ্রহণ

করিয়াছেন ; ফলে তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি স্থানে স্থানে এক একটা অশরীরী আদর্শ মাত্র হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সম্যক স্ফুরণ নাই।

কিন্তু এত সব দোষ সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে নবীন সেন কবি ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার বর্ণনা সত্যই প্রথম শ্রেণীর কবির উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে দু'একটি উপমা, দু'একটি কথা যেন রবীন্দ্রনাথের আগমন ইঙ্গিত করিতেছে। সুভদ্রার সহিত অর্জুনের যখন প্রথম সাক্ষাৎ তখন—

দেখিলা বালিকা এক বসি একাকিনী
সেই উচ্চ শৃঙ্গপ্রান্তে, ঘোর ঝটিকায়,
সায়াহ্ন গগনতলে।................
অর্জ্জুন ভাবিলা মনে সেই গিরিমূলে,
সেই প্রপাতের পার্শ্বে নির্ঝরিণীকূলে,
বিসর্জ্জিয়া রাজ্য, ধন, বীরত্ব-পিপাসা,
রহিবেন, নির্ম্মাইয়া পল্লব কুটীর,
ওই মুখখানি পানে চাহিয়া চাহিয়া।

ইহার সহিত আমরা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের উক্তির তুলনা করিতে পারি,—

ভাবিলাম,
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের

নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হ'য়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে ;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবন-বাঞ্ছিত অরুণ চরণতলে।

অন্যস্থানে সুভদ্রার বর্ণনা—

পল্লব আঁধারে খণ্ড জ্যোৎস্নার মত,
অলক-আঁধারে ওই অতুল আনন
রয়েছে অসাবধানে কি শোভা বিকাশি,
নিদ্রার আঁধারে যেন স্বপনের হাসি ;
অতীতের সুখ-স্মৃতি ; ভবিষ্যৎ আশা ;
নিরাশার অন্ধকারে যেন ভালবাসা।

অথবা— মেঘ আবরণে থাকি
শশাঙ্ক যেমতি করে সিন্ধু বিচঞ্চল,
কেশ আবরণে ওই শশাঙ্ক-বদন
করিছে তেমতি মম হৃদয় বিহ্বল !

অথবা— না পাই শুনিতে কণ্ঠ ; তবু কাণে মম
কি সঙ্গীত প্রেমময় হতেছে বর্ষণ,
নিশীথে স্বপনশ্রুত দূর বংশীমত,—
মধুর অশ্রুতপূর্ব্ব ! হৃদয় কঠিন
নৈশ সমীরণ মত হতেছে বিলীন
অজ্ঞাতে তাহাতে ;

অথবা অর্জুনের সম্বোধনে সুভদ্রার অবস্থা—

বালিকার অবসন্ন প্রাণে ধীরে ধীরে,
ক্লান্ত বিশ্বে প্রদোষের ছায়ার মতন,
সুকোমল নিদ্রা যেন করিছে প্রবেশ!

প্রভৃতি বর্ণনা সুন্দর এবং সংযত হইয়াছে।

জরৎকারুর যৌবন-বর্ণনা—

উরু পরে বাম কর করপদ্মে শশধর
এক গুচ্ছ কেশে অন্য কর;
নীরব নয়ন স্থির চেয়ে আছে নীল নীর
নীল নীরে প্রতিমা সুন্দর।
... ...
কি গঠন ক্ষীণ কটি! হৃদয়ে তরঙ্গ দু'টি
উথলিছে ছড়ায়ে উচ্ছ্বাস!
আপনার পূর্ণতায় আপনি উন্মত্তপ্রায়
ফেটে যেন পড়িতেছে বাস!

ইহার ভিতরেও সংযম এবং চমৎকারিত্ব রহিয়াছে।

'প্রভাসে'র প্রথম সর্গে মহাসিন্ধুর বর্ণনা—

আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর।
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর।
নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে—মহা আলিঙ্গন।

অথবা কৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রণতা তপস্বিনী-শৈলজার বর্ণনা—

যেন সন্ধ্যা নিরমলা
বসিল সুনীল শান্ত নীলাম্বর-পদে।

একটা গম্ভীর মহিমা লাভ করিয়াছে।

সকল ত্রুটি বিচ্যুতি—সকল অসংযম, অসাবধানতা সত্ত্বেও যে কবি নবীনচন্দ্র আমাদের নিকটে এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার আর একটা প্রধান কারণ তাঁহার সমগ্র কাব্যের একটা স্পন্দন! তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরসৈকতের পার্বত্যদেশে পরিবর্ধিত কবির স্পন্দনময় বিক্ষুব্ধ চিত্তটির সাড়া আমরা যেন তাঁহার কাব্যের পাতায় পাতায়ই পাইতেছি, ইহাই তাঁহার কাব্যের বিশেষ গুণ। কবির কাব্যপ্রেরণা, তাহার উচ্ছ্বসিত গতিবেগ কতগুলি রীতি-নীতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া প্রাণহীন কথার বাঁধুনিমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দোষগুণ লইয়া কবি যে একটি জীবন্ত প্রাণের সাড়া দিতেছেন,—এবং তাঁহার সেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সহিত যে পাঠকের হৃদয়কে উন্মথিত করিয়া দিতে পারেন, ইহাই ত শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ। কবির 'পলাশির যুদ্ধে' এই প্রাণ-স্পন্দন অতি নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে যখন 'কাঁপাইয়া রণস্থল কাঁপাইয়া গঙ্গাজল',—'কাঁপাইয়া আম্রবন' বৃটিশের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন কবি নিজেও যেন স্বশরীরে বাঙলার তথা ভারতের ভাগ্যবিধাতার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে উপস্থিত ছিলেন; যেখানে 'নাচিছে দেবী নির্দ্দয়-হৃদয়'—সেখানে কবি শুধু কল্পনার সাগরে ভাসমান নহেন,—রুদ্ধশ্বাস, নিশ্চলদেহে তিনিও তখন নির্নিমেষ নয়নে

লক্ষ্য করিতেছেন,—ভারতের ভাগ্য-বিধাতা একটা সমগ্র জাতিকে কোন্ পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। পলাশির যুদ্ধের পর মূর্ছান্তে মোহনলাল যখন অস্তমিত-প্রায় সূর্যের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—

'কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র-কিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন,
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ-রজনী !'

... ...

'কি ক্ষণে উদয় আজি হইল তপন ?
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্ব্বরী।
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি !'

... ...

'নিতান্ত কি দিনমণি ! ডুবিলেন এবার ;
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু-জলে ?
যাও তবে, যাও দেব ! কি বলিব আর ?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ উদয়-অচলে।
কি কাজ বল না আহা ! ফিরিয়া আবার ?
ভারতে আলোকে কিছু নাই প্রয়োজন !
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ !

তখন কবির মুহ্যমান হৃদয় হইতে সমগ্র জাতির করুণ

দীর্ঘনিঃশ্বাসটিই ভাষায় রূপ পাইয়াছে। সমগ্র কাব্যখানির ভিতর দিয়া কবির আশা-আকাঙ্ক্ষা,—শৌর্য-বীর্য,—আনন্দ-বিষাদ যেন ভাষা ও ছন্দের বাঁধন ভাঙিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। এই যে কাব্যের ভিতর দিয়া কবি-চিত্তের গভীর সঙ্গ লাভ—ইহা অতি দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের পরে আজিকার দিনে বাঙলা সাহিত্য কাব্য-কবিতায় মুখরী; কিন্তু আমাদের প্রাণহীন কথার বাঁধুনিতে, ভাষা ও ছন্দের বিলাসে সকল এক হইয়া যাইতেছে, কাব্য-কবিতার ভিতর দিয়া যেন একটা বিশেষ প্রাণ তাহার অমোঘ সন্ধানে আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে না। নবীনচন্দ্র হইতে কাব্যের ক্ষেত্রে অধিক সংযম, ভাষা ও ছন্দের অধিক নৈপুণ্য আমরা লাভ করিতে পারিয়াছি,—কিন্তু সেই স্পন্দনময় উন্মাদ প্রাণদেবতার সন্ধান যেন লাভ করিতে পারি নাই। সেই প্রাণদেবতার জীবন্ত বিগ্রহ নবীনচন্দ্র আজও তাই আমাদের বরেণ্য এবং নমস্য।

দৃশ্যকাব্য ও আমাদের নাট্যসাহিত্য

সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থে দেখিতে পাই, কাব্যকে মোটা-মুটি দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে,—দৃশ্যকাব্য আর শ্রব্যকাব্য। কাব্যকে যে আমরা পড়িয়া বা কানে শুনিয়াই আস্বাদ করি তাহা নহে,—এক শ্রেণীর কাব্য আছে যাহাকে আমরা দেখিয়া আস্বাদ করি। সাহিত্যের ভিতরে নাটক হইতেছে এই দৃশ্যকাব্য, অন্যান্য জাতীয় সাহিত্য পড়ে শ্রব্যকাব্য বিভাগের ভিতরে। কাব্যের এই যে দুইটি বিভাগ, ইহা একটা বহিরঙ্গ বিভাগ মাত্র নহে,—ইহার ভিতরে সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিহিত আছে। বাহিরের জগৎ নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতেছে,—সেখানে আমাদের কবিচিত্তটি নিরন্তর করিতেছে বাছাই,—সেই বাছাই করা মাল-মসলা লইয়া মনের ভিতরে গড়িয়া উঠিতেছে আর একটি রসের জগৎ। এই যে অন্তরের রসের জগৎটি সে আমাদের বাসনার জগৎ,—তাহার স্পষ্ট কোনও রূপ নাই,—রহিয়াছে অস্পষ্ট অবচেতনের মধ্যে শুধু রূপের বাসনা। সাহিত্যের ভিতর দিয়া পাঠক যখন আভাসে ইঙ্গিতে সন্ধান পায় সেই রসলোকের,—সেখানে তাহার রসলোকের বাসনাগুলি যেন রূপ পাইয়া—ভাষা

পাইয়া ফুটিয়া ওঠে তাহার অন্তরের মধ্যে, তখন সে লাভ করে সত্যকার রসানুভূতি। বহির্জগৎটি আমাদের রসলোকে প্রবেশ লাভ করে অনেকখানি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া; আবার রসলোকের বাসনাগুলিকে উদ্রিক্ত করিয়া তুলিতে,—তাহাদিগকে রূপের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতেও অনেকখানি সাহায্য করে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়,—তাই সৃষ্টি হইল দৃশ্যকাব্যের, যেখানে কাব্যবস্তু আমাদের যুগপৎ দেখা-শোনার ভিতর দিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইতেছে জীবন্ত হইয়া,—আমাদের বাসনাগুলি জাগিয়া উঠিতেছে প্রত্যক্ষবৎ।

সংস্কৃতের অলঙ্কারশাস্ত্রের ভিতরকার ভরতের নাট্য-সূত্রগুলিকে বিচার বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে এ-কথাটি স্বতঃই মনে উদিত হয় যে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যশাস্ত্রই বোধ হয় প্রথম উঠিয়াছিল সমৃদ্ধ হইয়া,—অন্ততঃ একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, ভরতের আবির্ভাব এবং তাঁহার নাট্যসূত্র রচনার বহু পূর্বেই সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের যে নাট্য-কাব্যের সন্ধান পাইতেছি, তাহাতে এ অনুমান সমর্থিত হয় না। তবে মনে হয়, বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের আমরা আজ যে অংশের সন্ধান পাইতেছি, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর অংশ লুকাইয়া আছে কালের অন্ধকার কুক্ষিমধ্যে। কিন্তু ভরতের নাট্য-

সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের যে নাট্য-সাহিত্যের ধারা, অনেক কিছুর ন্যায় তাঁহাও যেন আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে আমাদের বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যগুলির ভিতরে লাভ করিতে পারি নাই; কৃষ্ণ-যাত্রা, রাম-যাত্রা প্রভৃতির ভিতর দিয়া আমাদের নাট্য-সাহিত্য যেন একেবারে নবজন্মের পর হামাগুড়ি দিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে,—এবং এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের নাট্য-সাহিত্যের কৈশোর এবং যৌবন ঘটাইয়াছে অনেকখানিই পাশ্চাত্ত্য-নাট্য সাহিত্য;—আর এ-কথাও বলিতে আমরা বাধ্য যে, আমাদের উপন্যাস, কাব্য-কবিতা প্রভৃতি যেরূপ প্রৌঢ়ত্বের দাবী করিতে পারে আমাদের নাট্য-সাহিত্য এখন পর্যন্তও সেরূপ প্রৌঢ়ত্বের দাবী জানাইতে অক্ষম। যে যুগ পড়িয়াছে, সে যুগে ভবিষ্যতেও যে নাট্যসাহিত্য আর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিবে, এরূপ আশা আমরা আর করিতে পারিতেছি না।

নাট্য-সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া যুগের দোহাই পাড়িবার অর্থ আছে। নাট্য-সাহিত্যের লক্ষণই এই যে তাহা দৃশ্য-কাব্য। যাহা দৃশ্য তাহা শুধু জীবন্তের ন্যায় প্রত্যক্ষের ন্যায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে থাকিবে,—আমরা নিজেরাই তাহাদিগকে দেখিব, শুনিব, বুঝিব এবং আস্বাদন করিব। এখানে কাহারও কিছু বুঝাইয়া বলার দরকার নাই,—ভূমিকা করার দরকার নাই—ব্যাখ্যার প্রয়োজন

নাই। এই জন্য নাট্যকারের কাজ এই, তিনি সর্বদা থাকিবেন যবনিকান্তরালে,—আদান-প্রদান চলিবে শুধু আমাদের সঙ্গে এবং নাটকের পাত্র-পাত্রীগণের সঙ্গে। নাট্যসাহিত্যের দৃশ্যত্ব লক্ষণের মধ্যেই নিহিত আছে তাহার বস্তু-প্রাধান্যের লক্ষণ,—পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনায় নাট্যসাহিত্যকে তাই বলা হয় objective। প্রত্যেকটি ঘটনা ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার স্বাভাবিক প্রবাহে,—প্রত্যেকটি চরিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার বীজ-স্বরূপের স্বাভাবিক পরিণতিতে। আখ্যান-বস্তুর পরিকল্পনায়, চরিত্র-সৃষ্টির আদর্শের ভিতরে থাকিতে পারে নাট্যকারের ব্যক্তি-স্বাধীনতা,—কিন্তু ঘটনার প্রবাহে এবং চরিত্রের বিকাশের ভিতরে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত থাকা চাই একটা অনিবার্যতা,—আর এই অনিবার্যতা সূচিত হইবে নাট্যকারের কোনও বিশেষ চেষ্টার ভিতর দিয়া নহে,—তাহা ফুটিয়া উঠিবে ঘটনা বা চরিত্রের অন্তর্লীলার ছন্দে। কিন্তু নাট্য-বিবর্তনের ভিতরে দেখিতে পাই, দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্যকাব্যের প্রভেদটি যেন ক্রমান্বয়ই লোপ পাইতে বসিয়াছে। আজ-কালকার উপন্যাস-সাহিত্যের এবং নাট্য-সাহিত্যের আখ্যান-বস্তু, চরিত্রাঙ্কন প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, পরিকল্পনায় বা রূপায়ণে ইহাদের ভিতরকার পার্থক্যটি যেন খুব স্পষ্ট নহে। আধুনিক জীবন সম্বন্ধে মানুষের মনে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে যে জটিলতা—যে সমাধান-

বিহীন অসংখ্য সমস্যা,—তাহাই যেন নানা রূপে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে গল্প, উপন্যাস, কাব্য-কবিতা, নাটক প্রভৃতির ভিতর দিয়া। এই বিংশ-শতাব্দীতে মানুষের ব্যক্তি-পুরুষটি এমন সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিতেছে যে, বিশ্বময় নিজেকে ছাড়া মানুষ আর কিছুই যেন খুঁজিয়া পায় না,—বিশ্বজগৎকে সে গ্রহণ করে আপনার বিশিষ্টরূপে, তাহাকে আবার প্রকাশ করার ভিতরেও দেখিতে পাই যেন সেই আত্ম-প্রকাশ। ফলে গল্পাংশ ছাড়িয়া নাটক হইয়া উঠিতেছে অনেকখানি সমস্যার ঘূর্ণিপাক,—জীবন যেন সেখানে আর দৃশ্য হইয়া উঠিতেছে না,—সে যেন হইতেছে অনেকখানিই বুদ্ধীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। তাই দেখিতে পাই, ইউ-রোপের সাহিত্যেও আজকাল যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমাদর লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের নাটকও রঙ্গমঞ্চে খুব সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতে পারিতেছে না,—তাহাদের অভিনয় যেন কাহাকেও তেমন আর সত্যকারের আনন্দ দিতে পারিতেছে না। সাহিত্য-রসিকগণ সাহিত্য হিসাবে তাহাদিগকে যতই আদর করুন, তাহাদিগকে যতই প্রশংসা করুন,—তাহাদের সূক্ষ্মকলা-নৈপুণ্যে যতই মুগ্ধ হোন না কেন,—তাহারা যেন আর দৃশ্যকাব্য হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

কিন্তু দৃশ্যকাব্যের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষাও কি সত্য সত্যই লোপ পাইয়াছে? নিখিল সৃষ্টির রঙ্গালয়ে প্রতিনিয়ত

চলিতেছে যে জীবন-নাট্যের অভিনয় তাহাকে আবার কলা-কৌশলের ভিতর দিয়া নূতন করিয়া চোখের সম্মুখে দেখিবার বাসনা কি মানুষ হারাইয়া ফেলিয়াছে? তাহা নহে। দৃশ্য-কাব্যের জন্য এই বিংশ-শতাব্দীতেও আমাদের বাসনা খুব বেশী পরিবর্তিত হয় নাই; তাই দেখিতেছি নাটক যখন তাহার দৃশ্য-কাব্যত্বের লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য সাহিত্যের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে, তখন তাহারই পাশাপাশি আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে দৃশ্য-কাব্য· চলচ্চিত্রের রূপে, এবং সে আজ আবার এমন নূতন করিয়া আমাদের মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে যে, আজকালকার রঙ্গালয়-গুলি কিছুতেই আর তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সিনেমার অতিদ্রুত প্রসারের ফলে রঙ্গালয়-গুলির যে কি দুরবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহা আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। এই রঙ্গালয়গুলির ক্রমান্বয়ে দুর্গতির সহিত আমাদের নাট্য-সাহিত্য ক্রমেই আরও বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্যাবহুল উপন্যাস-জাতীয় সাহিত্য হইয়া উঠিবে। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের নাট্য-সাহিত্যের অচলতার মূলে রহিয়াছে অনেকখানি যুগধর্মের প্রভাব। আমাদের বর্তমানযুগের নাটকগুলি যেমন অনেক স্থলেই দৃশ্য-কাব্য হইয়া উঠিতে পারিতেছে না, আমাদের চলচ্চিত্রের বিষয়-বস্তুও আবার শুধু দৃশ্যই হইয়া উঠিতেছে,—সে আর সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাই মনে হয়,

বর্তমান যুগে দৃশ্যকাব্য যেন স্পষ্ট দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে,—একটি শুধু দৃশ্য, অপরটি শুধু কাব্য! সুতরাং একাধারে উত্তম দৃশ্য এবং উত্তম কাব্য আর গড়িয়া উঠিবে কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

কিন্তু এখানে ভাবিবার কথা এই, আধুনিক নাট্য-সাহিত্য আর দৃশ্যকাব্য হইয়া উঠিতেছে না বটে, কিন্তু দৃশ্যকাব্য না হইবার জন্য তাহাদের সাহিত্যিক মূল্যও কি হ্রাস পাইতেছে? বাঙলা-সাহিত্যে এই জাতীয় নাট্য-সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে না পারিলেও আমরা দেখিতে পাই, জগতের অন্যান্য সাহিত্যে আজকালও বড় বড় তথা-কথিত নাট্যকার জগতের সাহিত্য-সভায় বিজয়মাল্য লাভ করিতেছেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই সকল আধুনিক নাট্যকারগণের নাটক আর প্রকৃতিতে দৃশ্যকাব্য নাই, তাহারাও শ্রব্যকাব্য হইয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই,—আধুনিক নাটককে আমরা যখন সাহিত্য হিসাবে বিচার করিব তখন তাহার এই দৃশ্যকাব্য না হওয়ার দোষকে আমরা কোনও বিশেষ সাহিত্যিক দোষ বলিয়া গণ্য করিব কি না। অবশ্য একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, ইবসেন, বার্ণার্ডশ' প্রভৃতির নাটকগুলি সর্বত্র উত্তম দৃশ্যকাব্য না হইয়া উঠিলেও তাহা উত্তম কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। আমার মনে হয়, এই জাতীয় আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের বিচার করিবার সময় আমাদের নাট্য-সাহিত্যের সংজ্ঞাকেও অনেকখানি বদলাইয়া

বা প্রসারিত করিয়া লইবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আর নাট্য-সাহিত্যের দৃশ্যকাব্যত্ব-লক্ষণ বদলাইতে যদি আমরা একান্তই অনিচ্ছুক হই তাহা হইলে ইহাদিগকে নূতন কোনও নাম দিয়া লওয়া যাইতে পারে। কালের স্রোতে সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের আকৃতি প্রকৃতিও বদলাইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বের্গসঁ বলেন যে, বিবর্তনের ভিতর দিয়া যে শুধু একটা পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা নহে,—বিবর্তনের প্রবাহের ভিতরে বস্তু সর্বদাই একটা নূতন স্বরূপ—নূতন সত্তা লাভ করিতেছে। বিবর্তনের এই নিয়মকে আমরা সাহিত্যের জগতেও প্রয়োগ করিতে পারি। এই বিবর্তনের স্রোতে নাট্য-সাহিত্য তাহার প্রাচীন স্বরূপই অনেকখানি হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং সে আবার লাভ করিয়াছে একটি নবীন স্বরূপ। তাই আধুনিক নাটকগুলিকে আমরা ঠিক ঠিক নাট্য-সাহিত্য বলিতে না চাহিলেও, তাহাদিগকে এক জাতীয় উত্তম সাহিত্য বলিতে আমাদের আপত্তি থাকিতে পারে না।

নাট্য-সাহিত্যের এই 'দৃশ্যকাব্য' সংজ্ঞা পরিবর্তিত না করিয়া বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে যে দুইজন মহারথীকে আমরা নাট্যকার হিসাবে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিতে পারি তাঁহারা হইতেছেন দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পূর্বেই দেখিয়াছি, নাটকের দৃশ্যকাব্যত্ব

লক্ষণের ভিতরেই নিহিত আছে তাহার বস্তুধর্মিতা। তাই যে নাটক এই বস্তুধর্মিতাগুণে ভূষিত, সেই হইয়া উঠিতে পারিয়াছে প্রকৃত নাট্য-সাহিত্য। নাট্য-সাহিত্যের বিচারে তাই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান বিচার্যই এই, ইহা বস্তুধর্মী হইয়া উঠিয়াছে কি না। এই দিক হইতে বিচার করিয়াই দীনবন্ধু এবং গিরিশচন্দ্রকে বাঙলা-নাট্য সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। দীনবন্ধু এবং গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আজকাল হয়ত আমরা আধুনিক সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠিতে অনেক অভিযোগ আনিতে পারি, এবং তাহার অনেক অভিযোগ হয়ত সত্যও। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিতে হয়, বাঙলা-সাহিত্যে যদি সত্যকার দৃশ্যকাব্য রচনার প্রতিভা কাহারও থাকিয়া থাকে তবে তাহা দীনবন্ধু এবং গিরিশচন্দ্রের। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভ হইতে বাঙলা সাহিত্যের সর্বদিকে একটি নবযুগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। এই নবযুগের ঢেউ লাগিয়াছিল নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও; নাট্য-সাহিত্যের এই নবযুগের আহ্বান বহন করিয়াই দীনবন্ধু মিত্র প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে। মধুসূদন দত্তও নাট্যকার ছিলেন, এবং তিনিও দীনবন্ধুর সমসাময়িক। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভার উপরে মহাকাব্যের শিলমোহর যেমন উজ্জ্বল ছিল, নাটকের চিহ্ন তেমন গভীর ভাবে অঙ্কিত ছিল না। তবে মধুসূদনের প্রতিভা ছিল একটা দুর্বার মহাশক্তির ন্যায়,—রাশ টানিয়া

কবি তাহাকে যেদিকে ফিরাইয়া দৌড় করাইয়াছেন, সে সেই দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে,—চলার বেগে এবং নৈপুণ্যে ধরণীর পথে চরণ চিহ্নও সে রাখিয়া গিয়াছে বেশ গভীর করিয়াই। রামনারায়ণ তর্করত্নের ন্যায় প্রতিভাহীন পণ্ডিত বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের যশোমুকুট লাভ করিবেন এবং তাহা লইয়াই বাঙালী মজিয়া থাকিবে, ইহা মধুসূদনের নিকট অসহ্য বলিয়া মনে হইল। তাই তিনি বলিলেন,—

'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে, বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের এই দুর্দশা মোচনের জন্যই মধুসূদনের নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। কিন্তু নানারূপ সাহিত্যিক গুণ থাকা সত্ত্বেও মধুসূদনের নাট্যরচনা সত্যকার দৃশ্যকাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার কারণ, মধুসূদনের নাটক বাস্তব জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাই সমস্ত জুড়িয়া একটা কৃত্রিমতার সুর যেন বেশ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। বিশেষতঃ বাঙলার খাঁটি জীবনের সহিত মধুসূদনের নিবিড় পরিচয় ছিল না। বাঙালী-জীবনের সহিত এই অপরিচয়, তাহার সহিত নাড়ীর টানের অভাব মধুসূদনকে নাট্যক্ষেত্রে করিয়াছিল খানিকটা সংস্কৃতাভিমুখী।

বাঙালীর জীবন ও চরিত্রের সহিত গভীর পরিচয় লাভ ঘটিয়াছিল দীনবন্ধু মিত্রের। একাধারে তাঁহার সত্যকার নাট্য-প্রতিভা, অন্যদিকে বাঙালী-জীবনের সকল আনাচে-

কানাচে তাঁহার প্রবেশলাভ এবং বাঙালী-চরিত্রের সকল রহস্যের ভিতরে তাঁহার নিবিড় নিমজ্জন দীনবন্ধুকে দান করিয়াছিল একটি বিরল শক্তি, যাহার বলে তিনি বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে সত্যই একটা নবযুগের পত্তন করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর রুচি অনেক স্থানে গর্হিত ছিল, ভাষা স্থানে স্থানে অমার্জিত ছিল,—নাট্য-কলাকৌশলের ভিতরে দোষ খুঁজিতে গেলে কিছু কম ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার একটি বিরল নাট্য-প্রতিভা ছিল,—এ প্রতিভা ছিল তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতার ভিতরে এবং এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির গুণেই তাঁহার নাটক লাভ করিতে পারিয়াছিল দৃশ্যকাব্যত্ব। তাঁহার নাটকের ভিতরে তিনি বাস্তব জীবন-নাট্যের এক অংশকেই ছিঁড়িয়া আনিয়া বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের এক একটি দৃশ্যকেই ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন; নাট্যকার হিসাবে এইখানেই তাঁহার অনন্যসাধারণতা। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি বাঙালী-সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে গৃহীত নরনারীরই হুবহু প্রতিকৃতি। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"লোকের সহিত মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য-প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরির মত গ্রাম্যা বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নসীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে

নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ-হেমচাঁদের মত "উনপাঁজুরে বরাখুরে" হাপ সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডেপুটী, নীলকুঠীর দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরাণীর মত লোকের পর্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙালী লেখক তেমন পারে নাই।"

কিন্তু দৃশ্যকাব্যের ভিতরে এই খাঁটি বাঙালী-জীবনকে গ্রহণ করার ভিতরে একটা মস্ত অসুবিধাও ছিল। বাঙালীর জীবনক্ষেত্রের পরিধি বড় সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। কি ব্যক্তি-জীবন, কি সামাজিক জীবন, কি রাষ্ট্র-জীবন কোথাও যেন একটা বৈচিত্র্যের অজস্রতা নাই, প্রসারের বিপুলতা নাই। জীবনের যে আবেষ্টন, যে শৌর্য-বীর্য, যে ভাব সম্পদের প্রাচুর্য, তাহার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা নাট্যকারের চিত্ত উন্মথিত করিয়া তুলিতে পারে তাহা যেন আমাদের জীবনের ভিতরে দুর্লভ ছিল,—তাই নাট্যকারগণ আর বেশীক্ষণ আসর জমাইয়া রাখিতে পারেন নাই। দীনবন্ধু,—এবং শুধু দীনবন্ধু নহে,—বাঙলা-সাহিত্যের প্রায় সকল নাট্যকার সম্বন্ধেই মাঝে মাঝে এই কথাটিই মনে উদিত হয়। উপন্যাসের ভিতরে অনেকখানি লিরিকের স্থান আছে;

লেখক সেখানে সামান্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়াও ঊর্ণনাভের ন্যায় নিজের ভিতর হইতে বসিয়া জাল বুনিতে পারেন; কিন্তু নাটকে সে সুযোগ আদৌ নাই। নাটকের দেহটি বাঁধা অতি সূক্ষ্ম-কঠিন বন্ধনে; কোথাও গানের পদ ছাড়িয়া তান দিয়া আসর মাৎ করিবার সুযোগ নাই। সুতরাং বিষয়-বস্তুদ্বারা গ্রন্থকার এখানে পদে পদে বাঁধা রহিয়াছেন; এবং এক্ষেত্রে বিষয়-বস্তুর দৈন্য খানিকটা গিয়া নাট্য-প্রতিভারও নিয়ামক হইয়া পড়ে। আমার মনে হয়, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র সাফল্যের পশ্চাতে খানিকটা রহিয়াছে ইহার বিষয়ের অভিনবত্ব। নীলকরগণের অত্যাচারের কাহিনী তৎকালীন জীবনে হইয়া উঠিয়াছিল একটা বিশেষ ব্যাপার,—সেই ব্যাপারের বিশেষত্বের সহিত প্রতিভার বিশেষত্ব একত্রিত হইয়াই নীলদর্পণকে দান করিয়াছিল অনেকখানি সাফল্য।

দীনবন্ধু নাট্য-সাহিত্যে যে নবজীবন দান করিলেন তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার ভার পড়িয়াছিল সুযোগ্য উত্তরাধিকারী গিরিশচন্দ্রের উপরে। দীনবন্ধুর অনেক নাটকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াই গিরিশচন্দ্রের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। পূর্বসূরীর প্রতি গিরিশচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল অগাধ। 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকখানি দীনবন্ধুর স্মৃতিতে উৎসর্গ করিবার প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"বঙ্গে রঙ্গালয় খুলিবার জন্য মহাশয় কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।

আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।…… · …আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি। আপনাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল, কিন্তু উপহার দিবার যোগ্য নাটক লিখিতে পারি নাই, এজন্য বিরত ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তবে আর কবে আশা পূর্ণ করিব!—সেই নিমিত্ত এই নাটকখানি অযোগ্য হইলেও আপনার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম। ভাবিলাম ক্ষুদ্র ফুলেও দেবপূজা হইয়া থাকে।” ইহা হইতেই পূর্বসূরী দীনবন্ধু মিত্রকে গিরিশচন্দ্র যে কতখানি শ্রদ্ধা করিতেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই লক্ষণ, যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য শ্রদ্ধা দান!

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির সাফল্যের মূলে রহিয়াছে দৃশ্যকাব্যের সেই মূল লক্ষণ,—ইহার বস্তুধর্ম। সংসার-নাটকটিকে নিখুঁত ভাবে দেখিবার, বুঝিবার এবং কল্পনার সাহায্যে তাহাকে আবার সাহিত্যের জগতে নূতন করিয়া সৃজন করিবার ক্ষমতা ছিল গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ। তাই তাঁহার নাটকের গল্পাংশ সামাজিকই হোক, বা ঐতিহাসিকই হোক, বা পৌরাণিকই হোক, আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে সে আমাদের নিকটে একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে,—এই জন্যই অভিনয়ে সে নাটকগুলির এতখানি সাফল্য। মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তিনি লাভ করিয়াছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি; আর

সেই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাভ করিয়াছিলেন সেই সূক্ষ্ম দর্শন-শক্তি, যাহার ফলে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পারিতেন সংসারের কি দৃশ্যের ভিতর দিয়া কি আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া সেই মানব চরিত্র বিকশিত হইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে। সংসার-যাত্রার অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়টিও তাঁহার মনের ভিতরে একেবারে ছবির ন্যায় আঁকা ছিল,—এবং এই বাস্তবদর্শনের সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের ভিতর দিয়াই তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি শুধু কথা বা ভাব বা কবি-কল্পনামাত্রে পর্যবসিত হয় নাই; কবি-কল্পনার কঙ্কালের উপরে তিনি সংযোগ করিতে পারিয়াছিলেন নিখুঁত বাস্তবতার রক্তমাংস, তাহারই ফলে তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি উঠিয়াছে জীবন্ত হইয়া এবং এই কারণেই তাঁহার নাটকের সমগ্রতার ভিতরে সাধারণতঃ রহিয়াছে একটা বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতার গভীর ছাপ।

প্রায় চিরজীবনই গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন; তাহাতে নাট্যকার হিসাবে তাঁহার যেমন কতগুলি সুবিধাও ছিল, আবার তেমনই কতগুলি অসুবিধাও ছিল। সুবিধা ছিল এই, আজীবন রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে থাকার ফলে রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয় সম্বন্ধে তিনি লাভ করিয়াছিলেন সব রকমের অভিজ্ঞতা—এবং রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পক্ষে একরূপ অপরিহার্য। কোন্ রকমের উপাখ্যানভাগকে কোন ছাঁচে ঢালাই করিলে তাহা অভিনয়ের ভিতর দিয়া

প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে সে নিপুণ দৃষ্টি গিরিশচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা হইতে। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে থাকিবার আর একটি প্রধান দোষ হইয়াছে এই, গিরিশচন্দ্রকে অনেক সময়েই নাটক লিখিতে হইত প্রয়োজনের তাগিদে। নাটক না হইলে আর অভিনয় চলে না,—সুতরাং যেমন করিয়াই হোক হয়ত দুইচারি দিনের ভিতরেই নাটক রচনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা অনেক সময়ে প্রতিভার ব্যবসা—প্রতিভার মস্ত বড় অপমান। প্রতিভা লইয়া এই ব্যবসা গিরিশচন্দ্রকে অনেক স্থানে করিতে হইয়াছে; তাহারই ফলে তাঁহার রচিত বহু সংখ্যক নাটকের ভিতরে অর্ধেক নাটকই এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যলক্ষ্মী বড় অভি-মানিনী,—আপনার গৃহে সে নিঃস্ব হইয়াও স্মিতহাস্যে সমুজ্জ্বলা,—কিন্তু অর্থাগমের জন্য আপন যৌবনশ্রী বিক্রয় করিবার কল্পনা সে কোনদিন মনেও আনিতে পারে না। আমার মনে হয়, গিরিশচন্দ্রের নাটকরচনার পশ্চাতে যদি প্রয়োজনের তাগিদ আর কিছু কম থাকিত এবং ধ্যানস্থ দৃষ্টি লইয়া সৃষ্টিকার্যের সুযোগ যদি তিনি আর একটু বেশী পাইতেন, তবে তাঁহার নাটক সংখ্যায় কম হইলেও প্রতিভার স্ফুরণ তাহাতে বেশী হইতে পারিত।

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙালী জাতির জীবনটি তাঁহার একেবারে নখদর্পণে ছিল। তাহারা কেমন

করিয়া হাসে, কাঁদে, কি করিয়া ভালবাসে—শত্রুতা করে, কি করিয়া কথা বলে, চলা-ফেরা করে,—সমস্ত জিনিসই যেন তাঁহার মানসপটে ছবির ন্যায় অঙ্কিত ছিল। মানুষের দেহ ও মনের ভিতরের উপাদানগুলির মধ্যে একটা সার্বজনীনতা আছে সত্য,—কিন্তু এই সার্বজনীন উপাদানগুলি দেশে দেশে যুগে যুগে প্রকাশ পায় বিশিষ্ট রূপে। এই যে দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জীবনের বিশিষ্ট রূপ ইহার সহিত গভীর পরিচয় না থাকিলে কেহ কখনও সত্যকার নাট্যকার হইতে পারে না। আর্টের রূপ সাধারণকে লইয়া নহে,—বিশেষকে লইয়া,—তাই আর্টসৃষ্টি করিতে চাই মানুষের এই বিশেষ রূপটি। মানুষ হইয়াও বাঙালী বাঙালী,—এই বাঙালীত্বের সন্ধান না জানিয়া বাঙলা-সাহিত্যের নাটক লেখা সম্ভব নহে। পূর্বেই দেখিয়াছি, দীনবন্ধু পাইয়াছিলেন খাঁটি বাঙালীত্বের সন্ধান, তাই তিনি করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন খাঁটি বাঙলা নাটকের গোড়া-পত্তন; তারপর আসিলেন গিরিশচন্দ্র,—তিনিও জানিতে পারিয়াছিলেন আমাদের সবটুকু মনের কথা, আমাদের ঘরের কথা,—তাই তিনিও অঙ্কিত করিতে পারিয়াছিলেন খাঁটি বাঙালী চরিত্র। বিষয়-বস্তুর দিক হইতে দেখিতে পাই, গিরিশচন্দ্রের নাটকের ভিতরে সামাজিক চিত্র হইতে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চিত্রই বেশী। কিন্তু এই পৌরাণিক চিত্রগুলিকেও গিরিশচন্দ্র বাঙলা দেশের জলমাটিতে আবার নূতন ছাঁচে ঢালিয়া

গড়িয়া লইয়াছিলেন। 'বিল্বমঙ্গল' পৌরাণিক নাটক; কিন্তু বিল্বমঙ্গল এবং চিন্তামণি একেবারে নিখুঁত স্পষ্ট জীবন্ত চিত্র,—তাহাদের একটুখানি কথাবার্তার ভিতর দিয়াই তাহারা ফুটিয়া ওঠে তাহাদের আপন বৈশিষ্ট্যে। ম্যাক্‌বেথের ন্যায় বিদেশী জিনিসকেও তিনি যখন বাঙলা-সাহিত্যে আমদানী করিলেন তখন ম্যাক্‌বেথও যেন অনেকখানি এদেশের জলবায়ু গায়ে মাখিয়া এদেশের হইয়া গেল। 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের প্রারম্ভের ডাকিনীদের কথোপকথন—

> দিদিলো, বল্‌না আবার মিল্‌ব কবে তিন বোনে—
> যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
> চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর,
> কড় কড়াকড় কড়াৎ কড়াৎ ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে?

প্রভৃতির তুলনা হয় না। একটা বিদেশী ভাষার এবং বিদেশী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে যে এমন করিয়া ভাষান্তরিত করা যায় তাহা আর গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বা পরে কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি দৃশ্যকাব্য হইয়া উঠিবার আর একটি প্রধান কারণ তাঁহার নাটকের কথোপকথন। এই কথোপকথন নাটকের একটি প্রধান জিনিস, কারণ এখানকার অঙ্কনকার্য অনেকখানিই নির্ভর করে এই কথোপকথনের ভাষা এবং ভঙ্গির উপরে। এ বিষয়েও গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সাধুভাষায় গাল ভরিয়া কথা বলাইতে

পারিলেই নাটকের চরিত্র ফুটিয়া ওঠে না ; প্রত্যেক চরিত্রের ভিতরেও যেমন আছে একটা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য,—প্রত্যেকের কথার ভাষা ও ভঙ্গির ভিতরেও থাকে তেমনই একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ; সেই বৈশিষ্ট্যটুকু রক্ষা করিতে না পারিলে সকল চরিত্রই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়,—ফলে কাহাকেও আর চিনিয়া বাহির করা যায় না। সেক্সপিয়ারের নাটকের ভিতরে দেখিতে পাই, কে কথা বলিতেছে তাহা না বলিয়া দিলেও কি বলিতেছে এবং কেমন করিয়া বলিতেছে তাহা শুনিয়াই আমরা বলিতে পারি বক্তার পরিচয়। গিরিশচন্দ্রের অনেক নাটকের অনেক ব্যক্তির কথোপকথন সম্বন্ধেও আমরা সেই কথা বলিতে পারি। নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভিতরে দেখিতে পাই, ভাষার কি চমৎকারিত্ব,—কি ওজস্বিতা,—অনেক স্থানেই সে যেন পূর্ণবর্ষার গিরি-প্রপাতের ন্যায় গুরুগর্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে আপন তীব্র প্রবাহে,—সে যেন চলিতেই চায়,—থামিতে চায় না। এ ভাষার একটা নিজস্ব মাধুর্য এবং গাম্ভীর্য আছে বটে,—কিন্তু তাহা নাটকে অনেক স্থলেই গুণের না হইয়া মস্ত বড় দোষের হইয়া পড়িয়াছে। বীরের মুখে যেখানে ভাষা দিতে হইয়াছে সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় অদ্বিতীয়,—কারণ তাঁহার ভাষা যে স্বরূপতঃ বীরেরই ভাষা ; কিন্তু অন্যত্র এই গুণই তাঁহার দোষ হইয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বেলায় দেখিতে পাই, ভাষা লইয়া তিনি

যেন একেবারে যাত্ব দেখাইতে পারিতেন। এক 'প্রফুল্ল' নাটকের ভিতর দিয়াই তাহার প্রমাণ মেলে ; প্রফুল্ল নাটকের উমাসুন্দরী, জ্ঞানদা, প্রফুল্ল, যোগেশ, রমেশ প্রভৃতি সকলের ভিতরেই রহিয়াছে এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের ছাপ।

নাটকের গঠন-কৌশল চরিত্রাঙ্কন, ভাষা-প্রয়োগ প্রভৃতির দিক দিয়া গিরিশচন্দ্রের একটা সংযম এবং দক্ষতা ছিল ; কিন্তু তাঁহার মনের একটি বিশেষ ভাবাবেগের উপরে অনেক স্থানে তাঁহার নাটকীয় সংযম ছিল না,—ইহা তাঁহার ভক্তিভাব। গিরিশচন্দ্র স্বভাবেই অনেকখানি ভক্ত ছিলেন,—আর সেই অন্তর্নিহিত লৌহ-অংশের সহিত ঘটিল শ্রীরাম-কৃষ্ণরূপ চুম্বকের স্পর্শযোগ ; ফলে তিনি ভক্তিতে যেন একেবারে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভক্তির বিহ্বলতাকে তিনি নাটকের ভিতরে সর্বদা সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া রূপ দিতে পারেন নাই। বাঙলাদেশ প্রেমভক্তির দেশ,—এই প্রেমভক্তির দৃশ্যে ও কাব্যেই পাঠক এবং দর্শকগণও মাতিয়া উঠিত ; এই জন্যই গিরিশচন্দ্র বোধ হয় নাটকে এই ভক্তির প্রাধান্য দিতে অনেক স্থানে পাঠক এবং দর্শকগণ কর্তৃক উৎসাহিতই হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের হাতে কাব্যরসের সহিত এই ভক্তিরস যে কোথাও সুসঙ্গতি লাভ করিতে পারে নাই, একথা বলা যায় না,—তবে অসঙ্গতিও যে স্থানে স্থানে ঘটিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

গিরিশচন্দ্রের পরে অমৃতলাল কিছুদিন তাঁহার 'রসরাজ' রূপে নাট্যের আসরে কিছু কিছু রস পরিবেশন করিয়াছেন,—দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের সুরে কিছুকালের জন্য নাট্য-সাহিত্যে বেশ একটা স্পন্দন আনিয়াছিলেন,—ক্ষিরোদপ্রসাদও পূর্বসূরিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেক নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতেই আমাদের নাটকের রূপ বদলাইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে দেখা দিল সেই বিশ্বগ্রাসী ব্যক্তিপুরুষের লীলা-বৈচিত্র্য,—নাট্য-সাহিত্যও তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইল না। নাটকের এই সুরই পাইয়াছি আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে। এই জন্য দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের তথা-কথিত নাটকগুলি একটি নূতন জাতীয় সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের একটা নিজস্ব চমৎকারিত্ব আছে; কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকগুলি খাঁটি দৃশ্যকাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। যে যে কারণে খাঁটি দৃশ্যকাব্য রচিত হইতে পারে না রবীন্দ্রনাথের ভিতরে সে সকল কারণগুলি ছিল অতি স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের পরে সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়াছে শুধু গল্প-উপন্যাসের যুগ,—অভিনয় ক্ষেত্রে আসিয়াছে শুধু সিনেমার যুগ; সাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চ উভয় ক্ষেত্র হইতেই বিতাড়িত হইয়া বাঙলা নাট্য-সাহিত্য এখন যেন নির্বাসনের পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

বিহারীলাল

ভোরের পাখীর আবির্ভাব দিবসের নবালোকে নব-জাগরণের পূর্বে; কলমুখরিত দিগ্‌দিগন্তে সপ্তবর্ণের বিচিত্র রশ্মিপাতের পূর্বেই সে আবার আপন মনে নীরব হইয়া যায়। সে যখন শেষ রজনীর অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া একটি জীবন্ত ধ্বনির স্পন্দনরূপে আকাশে উড়িয়া যায়, তখন শ্রোতা বেশী থাকে না; অনেকেই আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মোহে সে ধ্বনিকে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারে না,—শুধু দুই একটি প্রভাতচারী রসজ্ঞই প্রভাতের সেই প্রথম স্পন্দনময়-রূপে মুগ্ধ হয়,—সমগ্র দিবসের কোলাহলের ভিতরে প্রভাতের সেই অস্পষ্ট কাকলী তাহাদের অন্তরের মধ্যে মৃদু ঝঙ্কার তুলিতে থাকে। বিহারীলাল বঙ্গ-সাহিত্যের কাব্য-নিকুঞ্জে এই জাতীয় একটি ভোরের পাখী। তাঁহার সুর বহুদূরগামী ছিল না,—তাঁহার কাব্যের রসজ্ঞও খুব বেশী ছিলেন না,—শুধু রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি কয়েকটি নবজাগরণের কবিই তাঁহার নবীন সুরে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সুরের রেশ তাঁহাদের সঙ্গীতের ভিতরে তুলিয়াছিল বিচিত্র ঝঙ্কার। তাই গুণগ্রাহী অক্ষয়কুমার গাহিয়াছেন,—

এসেছিলে শুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি,—
আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিলে ধীরে ধীরে।
ঘুম-ঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্নবাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

কবিবরের ভক্তশিষ্য রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন,—"সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।"

বঙ্গ-সাহিত্যে বিহারীলালের স্থান কোথায় বিচার করিতে গেলে বিহারীলালকে এই 'ভোরের পাখী' ছাড়া অন্য কোন বিশেষণে বিশেষিত করা চলে না। তিনি যে বঙ্গ-সাহিত্যে বা বঙ্গ-কবিতারাজ্যে একটি স্পষ্ট যুগান্তর ঘটাইয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। তিনি শুধু একটি আগতপ্রায় নবযুগের আভাস মাত্র দিয়া গিয়াছিলেন, সে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য রবীন্দ্রনাথ। উদীয়মান নবীন সূর্যের একটি অস্ফুট আভাস দেওয়াই ভোরের পাখীর কাজ, বিহারীলালও ভাস্বরপ্রতিভায় দশদিক্-উদ্ভাসনকারী রবীন্দ্রনাথের আগমনী-বার্তা জানাইয়া কাব্যামোদিগণের দৃষ্টি সেই দিকে ফিরাইয়া গিয়াছেন মাত্র। এ সম্বন্ধে

আচার্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন,—“ইংরেজী সাহিত্যে পোপ কবির আবির্ভাবের পর কবিতা-সাম্রাজ্যে যে একটা পেশাদারী ভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, ক্র্যাব ও কাউপারের আবির্ভাবে সেইটি খণ্ডিত হইল! পরে কীটস্, বায়রণ, শেলী, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এই পেশাদারী ভাবের খণ্ডন ব্যাপারের চূড়ান্ত করিয়া দেন। আমার মনে হয় যে, বঙ্গ কবিতারাজ্যে বিহারীলালের আবির্ভাব কতকটা তদ্রূপ।” এই উক্তিটির ভিতরে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। কিন্তু একটি জিনিস প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা উচিত,—পয়ার ও লাচাড়ীর একঘেয়ে ছন্দে কাব্যের যে একটানা স্রোত বাঙলা সাহিত্য-গাঙে বহিয়া আসিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে বিহারীলালই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, একথা বলা যায় না,—সে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তখনকার বঙ্গ-সরস্বতীর বিদ্রোহী সন্তান মধুসূদন। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতিও এই পেশাদারী ভাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন মুখ্যতঃ এপিক-কবি ছিলেন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির ভিতরেও পাই এপিক এবং লিরিকের একটা সংমিশ্রণ, তাঁহাদের লিরিক সুরটিও স্পষ্ট নহে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে বিহারীলালই সর্ব-প্রথম কবি যাঁহার ধাতটি একেবারেই লিরিক, এবং এই লিরিকের বৈশিষ্ট্যেই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ স্থান। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—“বিহারীলাল তখনকার ইংরেজী ভাষায় নব্য-

শিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনা-পূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবি-দিগের ন্যায় পৌরাণিক উপন্যাসের দিকে গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের মনে নিজের মনের কথা বলিলেন।” এই সুর-স্বাতন্ত্র্যের জন্য অনেকে বিহারীলালকে ইংরেজ কবি ব্লেকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ব্লেকের সময়ে ইংরেজী কবিতায়ও একটা ধীরমন্থর গতি, একটা বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমী আসিয়াছিল। অনেকে মনে করেন, ব্লেক যেমন ইংরেজী সাহিত্যে একটি নূতন সুরে নূতন ঝঙ্কারে তাঁহার বীণা বাজাইয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে বিহারীলালও তদ্রূপ একটি “অপরিচিতপূর্ব্ব মনোমোহন নবীনতায় তাঁহার সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্বচ্ছতরল সরিতের মত তাঁহার ভাষার সহজ হিল্লোল আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।”

কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন, ব্লেকের সময়ে ইংরেজী সাহিত্যে গীতিকবিতার যে অবনতি ঘটিয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিহারীলালের সময়ে বাঙলা-সাহিত্যের গীতি-কবিতায় সে অবনতি ঘটে নাই। “আমাদের গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ-যুগ ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয় নাই। জয়দেব যে গীতিকবিতার প্রবর্ত্তন করেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস আদি বৈষ্ণব-কবিগণ প্রাণ দিয়া যে গীতিকবিতার পুষ্টি-সাধন করেন, সে গীতিকবিতা ত বহু রাষ্ট্রবিপ্লবেও নষ্ট হয় নাই।

বিহারীলালের জন্মিবার পূর্ব্বেই নিধুবাবু, রামবসু, হরু ঠাকুর, শ্রীধর কথক প্রভৃতি কবিগণ যে গীতিকবিতার স্রোতে দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল পেশাদারী কবিতা ছিল না; তাহার অকৃত্রিম সুর ও আন্তরিকতায় বাঙ্গালীর প্রাণের মধ্যে অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ খেলাইয়া যাইত।”

কিন্তু এস্থলে একটু ভাবিবার কথা আছে। সত্যই বাঙলা সাহিত্যে গীতিকবিতা নূতন জিনিস নহে; গীতিকবিতাই বাঙলা-সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যের দরবারে যদি কিছু লইয়া গৌরব করিবার থাকে, তবে তাহা বৈষ্ণব-গীতিকবিতা। কিন্তু এই বৈষ্ণব কবিতার লিরিক সুর ও আধুনিক লিরিক কবিতার সুরের ভিতরে একটু পার্থক্য আছে।

লিরিক কবিতার প্রধান ধর্ম মানুষের নিবিড় রসানুভূতিগুলিকে সে অতি ছোট আয়তনের ভিতরে প্রকাশ করে। ইহা মানুষের অন্তরের বাণী। এ হিসাবে বৈষ্ণব-কবিতা অপূর্ব লিরিক কবিতা। এখানে পাই মানব-হৃদয়ের অফুরন্ত প্রেমানুভূতির অনন্ত বৈচিত্র্যে রসঘন প্রকাশ। কিন্তু লিরিক কবিতার ভিতরে আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা শুধু মানুষের অন্তরেরই প্রকাশ নহে, ইহা বিশেষ করিয়া কবির ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ; তাই ইহা কবির নিজের কথা। বৈষ্ণব-কবিতায় রাধাকৃষ্ণের যবনিকান্তরালে কবির এই

ব্যক্তিপুরুষটি পড়িয়াছে ঢাকা। বৈষ্ণব-কবিতার রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনা যেখানে মানবীয় প্রেমবর্ণনা, সেখানেও কবির অন্তরের স্পর্শ আমরা সোজাসুজি স্পষ্টভাবে লাভ করিতে পারি না,—কবি হৃদয় হইতে হৃদয়ে কথা বলেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতার ভিতরে যেখানে এ লোক ছাড়িয়া নিছক সে-লোকের কথা বলিয়াছেন, সেখানেও তাঁহার ব্যক্তিপুরুষটি চাপা পড়ে নাই—সেখানেও তাঁহার পুরুষীয় অনুভবের সহিত আমাদের পুরুষীয় অনুভবগুলির একটা প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান চলিতেছে। কবিচিত্ত ও পাঠক-চিত্তের ভিতরে এই যে একটা নিবিড় অন্তরঙ্গযোগ, ইহাই আধুনিক লিরিক কবিতার প্রধান লক্ষণ। নানাবিধ সংস্কার বাঁধাধরা রীতিনীতির পশ্চাতে বৈষ্ণবকবিগণ পাঠকের অন্তর হইতে একটু দূরে রহিয়া যান।

তা ছাড়া গীতিকবিতার বৈচিত্র্য ও মাধুর্যও যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির প্রবর্তিত গীতিকবিতার ধারা জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির হাতে নিজস্ব মাধুর্য রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই একই বিষয়-বস্তুর একই প্রকাশ-ভঙ্গির ভিতর দিয়া অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উহা অনেকখানি নিজস্ব মাধুর্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালাগণ সেই বৈষ্ণব-গীতিকবিতার ধারাকেই রক্ষা

করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানে স্থানে উহা বৈচিত্র্য ও নবীনতাহীন বৈষ্ণব কবিতারই কপচানি হইয়া পড়িয়াছে।

বিহারীলাল বাঙলা-সাহিত্যে এই গীতি-কবিতার ধারার ভিতরে একটি নবীন সুর আনিলেন, এই খানেই আমরা সর্বপ্রথমে কবির অন্তর্লোকের সহজ এবং স্পষ্ট স্পর্শলাভ করিলাম। রবীন্দ্রনাথ এই সুরের শ্রেষ্ঠ গায়ক; তাঁহার কণ্ঠে যে সুর বৈচিত্র্যে ও নিজস্ব মাধুর্যে জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহারই পূর্বাভাস পাইলাম বিহারীলালের ভিতরে। ইহাই বঙ্গ-সাহিত্যে বিহারী-লালের প্রকৃত স্থান। বাস্তবিকই বিহারীলাল যে একটি সর্বতোমুখি-প্রতিভাশালী কবি ছিলেন একথা বলা চলে না। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ,—তবে সেই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ভিতরে তিনিই সর্বপ্রথম কবি, এবং তখনকার দিনে তিনি 'আপন অধিকারের ভিতরে রাজা' ছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য 'লিরিক্' বিশেষণটি বিহারীলালের কাব্য সম্বন্ধে অতি সুপ্রযুক্ত। 'লিরিক্' কথাটি lyre কথাটি হইতে উৎপন্ন;—lyre বীণাজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। যে সকল কবিতা আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে এমন যে তাহাকে শুধু বীণাসহযোগে গান করা চলে সে গুলিই 'লিরিক্'—আমাদের গীতিকবিতা। বিহারীলালের সকল কাব্যই সুবিশুদ্ধ গীতিকবিতা; মনো-বীণার নিভৃত ঝঙ্কারেই তাহাদের জন্ম। এই বিশুদ্ধ গীতি-

কবিতার ভিতরে আবার একটা বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক্ দৃষ্টিভঙ্গিই বিহারীলালের বৈশিষ্ট্য। 'রোম্যান্টিক্' কথাটি আমরা ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া এমন উদ্ভট কথা যেন আমরা মনে কখনও স্থান না দিই যে, এদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্বে এদেশের সাহিত্যে 'রোম্যান্টিক'তা বলিয়া কোন জিনিস ছিল না,—বিলাতি পণ্যজাহাজেই তাহার আমদানী। 'রোম্যান্টিক'তা কাব্যের একটা মূলধর্ম—সুতরাং সকল দেশের এবং সকল যুগের সাহিত্যেই তাহার অল্প বিস্তর সন্ধান পাওয়া যাইবে। তবে এই জাতীয় কাব্যধর্মের সমধিক বিকাশ আধুনিক যুগে, এই জন্যই ইহাকে আধুনিক যুগের সামগ্রী বলিয়া মনে হয়।

আমাদের প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্যের ভিতরে রোম্যান্টিক্ উপাদান অনেকখানে ছড়াইয়া আছে,—বৈষ্ণব কবিতাগুলি অধিকাংশই মূলতঃ রোম্যান্টিক্। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি 'ক্লাসিক' আদর্শে কাব্যরচনা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে বেশ রোম্যান্টিক্ হইয়া উঠিয়াছেন; নবীন সেনের ত কথাই নাই। কিন্তু তথাপি রঙ্গলাল্-মধু-হেম-নবীন প্রভৃতি লইয়া যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে আমরা 'রোম্যান্টিক্' যুগ বলিতে পারি না, একটা অর্ধক্লাসিক যুগ বলিতে পারি। কাব্যরচনায় ক্লাসিক আদর্শ গ্রহণ করিলেও, তাঁহাদের মনে ছিল রোম্যান্টিকতার রেশ। ইংরেজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর

'বুদ্ধিযুগে'র পরে উনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াছিল রোম্যান্টিক যুগ। আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা-সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল একটা বীরযুগের; শুধু কাব্যে নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও রহিয়াছে এই বীরযুগের প্রকাশ। এই বীরত্বের সহিত মিশ্রণ ছিল বুদ্ধির; হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তাহার বহুল পরিচয় এখানে ওখানে ছড়াইয়া আছে। এই বুদ্ধি-মিশ্রিত বীরযুগের পরেই আসিল কাব্যের ক্ষেত্রে একটা নিকুঞ্জের আবেষ্টনী, তাহাতে একমনে বীণার সুরে গান ধরিলেন বিহারীলাল। বাঙলা-সাহিত্যে এই যুগপরিবর্তন অতি স্বাভাবিকই হইয়াছে।

বিহারীলালের কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে বাঙলা-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবের দানা বাঁধিয়া উঠিবার যুগে; আমরা অনেকখানি পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের আদর্শেই এ যুগের কাব্যকে বিচার করি। সুতরাং বিহারীলালের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে সমধর্মী পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমালোচনায় বহু ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে একটু স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া দরকার।

প্রথমেই আলোচ্য 'রোম্যান্টিকতা'র তাৎপর্য। একটু বিসদৃশ হইলেও আমি পাশ্চাত্ত্য শব্দটির উত্তরই প্রাচ্য বিভক্তি ব্যবহার করিয়া শব্দটিকে বাঙলায় চালাইয়া লইলাম; কারণ, শব্দটির সহিত বহু যুগের ইতিহাস জড়িত হইয়া

আছে, তাই তাহার অনুবাদ ঠিক হয় না ; যে অনুবাদ করা যায় তাহা দ্বারা অযথা গোলমাল সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

রোম্যান্টিকতার কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য তাৎপর্য নির্দেশ করা কঠিন ; সে স্বরূপেই এমন অস্পষ্ট, আমাদের মনের আলো-আঁধারি এমন একটি রহস্যময় গোধূলি লগ্নে তাহার জন্ম যে, আমাদের তীব্র বুদ্ধির মধ্যাহ্ন দিবালোকে তাহাকে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার স্বরূপবৈলক্ষণ্য ঘটে। এই জন্যই রোম্যান্টিকতা বলিতে আমরা যে কি বুঝি, কি না বুঝি, নিজেরাই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না, এবং ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরে ঐকমত্যও দুর্লভ। কেহ কেহ হয়ত স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া কতগুলি বহিরঙ্গ লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; কেহ কেহ আবার রোম্যান্টিকতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিজেরাই রোম্যান্টিক্ হইয়া উঠিয়াছেন।

রোম্যান্টিক্ সাহিত্যকে বুঝিতে হইলে আমরা সাধারণতঃ ক্ল্যাসিক সাহিত্যের তুলনায় তাহার স্বরূপ নির্ধারণ করি। অটুট নিয়মানুবর্তিতা, সৌষম্য, সুসঙ্গতি, প্রত্যেক অংশের সহিত সমগ্রের একটা কঠোর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ এবং একটা সমগ্রতা ও সুস্পষ্টতাই 'ক্ল্যাসিকাল' সাহিত্যের লক্ষণ। ক্ল্যাসিকাল শিল্পকলার ন্যায় ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যও ভাস্কর্যধর্মী, রোম্যান্টিক্ সাহিত্য অনেকখানিই চিত্রধর্মী। ভাস্কর্যের ভিতরে সমস্ত জিনিসটি প্রত্যক্ষবৎ বহিরিন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য—তাহার সৌন্দর্য সন্দেহাতীতরূপে সুস্পষ্ট,—তাহার প্রত্যেকটি অবয়বের পরিমাণ এবং সংস্থান বিশুদ্ধ এবং নিখুঁত,—সকল অংশের সহিত সকল অংশ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত; প্রত্যেকটি অংশ নিপুণ এবং বিশুদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া একটা সমগ্রতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে ও সেই সমগ্রতার ভিতরেই আত্মবিসর্জন করিয়াছে। এখানে যাহা কিছু পাইবার সবটাই বাহির হইতে পাইতেছি, নিজেদের কল্পনাদ্বারা কিছু গড়িয়া লইতে হয় না। অন্যদিকে চিত্রের ভিতরে আমাদের পাওয়া অংশের চেয়ে নিজেদের মনে কল্পনাদ্বারা গড়িয়া লইবার অংশ কিছু কম নহে। সেখানে পাই—হয়ত কিছু রেখা—কিছু রঙ—অসম্পূর্ণ কয়েকটি অবয়ব—আর তাহার সঙ্গে পাই একটা গভীর আভাস—যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মন কল্পনার অশ্বে চাপিয়া অনেক দিক ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে এবং অনেক জিনিস নিজে গড়িয়া লইতে পারে। বাহিরের পটভূমিকায় যাহা থাকে অপূর্ণ, কল্পনার রঙেরসে তাহাকে আমরা পূর্ণ করিয়া লই। ক্ল্যাসিকাল এবং রোম্যান্টিক সাহিত্যের তফাৎও অনেকখানি এই রকমের।

ক্লাসিকাল সৌন্দর্যের সৌষম্য এবং সুস্পষ্টতায় ইহা সযত্নে রচিত উদ্যানের সহিত তুলনীয়। উদ্যান সুন্দর, কিন্তু সে সৌন্দর্য অনেকখানিই চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এখানে প্রতিটি তরুলতার সার—প্রতিটি কুঞ্জ একটি বিশেষ পরিকল্পনায়

রচিত—প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের মিল রহিয়াছে—কিছুই এবড়ো-খেবড়ো নহে। কিন্তু একটি অপরিচিত পার্বত্যবনভূমি যখন আমাদের নিকট সুন্দর লাগে তখন সে শুধু মাত্র সুন্দর নহে, সে সৌন্দর্যবোধের সহিত মিলিত হইয়া থাকে একটা অদ্ভুতরস। এ সৌন্দর্য মনকে একটা সুস্পষ্ট সুষমায় দোলা দেয় না,—পদে পদে বিস্ময়ে মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া তোলে। দুর্গম ঝোঁপ-ঝাড়—মাথার উপরে উঠিয়া গিয়াছে মাথায় মাথায় ঠোকা-ঠুকি করা শালবন,—এখানে একটা ঝাকড়া-ঝাকড়া ফুল গাছ—ওখানে পরস্পর এবড়ো-খেবড়ো ভাবে জড়িত কতগুলি শিলা বাহিয়া চলিয়া গিয়াছে একটা অপরিচিত লতা অপরিচিত ভঙ্গিতে; চলিতে চলিতে হঠাৎ কোথায় আসিয়া দেখা হইল একটা ঝরণার অদ্ভুত আঁকা-বাঁকা স্রোতের সঙ্গে—তারপরে সম্মুখের অপরিজ্ঞাত পথ কোন্ অপরিচিত দৃশ্যের দিকে লইয়া যাইবে কে জানে! সকল সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া প্রধান হইয়া উঠিতেছে একটা অজানার বিস্ময়—সৌন্দর্যের সহিত এই অজানা বিস্ময়ের যোগই রোম্যান্টিকতার প্রাণবস্তু। এই অজানার রহস্যকে লাভ করিতে সর্বদাই যে পার্বত্য দুর্গমতার প্রয়োজন হয় তাহা নহে,—আমাদের জীবনের চারিপাশে ছড়াইয়া রহিয়াছে এই অজানা রহস্য। দিবসের প্রখর আলোকে আমারই বাতায়নের সম্মুখে পত্রপুষ্পে শোভিত গাছটি

দেখিয়া সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলাম,—তাহার শাখাস্থিত পাখীটি অতি স্পষ্টভাবে মনকে নাড়া দিয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই সুপরিচিত বৃক্ষটিই একটা অপরিচয়ের যবনিকার অন্তরালে একটা বিস্ময়ান্বিত রহস্যের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়; তাহার প্রতিটি শাখার দোলায়—প্রতিটি পত্রের সঞ্চরণে একটা অজানা মোহের আবরণ সৃষ্টি করে; তাহার ডালে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া পাখা ঝাপটাইতেছে যে একটা পাখী—তাহার প্রতিটি ডানা-ঝাপটায় বাতাসে তুলিতেছে বিস্ময়ের ঢেউ। মানুষের মনের উপরে অস্পষ্টতার একটা অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে—সে উদ্রিক্ত করে অসীম কৌতূহল, সেই কৌতূহল আপনার ভিতরেই মন চরিতার্থ করিতে চায় কল্পনার রঙীন জালের পরে জাল বুনিয়া। এই জন্য দূরত্বের একটা প্রকাণ্ড মোহ রহিয়াছে, কারণ সে পরিচিতকে অপরিচিত করিয়া তোলে—মাঝখানে থাকিয়া যায় কল্পনার প্রশস্ত লীলাভূমি। নদীর এপার সুন্দর—ওপার শুধু সুন্দর নয়—সে সৌন্দর্য কেবলই ভাবায়, অস্পষ্ট যেটুকু দেখিতেছি তাহার পশ্চাতে যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে একটা অজানার রহস্য।

ক্ল্যাসিক সাহিত্য এবং রোম্যাণ্টিক্ সাহিত্য আমরা সাধারণতঃ পরস্পর প্রতিযোগী বলিয়াই জানি; কিন্তু এ্যাবারক্রম্বে বলেন,—তাহাদের ভিতরে কোনও বিরোধ নাই; একই কাব্যের ভিতরেও তাহারা মিলিয়া মিশিয়া

থাকিতে পারে। হোমারের 'ইলিয়াড্' বা 'ওডেসি' এবং মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্'এর মাঝে মাঝেও রোম্যান্টিক্ উপাদান একেবারে দুর্লভ নয়। কালিদাস ক্ল্যাসিকাল যুগের কবি,—কিন্তু 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' স্থানে স্থানে অপূর্ব রোম্যান্টিক্। আবার 'মেঘদূতে'র ন্যায় অপূর্ব রোম্যান্টিক্ কাব্যের ভিতরে তিনি যেখানে যক্ষের অচেতন মেঘকে দূতরূপে বরণ করিবার ব্যাখ্যাস্বরূপে বলিতে লাগিলেন,—

ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতি-কৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ *

তখন বেশ বোঝা যাইতেছে, কবির 'ক্ল্যাসিক্যাল' মনটি এখানে রোম্যান্টিক্ যবনিকার আড়াল হইতে ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিতেছে। এ্যাবারক্রম্বে বলেন, ক্ল্যাসিক ধর্ম হইল অটুট স্বাস্থ্য,—আর রোম্যান্টিক্ ধর্ম হইল একটা ব্যাধি,—

---

* কোথায় বা ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল এবং মরুতের সন্নিপাতরূপ মেঘ,—আর কোথায় বা কার্যকরণে সমর্থ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রাণিগণদ্বারা প্রেরণীয় বার্তা! ঔৎসুক্যবশতঃ এ-কথার গণনা না করিয়াই যক্ষ মেঘের কাছে যাচ্ঞা করিয়াছিল; কারণ কামার্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃই চেতনাচেতন নিরূপণে কৃপণ, অর্থাৎ অসমর্থ।

যে ব্যাধি মানুষের মনের ভিতরে আনে মাতালের মত একটা নেশা—একটা উন্মাদনা।

এ্যাবারক্রম্বের মতে রোম্যান্টিক্ ধর্মের সত্যকার প্রতিযোগী হইল বাস্তবধর্ম। সাহিত্যিকগণের বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার ভিতরেই থাকে মৌলিক দুইটি ভেদ; একদলের মন খুশী হয় বাহিরের দিকে তাকাইয়া—আর একদলের মন খুশী হয় বাহিরকে অবলম্বন করিয়া অন্তরের দিকে তাকাইয়া। একদল বহির্বস্তু বা ঘটনার ভিতরে তাহার বাহিরের রূপকে বড় করিয়া দেখেন এবং তাহার ভিতরেই অনন্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আবিষ্কার করিয়া তাহাকে যথাসম্ভব যথাস্থিত ভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন; ইঁহারাই সাহিত্যে বাস্তবপন্থীর দল। অপর দলের নিকট কোন বস্তু বা ঘটনার বাহিরের রূপ একটা অবলম্বন মাত্র—তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মন ফিরিয়া যায় আপন রাজ্যে এবং সেখানে গিয়া সেই বস্তু বা ঘটনার বাহিরের রূপকে অবলম্বন করিয়া উর্ণনাভের ন্যায় নিজেদের অন্তরের ভিতরেই তাঁহারা শুধু কল্পনায় রহস্যের জাল বুনিতে থাকেন; সেই কল্পনার অপরূপ জালে মণ্ডিত হইয়া বাহিরের বস্তু বা ঘটনাও হইয়া ওঠে একটা অসীম রহস্যের প্রতীক মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাহিত্যের রোম্যান্টিকতা কোন বস্তুধর্ম নহে, উহা অনেকখানিই কবির মনোধর্ম। যাহার মনে নেশা জমিয়া ওঠে নাই—উর্ণনাভের

জালবুনানি নাই—সে অস্পষ্টকেও স্পষ্ট করিয়া ফেলিবে, অজানাকেও জানিয়া ফেলিবে, দূরকে নিকটে আনিয়া ফেলিবে ; আর যেখানে নেশা জমিয়া উঠিয়াছে উন্মত্ত ব্যাধি-গ্রস্তের ন্যায়, সেখানে যাহা স্পষ্টতম তাহার উপরেও কেবলই পড়িতে থাকে আবছায়া রহস্যের ঢাকা,—জানা যায় অজানা হইয়া—নিকট চলিয়া যায় সুদূরের পরপারে। রোম্যান্টিকের কাজ-কারবার তাই বাহিরের জগৎ লইয়া নহে, বাহিরের জগৎ লইয়া খুশী হইতে না পারিয়া সে ফিরিয়া আসে মনের রাজ্যে—সেখানে নিজের মনের সঞ্চিত সম্পদ ঢালিয়া সে বাহিরের জগৎকে নূতন করিয়া বাস্তবের অপূর্ণতাকে অন্তরের প্রাচুর্যে পূর্ণ করিয়া লয়। বাহির হইতে এইরূপে অন্তরে ফিরিয়া আসা এবং অন্তর হইতে রহস্যের জাল বুনিয়া বহির্বস্তুর উপরে তাহার আরোপ, ইহাই যথার্থ রোম্যান্টিক্ ধর্ম।

এই প্রসঙ্গে হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে, অন্তর হইতে রং ঢালিয়া বহির্বস্তুর যে নবরূপায়ণ তাহাই যদি রোম্যান্টিকতার মূল হয় তাহা হইলে আদর্শবাদ (Idealism) এবং রোম্যান্টিক্‌বাদের ভিতরে তফাৎ কোথায় ? এ্যাবারক্রম্বে অবশ্য তাঁহার আলোচনায় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলেন নাই ; তবে এ প্রশ্নের জবাব এই বলিয়া মনে হয়, আদর্শবাদের বেলায় আমরা আমাদের মনের কতগুলি বিশেষ ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া বহির্বস্তুকে একটা বিশেষ রূপে রূপান্তরিত

করি। সেখানে বস্তু আপনাতেই আপনি যাহা আছে তাহাতে খুশী না হইয়া আমাদের মনের আদর্শ অনুসারে তাহার যাহা হওয়া উচিত সেই রূপটির দিকেই আমাদের দৃষ্টি থাকে বেশী। কিন্তু রোম্যান্টিকতার বেলায় আমরা যে বস্তুকে রূপান্তরিত করি, সেখানে তাহার গায়ে রহস্যের কুহেলী ছাড়া আর কিছুই মাখি না। বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে অনন্ত বিস্ময়—অসীম রহস্য জমা হইয়া থাকে আমাদের মনে; সেই বিস্ময়—সেই রহস্যের ছোঁয়া লাগাইয়া আমরা বস্তুর বাস্তব রূপকে ঢাকিয়া ফেলি। সেখানে জাগিয়া ওঠে একটা কল্পনার রহস্য মূর্তি।

রোম্যান্টিকতা সম্বন্ধে উপরিউক্ত মতবাদ সকলে স্বীকার করিবেন না। বস্তুতঃ রোম্যান্টিক্ সাহিত্য বলিয়া আমরা যে-সকল সাহিত্যকে গ্রহণ করি, তাহার পরিধি এত বিস্তৃত এবং তাহার পরিধি ও প্রকৃতি উভয়ই এত অস্পষ্ট যে এইরূপ একটি স্পষ্ট মতবাদের দ্বারা তাহার সবটুকু ব্যাখ্যা করা যায় না। তথাপি আমি বিশেষ ভাবে এই মতটি লইয়াই আলোচনা করিয়াছি এইজন্য যে, আমাদের আলোচ্য কবি বিহারীলালের রোম্যান্টিকতার স্বরূপ সম্বন্ধে এই মতটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিহারীলাল ছিলেন সেই জাতীয় কবি যিনি বাহিরের বিশ্বের পানে তাকাইয়া তাহার যথাস্থিত রূপকে স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া কখনই খুশী হইতে পারেন নাই। তিনি ভাবুক কবি, আত্মভাবে সর্বদা মশ্গুল্

থাকিতেন। রোম্যান্টিক্ কবির এই আত্মভাব বলিতে আমরা কি বুঝি? এই আত্মভাব মূলতঃ বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে একটা গভীর রহস্যবোধ। কবি এই রহস্যকেই বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, একটা মায়াশক্তির ন্যায় এই বিশ্বব্যাপী রহস্য সমগ্র সৃষ্টিকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের অন্তর্নিহিত রহস্যের এই মায়াশক্তি না থাকিলে বিশ্বসৃষ্টির আমাদের নিকটে কোন অর্থ থাকিত না। এই রহস্যময়ীই সৌন্দর্যময়ী,—অন্তরে বাহিরে বহুবিচিত্র রূপে প্রতিভাত হইতেছে কান্তিরূপিণী সেই মায়া;—একদিকে যেমন বিশ্বছাড়া এই কান্তি নাই—"বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে, —অনুভবে আসে না",—অন্যদিকে আবার এই রহস্যময়ী—এই কান্তিময়ী ব্যতীতও বিশ্ব হয় না,—

তেমনি, এ বিশ্ব থেকে কান্তিখানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্বপানে চাও— কিছু কি দেখিতে পাও?

বিশ্বের অন্তর্নিহিতা এই কান্তিময়ী রহস্যময়ীকে কবি বুদ্ধির প্রখর আলোতে আনিয়া স্পষ্ট করিয়া দেখিতে এবং বুঝিতে চান নাই, ইহাই রোম্যান্টিক্ কবির চরম লক্ষণ। তিনি যে বিশ্বের রহস্যজালকে ভেদ করিতে পারেন না তাহা নহে,—তিনি তাহা চানই না। একটা ঘন রহস্যের আবরণে বিশ্বের অন্তর্নিহিতা দেবীকে অবগুণ্ঠিতা রাখিয়া একটু দূর হইতে অন্তরের ক্ষীণ দীপশিখা এবং ধূপের ধোঁয়ার আরতিতে শুধু তাহাকে অসীম মহিমময়ী করিয়া মুগ্ধ হইবার চেষ্টা—

ইহাই তাঁহার সাধনা। তাই কবি বলিতেছেন,—

রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকা ভাল, বুঝিলেই নেবে আলো,
সে মহা-প্রলয় পথে ভুলে কভু ধাব না।

রহস্য বিশ্বের প্রাণ, রহস্যই স্ফূর্ত্তিমান্,
... ...
রহস্যই মনোলোভা— বিশ্বের সৌন্দর্য্য শোভা।
সুখের পূর্ণিমা রাতি, চাঁদের মধুর ভাতি,
ফুলের প্রফুল্ল হাসি, ঊষার কিরণ,
সকলি কে যেন এক সাধের স্বপন!

রহস্য মাধুরী মালা—রহস্য রূপের ডালা
রহস্য স্বপন-বালা
খেলা করে মাথার ভিতরে; চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে।

রহস্য, রহস্যময়— রহস্যে মগন রয়।
খুঁজিয়া না পেয়ে তাকে সবে 'মায়া' বোলে ডাকে।
আদরের নাম তাঁর বিশ্ববিমোহিনী। (সাধের আসন)

বিশ্বসৃষ্টি ভরিয়া কবি এই এক অনন্ত রহস্যেরই লীলা দেখিয়াছেন, সেই রহস্যেই তাঁহার মনপ্রাণ সর্বদা ছিল ভরপুর—চোখে লাগিয়াছিল রহস্যের নেশা। তাই কবি চোখ মেলিয়া বিশ্বের যে দিকেই তাকাইয়াছেন—মানুষ,

পশু. পাখী, তরুলতা, নদনদী, বন-উপবন—সকলকেই তিনি দেখিয়াছেন এই রহস্যের লীলা-বিভূতিরূপে। অন্তরের রহস্য দ্বারা বিরাট বিশ্বকে আবৃত করিয়া আপনার ভিতরেই কবি নিরন্তর মাতিয়া থাকিতেন।

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে থাকি থাকি সুখী হ'য়ে

... ...

জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান। (সারদা-মঙ্গল)

এই 'হৃদয়-প্রতিমা'র কবি সন্ধান পাইয়াছেন বিশ্বভুবনের ভিতর দিয়া অনন্ত আভাসে—ইঙ্গিতে। চোখের দ্বারা তাহার দেখা পাওয়া যায় না,—তাহার সন্ধান মেলে অন্তরের আলোতে।—

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে খেলা করে রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির রাশি ভুবন ভরিছে আসি,—
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার !

বিচিত্র এ মত্ত-দশা ভাব-ভরে যোগে বসা ;
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে !

কায়াহীন মহাছায়া বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনী-রূপিণী,

অসীম কানন-তল ব্যেপে আছে অবিরল ;
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী !

অন্তরে জ্বলিতেছে আলো—বাহিরে অন্ধকার,—অন্তরের আলোদ্বারা বাহিরের অন্ধকার দূর না করিলে অন্তরে বাহিরে সেই 'কায়াহীন মহাছায়া বিশ্ববিমোহিনী মায়া'র সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই যে বিশ্বব্যাপিনী কান্তমযী এবং রহস্যময়ী মায়ামূর্তি, যিনি কবির অন্তরে আসিয়া ধরা দিয়াছেন 'হৃদয়-প্রতিমা'-রূপে, ইনিই কবির বহুবন্দিতা 'সারদা',—ইনিই কবির কাব্যলক্ষ্মী। সমগ্র কাব্য-সাধনার ভিতর দিয়া কবি ইঁহারই ধ্যান—ইঁহারই আরাধনা করিয়াছেন। কবির 'সারদা-মঙ্গল' কাব্যখানিই যে শুধু 'সারদা-মঙ্গল' তাহা নহে, কবির প্রায় সব কাব্যই 'সারদা-মঙ্গল'। একটি 'কায়াহীন বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া'র ন্যায় এই দেবী একদিকে যেমন বহির্বিশ্বে রূপে রসে, প্রেমে মাধুর্যে—নিজেকে বহুবৈচিত্র্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি সৌন্দর্যে, প্রেমে, জ্ঞানে তিনি 'অন্তরব্যাপিনী' হইয়া যোগমগ্ন কবির বিহ্বল মানসে বিরাজমানা।

ভাব-ভরে মাতোয়ারা যেন পাগলিনীপারা,
আহ্লাদে আপনহারা মুগুধা মোহিনী,
নিশান্তের শুকতারা, চাঁদের সুধার ধারা,
মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিণী।

এই 'আনন্দ-রূপিণী মানস-মরালী'কে লইয়াই চলিয়াছে কবির নিরন্তর নিভৃত লীলা। যুগে যুগে সকল সৌন্দর্যের পূজারী—সকল কবি এই 'ভুবন-মোহিনী'র রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, অন্তরে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কাব্যে তাঁহারই বন্দনা করিয়াছেন। বাহিরের জগতে যিনি থাকেন সৌন্দর্যরূপিণী—প্রেমরূপিণী, অন্তরের ভিতরে একটা রস-প্লাবনের ভিতর দিয়া তিনি নিজেকে রূপান্তরিত করেন বাণীমূর্তিতে; সৌন্দর্য ও প্রেমরূপিণী সারদার বাণীমূর্তিতে প্রকাশই কবির কাব্যসৃষ্টি। তাই 'সারদা-মঙ্গলে'র প্রথম সর্গের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই, যিনি ছিলেন সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি ঊষারাণী, পরমুহূর্তে তিনিই দেখা দিলেন বীণাপাণি বাণীমূর্তিতে। কাব্যে বাণীমূর্তিতেই সর্বদা সৌন্দর্যের ও প্রেমের প্রকাশ, তাই সারদার ভিতরে লক্ষ্মী, উর্বশী এবং সরস্বতী এক হইয়া গিয়াছে।

বিহারীলালের কাব্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের ভিতরে কোনও তফাৎ নাই, কারণ উভয়ই মূলতঃ মোহিনী রহস্যময়ী সারদার মায়াস্পর্শজাত। নারী যে নরের এতখানি প্রিয় তাহার কারণ, সারদার সৌন্দর্য-মাধুর্য নারীমূর্তির ভিতর দিয়া একটি বিশেষ প্রকাশ লাভ করিয়াছে—এবং সেই বিশেষ প্রকাশের যে একটা বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে, তাহাকেই আমরা বলি প্রেম। 'সাধের আসনে'র ভিতরে কবি বলিয়াছেন যে, নারীর প্রেমময়ী মূর্তির ভিতরেই প্রেমময়ী সারদার প্রকাশ।

চলেছে যুবতী সতী আলো কোরে বসুমতী,
স্নানান্তে প্রসন্নমুখী, বিগলিত কেশপাশ,
প্রাণপতি দরশনে আনন্দ ধরে না মনে
বিকচ আননে কিবা মৃদুল মধুর হাস !

এই জন্যই অন্যস্থানে দেখিতে পাই—

আলুথালু হয়ে প্রিয়া আছে সুখে ঘুমাইয়া,
মুক্তদ্বার বাতায়ন, ঝুরু ঝুরু সমীরণ ;
চাঁদের মধুর হাসি আননে পড়েছে আসি
বিগলিত কুন্তল কি মধুর চঞ্চল !
মধুর মূরতি দেবী কি মধুর অচেতন !
নিমীলিত নেত্র দু'টি যেন ধ্যানে নিমগন !

এই প্রিয়ার দিকে তাকাইয়া কবি চিনিতে পারিলেন, সারদাই প্রিয়ার রূপ ধরিয়া আজ অবনীতে অবতীর্ণা ; তাই কবি বলিতেছেন,—

তোমার মূরতি ধোরে কে এসেছে মোর ঘরে ?
কে তুমি সেজেছ নারী ? চিনেও চিনিতে নারি ;
উদার লাবণ্যে তব ভরিয়া রয়েছে ভব ;
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি, হৃদ্‌পদ্মে সরস্বতী,
প্রেম, স্নেহ ভক্তিভাবে দেখি অনিবার !
প্রেয়সী আমার !
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার !

আমাদের ঘরে ঘরে রহিয়াছে যত সৌন্দর্যময়ী, প্রেমময়ী এবং রসময়ী নারী তাহারা যে সারদারই সৌন্দর্যময়, মাধুর্য্যময়

প্রকাশ, এই বিশ্বাসই নারীকে কবির চোখে অনন্ত মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। কবির চোখে নারী তাই—

শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী ;
নয়নে কমলা করেন নিবাস
আননে কোমলা ভারতী সতী।
... ...
সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-নীল-মৃণালিণী !
কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী ?

এই 'নারী-বন্দনা'তেই কবি বলিয়াছেন,—

হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা ;
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ,
ভাবে গদগদ মানস খোলা।

নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে
রাধা রাধা ব'লে বাজান বাঁশী।

মহাদেবের উমা এবং কৃষ্ণের রাধার ভিতর দিয়া যে সারদার প্রকাশ, আমাদের গৃহবাসিনী প্রিয়া সেই সারদারই প্রকাশ।

কবি তাঁহার প্রিয়াকে এইরূপ স্বর্গীয় সুষমায় মহিমান্বিত করিলেও সে প্রিয়া একেবারে অশরীরী কল্পনামাত্র নহে—

ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে ;
জ্যো'স্নার আলোক আসি ফুটেছে অধরে।
শাদা শাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা-দেলা ভুলি,
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে,
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে।

এই আলুথালু কুন্তলে নিদ্রিত প্রিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

আহা এই মুখখানি— প্রেম মাখা মুখখানি—
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি কে দিল আমায় !
কোথায় রাখিব বল, ত্রিভুবনে নাহি স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায় !

সদাই দেখিরে ভাই, তবু যেন দেখি নাই,
যেন পূর্ব্ব-জন্ম-কথা জাগে মনে মনে !
অতি দূরে দিগন্তরে কে যেন কাতরস্বরে
কেঁদে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে !

উঠ প্রেয়সী আমার, উঠ প্রেয়সী আমার,
হৃদয়-ভূষণ কত যতনের হার !
হেরে তব চন্দ্রানন যেন পাই ত্রিভুবন,
অন্তরে উথলি উঠে আনন্দ অপার !

প্রতিদিন উঠি' ভোরে আগে আমি দেখি তোরে,
মন প্রাণ ভরি ভরি সাধে করি দরশন !
বিমল আননে তোর জাগিছে মূরতি মোর,
ঘুমন্ত নয়ন দু'টি যেন ধ্যানে নিমগন !

তোমার পবিত্র কায়া, প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া ভালবেসে সুখী হই !
ভালবাসি নারী-নরে, ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই।

উঠ প্রেয়সী আমার, উঠ প্রেয়সি আমার,
জীবন-জুড়ান ধন হৃদি-ফুলহার !
উঠ প্রেয়সী আমার !

মধুর মূরতি তব ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে ও মুখশশী জাগে অনিবার।

... ...

ওই চাঁদ অস্ত যায়— বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান !
হিমেল্ হিমেল্ বায়, হিমে চুল ভিজে যায়,
শিশির মুকুতা জালে ভিজেছে বয়ান ;
উঠ, প্রেয়সী আমার, মেল মলিন-নয়ান ! (শরৎকাল)

এই 'যুবতী সতী'র ভিতর দিয়াই সারদা মর্ত্যে বিগ্রহবতী।

নর-নারীর চিরন্তনকালের অনন্ত প্রেম সারদারই লীলা-স্পন্দন মাত্র। ক্ষণস্থায়ী জীবনের পানে তাকাইয়া কবির মনে ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ জাগিয়াছে,—এত প্রেম, এত স্নেহ, দয়া, মায়া—ইহা কি সবই ভুল, সবই মিথ্যা ?

তবে কি সকলই ভুল ? নাই কি প্রেমের মূল ?
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার ?
মন কেন রসে ভাসে— প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার ॥ (সারদা-মঙ্গল)

ইহার জবাবে কবি নন্দন-নিকুঞ্জে কাম ও রতির অনাদি প্রেম-লীলার দৃশ্যটি আঁকিয়া বলিলেন, প্রেম যদি ভুল হয় তবে সে জীবনেরই ভুল ; এই ভুল—এই মায়াদ্বারাই মানবজীবন—তথা বিশ্বজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে ; এ ভুলের নেশা রহিয়াছে বিশ্বসৃষ্টির অন্তস্তলে—সেখানে বসিয়া রহিয়াছেন অনন্ত মায়ারূপিণী অনন্ত রহস্যময়ী দেবী যোগেশ্বরী সারদা !

এ ভুল প্রাণের ভুল, মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী ;
এ এক নেশার ভুল, অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী ! (সারদা-মঙ্গল)

অন্যত্র কবি বলিতেছেন,—

জ্যোতির প্রবাহ মাঝে বিশ্ববিমোহিনী রাজে,
কে তুমি লাবণ্য লতা মূর্ত্তি মধুরিমা !

মৃদু মৃদু হাসি হাসি বিলাও অমৃত-রাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা ! (সারদা-মঙ্গল)

জগতের সকল সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া—সকল প্রেমের ভিতর দিয়া 'মায়ার মোহিনী মেয়ে' সারদা আমাদের মনের মুকুরে ছায়ার মত প্রবেশ করিয়া নিত্য খেলিতেছে কি খেলা !

বসন্তের বনবালা ঘুমের রূপের ডালা
মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপন সুন্দরী !
মনের মুকুর-তলে পশিয়ে ছায়ার ছলে
কর কত লীলা-খেলা !—কতই লহরী ! (ঐ)

বিশ্বনিখিলের মূলরহস্য সৌন্দর্যরূপিণী, প্রেমরূপিণী এবং বাণীরূপে অন্তর উদ্ভাসনকারিণী এই সারদা যুগে যুগে আবির্ভূতা হইয়াছেন ভক্তকবির সম্মুখে। আদিকবি বাল্মীকি মুনির যে প্রথম কবিত্ব লাভ তাহা আর কিছুই নহে, হৃদয়ে এই সারদার প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ। 'সারদা-মঙ্গলে' আদিকবির এই প্রথম কবিত্ব লাভের দৃশ্যটি অপূর্ব। হিমাদ্রির শিখর সহসা আলো করিয়া মহর্ষির পুণ্যতপোবন অপরূপ প্রভাতজ্যোতিতে ভরিয়া গেল। স্বচ্ছপ্রবাহিণী নির্জন তমসার তীরে 'ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।' যখন ব্যাধের শরে বৃক্ষশাখা হইতে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি আহত হইয়া নিম্নে পড়িল তখন,—

ক্রৌঞ্চী প্রিয়সহচরে ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে !

চক্ষে করি দরশন জড়িমা জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;
সহসা ললাট-ভাগে জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে ।

এই নীলনবঘনে বিজলীর ন্যায় কবির চিত্তে বেদনার নীলনব-ঘনে যে জ্যোতির্ময়ী বালিকার আবির্ভাব ইনিই কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা ! তখন—

চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়, সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে !

কবির ধ্যানে লব্ধ সেই মূর্তিই কাব্যরচনার কালে কবির হৃদয় হইতে নামিয়া আসিয়া জগতের ভিতরে নিজেকে স্থাপন করে ; নিজের অন্তরের দেবীকেই কবি বাহিরে প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হন,—বাহিরের জগৎ লইয়া যখন আমরা কাব্য রচনা করি তখন আমরা জানি না যে, বহির্বিশ্বকে অবলম্বন করিয়া আমাদের অন্তর্লোকে আবির্ভূতা হইয়া-ছিলেন যে রসময়ী দেবী তাঁহাকেই আবার বহির্বিশ্বে স্থাপন করিয়া বহির্বিশ্বকে আমরা কাব্যের বস্তু করিয়া লই । অন্ততঃ রোম্যান্টিক্ কাব্যের বেলায় ইহাই কাব্যরচনার সার সত্য । তাই—

যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে ;
নামিলেন ধীর ধীর, দাঁড়ালেন হয়ে স্থির,
মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে !

কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী এই বালিকার রূপ কি ?

করে ইন্দ্রধনু-বালা, গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝল্‌মলে কানন,
কর্ণে কিরণের ফুল, দোদুল্ চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন !

এই কাব্যলক্ষ্মী সারদার কাজ কি ? একদিকে রহিয়াছে বহির্জগৎ, অন্যদিকে রহিয়াছে ভাবভোলা কবিচিত্ত,—মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে এই জ্যোতির্ময়ী বালিকা তাহার চিররহস্যময়ী রসমূর্তিতে,—সৌন্দর্যে, প্রেমে, আনন্দে সে উভয়ের ভিতরে ঘটাইয়া দিতেছে গভীর মিলন। তাই,—

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে, আর বার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী !
কাতরা করুণা ভরে, গান সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী !

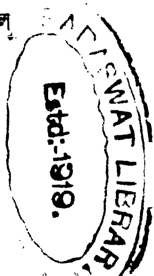
আর,— নিরখি নন্দিনীচ্ছবি গদগদ আদি কবি—
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায় !

তখন— রোমাঞ্চিত কলেবর, টলমল থরথর,
প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল।
হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে ঢুলু ঢুলু ঢু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও ?

আদি কবি বাল্মীকির এ ধ্যানের ছবি 'সারদা'। কিন্তু রোম্যান্টিক্ ধর্মের প্রভাবে কবি বিহারীলাল অনেক স্থানে ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে আসিতে চান নাই। সারদার সহিত

শুধু 'পলকে ঝলকে'ই দেখা,—তাহাও যেন এক নদীর দুপার হইতে।

পূর্ণিমা প্রমোদ আলো, নয়নে লেগেছে ভাল,
মাঝেতে উথলে নদী, দু-পারে দু-জন—
চক্রবাক্ চক্রবাকী দু-পারে দু-জন !



নয়নে নয়নে মেলা, মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন ;
হৃদয় বীণার মাঝে ললিত রাগিণী বাজে,
মনের মধুর গান মনেই বিলীন !

শুধু দূর হইতে আভাসে ইঙ্গিতেই কবির সহিত সারদার পরিচয়,—এই জন্যই দেখিতে পাই কোনও 'সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী' যখন একখানা 'সাধের আসন' বুনিয়া তাহাতে কবিকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে ঢুলু ঢুলু দু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও ?

তখন কবি তাঁহার 'সাধের আসন' নামক কাব্যের প্রথমেই জবাব দিয়াছিলেন—

ধেয়াই কাঁহারে দেবি ! নিজে আমি জানি নে।
কবি-গুরু বাল্মীকির ধ্যান-ধনে চিনিনে।
মধুর মাধুরী-বালা, কি উদার করে খেলা !
অতি অপরূপ রূপ !—
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারি নে।

কহে সে রূপের কথা বসন্তের তরুলতা ;
সমীরণে ডেকে বলে নির্জ্জনে কানন-ফুল,
শুনে, সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুলুঢুল্।

হাসি' হাসি' ইন্দ্রধনু নীল গগনে ভায়,
শারদ নীরদগণে কি কথা বলিতে চায় !
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে, জানি না কি কারণে !
ভোরে শুকতারা রাণী কি যেন দেখায় আনি,
বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তা'য়।

* * * *

উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি !
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কোথায় ধেয়েছ ভাই ?
মহান্ তরঙ্গ-রঙ্গে কি মহান্ শুভ্রহাসি !
বল, কা'রে দেখিয়াছ ? কোথা গেলে দেখা পাই !

আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, বিহারী-লালের সমগ্র কাব্যের ভিতর দিয়া একটা বিষাদের সুর—একটা না-পাওয়ার বেদনা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি জন্মাবধি যেন সমগ্র বিশ্বের ভিতর দিয়া কোন্ পরিপূর্ণ মানস-প্রতিমাকে পাইতে চাহিয়াছেন—কিন্তু সে—

'চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি'।

সকল বড় বড় রোম্যান্টিক্ কবিদের কাব্যেই এই বিষাদের সুর বর্ত্তমান,—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভিতরে

এই বিষাদের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারে। বিহারীলালের সুরের তারগুলি অনেক সময়ে একটু মোটা,—তাই স্থানে স্থানে ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছে লৌকিক সুর, যাহার ফলে এমন কথাও কেহ কেহ বলিবার সুযোগ পাইয়াছেন যে, 'সারদা' কবির শুধু মাত্র মানস-সুন্দরী এবং মানস-প্রেয়সী নহে, 'সারদা' মানুষী সুন্দরী এবং মানুষী প্রেয়সী। আসলে রোম্যান্টিক্ কবিদের এই বিষাদের কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সর্বদা তাঁহাদের 'মানস-প্রতিমা'; সৌন্দর্য সম্বন্ধে, প্রেম সম্বন্ধে এই জাতীয় কবিদের মনে একটা পরিপূর্ণতার আদর্শ রহিয়াছে,—কিন্তু আমাদের বাস্তব জগৎটা আমাদের কল্পনার আদর্শ জগৎ হইতে অনেক নীচে পড়িয়া থাকে,—সে তাহার প্রত্যক্ষ রূপের ভিতরে আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরে যে অপূর্ণতার দৈন্য তাহাতেই মন ওঠে ব্যথিত হইয়া। আমাদের বাস্তব প্রিয়া আমাদের কল্পনার আদর্শ প্রিয়া হইতে অনেক অপূর্ণ—অনেক ছোট, এইখানেই রোম্যান্টিক্ কবির চিত্তে নিরন্তর বিষাদ। কবি বিহারীলালও এই পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুতে—প্রত্যেক প্রাণীতে দেখিতে চাহিয়াছেন সারদার পরিপূর্ণ মূর্তি,—ক্ষণে ক্ষণে সেই সারদার আভাস পাওয়া গিয়াছে বটে,—কিন্তু তাহার পরিপূর্ণ রূপের সাক্ষাৎ মেলে নাই কোথাও। রবীন্দ্রনাথও চিরদিন এই পথের পথিক।

বিহারীলালের কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে আর একটি জিনিস সহজেই লক্ষ্য করা যায়,—সারদার রহস্যমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া কবি বেশীক্ষণ রোম্যান্টিক্ থাকেন নাই,—শীঘ্রই তিনি মিষ্টিক হইয়া গিয়াছেন। কাব্যের রোম্যান্টিক্ ধর্ম এবং মিষ্টিক ধর্ম কিন্তু কোথাওই পরস্পর বিরোধী নহে। উভয় অবস্থাই কবিমনের একই ধর্ম হইতে উদ্ভুত,—তাহাদের ভেদটা আসলে প্রকারগত নহে, ওটা একান্তই স্তরগত। রোম্যান্টিক্ মনই রহস্যের অতলে আরও একটু ডুবিয়া মিষ্টিক হইয়া ওঠে। আমাদের ভিতরে বুদ্ধির আলো ব্যতীত হৃদয়ের একটা আলো রহিয়াছে। সে সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং প্রখর নহে, চন্দ্রালোকের ন্যায় অস্ফুট, স্নিগ্ধ এবং কমনীয়। সেই স্নিগ্ধ মৃদু হৃদয়ের আলো গায়ে মাখিয়া বহির্বস্তু সকলই হইয়া ওঠে একটা রহস্যের বিগ্রহ,—চিনি চিনি করিয়াও কাহাকেও চিনিতে পারিতেছি না ;—'চির দিন দিল ফাঁকি'! মনের এই স্তরে জাগে রোম্যান্টিকতা। সমগ্র বিশ্বটাই যেন একটা আবছায়ায় ঢাকা,—ধোঁয়াটে অস্পষ্ট—কিন্তু চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে সীমাহীন রহস্য—অমোঘ তাহার আকর্ষণ! যে কবির মন এইখানেই থামিয়া যায় তিনি রোম্যান্টিকই থাকিয়া যান,—কিন্তু মানুষের মন প্রায়ই এইখানে থামিতে চাহে না; সে আরও অগ্রসর হইয়া এই কুহেলীর যবনিকা ছিন্ন করিয়া হৃদয়ের আলোতেই

তাহার ভিতরে একটা অদ্বয় সত্যকে লাভ করিতে চায়। যখন সকল রহস্যের ভিতরে একটা অদ্বয় সত্য লাভ হইল—সংশয়ে দোদুল্যমান্ চিত্ত যখন একটা দৃঢ় বিশ্বাসের অবলম্বনে নিশ্চল হইল, তখনই মানুষ হয় মিষ্টিক্। 'মিষ্টিসিজম্'এর প্রধান লক্ষণ এই, সে মানুষের মনকে শুধু অপরিচিত ঘাট হইতে ঘাটে ভাসাইয়া চলে না,—সে হৃদয়ে আনে একটা গভীর বিশ্বাস—আর এই বিশ্বাস তাহাকে চালাইয়া লইয়া যায় বিশ্বের অন্তর্নিহিত একটি অদ্বয় সত্যের দিকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই যে অদ্বয় সত্যের আবিষ্কার ইহা বুদ্ধির আলোতে নহে, হৃদয়ের আলোতে,—এ অদ্বয় সত্য যুক্তিতর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত কোন সিদ্ধান্ত নহে,—হৃদয়ের অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা গভীর বিশ্বাস মাত্র। তাই 'মিষ্টিসিজম্'এর আলোও প্রখর সূর্যের আলো নহে, পৌষ নিশীথের 'হিমানী কুহেলীমাখা' চন্দ্রালোক।

বিহারীলালের সারদা সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা হইয়াছে তাহার ভিতর হইতেই স্পষ্ট করিয়া বোঝা যাইবে যে, সারদা এক এবং অদ্বয়—সে কবি-হৃদয়ের গভীর অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা দৃঢ় বিশ্বাস। পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই সারদাকে দিয়া কবি শুধু বিশ্বের সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম এবং জ্ঞানেরই ব্যাখ্যা করেন নাই, সারদা বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিতা মূল মায়াশক্তি ; সে একটা রহস্যের বাঁধনে সমগ্র

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কবি এখানে যাহাকে সারদা বলিয়াছেন, দার্শনিকগণ তাঁহাকেই 'মায়া' আখ্যা দিয়াছেন। সেই অনাদি মায়াশক্তিই কান্তিময়ী রূপে, প্রেমময়ীরূপে এবং জ্ঞানময়ীরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্যই—

কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে। (সাধের সাধন)

সারদাকে সম্বোধন করিয়াই কবি ক্ষণে ক্ষণে বলিয়াছেন,—

কে তুমি, প্রাণেতে পশি', ত্রিদিবের পূর্ণশশী,
কান্তি-সঙ্কলিত-কায়া অপরূপ ললনা?
করি অপরূপ আলো কি বিচিত্র খেলা খেলো!
না জানি, কি মোহ-মন্ত্রে এ অসার দেহ-যন্ত্রে
আপনি বিদ্যুৎবেগে বেজে ওঠে বাজনা!
তুমি কি প্রাণের প্রাণ? তুমিই কি চেতন?

কে তুমি, প্রাণীর বেশে খেলা কর দেশে দেশে
যুগলে যুগলে সুখসম্ভোগে বিহ্বল?

কে তুমি মা জল-স্থল, মহান্ অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ?
কে তুমি? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ?

কোটি কোটি সূর্য্য তারা জ্বলন্ত অনল-পারা,
পূর্ণ-তৃণ-তরু-প্রাণী মনোহরা ধরাখানি,

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে কি মিলন পরস্পরে !
কি যেন মহান্ গীতি বাজিতেছে সমস্বরে !
চাহি এ সৌন্দর্য্য-পানে কি যেন উদয় প্রাণে !
কে যেন কতই রূপে **একা** লীলাখেলা করে !

... ...

নিশান্তের লাল লাল তরুণ কিরণজাল
ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে।
আহা সেই রক্তরবি তোমারি পদাঙ্ক-ছবি !
জগতে কিরণ দেয় তোমারি কিরণে।

... ...

প্রত্যক্ষে বিরাজমান্, সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ;
কবির যোগীর ধ্যান, ভোলা প্রেমিকের প্রাণ।
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা ! (সাধের আসন)

সৃষ্টির ভিতরে যাহা কিছু সুন্দর এবং মধুর শুধু তাহার ভিতর দিয়াই সারদার প্রকাশ নহে ; সারদার ভৈরবী মূর্তিকেও কবি বিস্মৃত হন নাই। তাই—

কভু বরাভয় করে, চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে—
করেন মধুর স্বরে অভয় প্রদান ;
কখন গেরুয়া পরা, ভীষণ ত্রিশূল ধরা,
পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর ;
দীপ্ত সূর্য্য হুতাশন ধ্বক্ ধ্বক্ দু-নয়ন,
হুঙ্কারে বিদরে ব্যোম্ লুকায় মিহির।

... ...

কভু আলুথালু কেশে, শ্মশানের প্রান্তদেশে
জ্যোৎস্নায় আছেন বসি বিষণ্ণ বদনে;
গঙ্গার তরঙ্গমালা সমুখে করিছে খেলা,
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস নয়নে!

'সাধের আসনে'র যোগেন্দ্রবালার বর্ণনার ভিতরেও সর্বত্র সারদার এই বিশ্বময়ী মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, নদনদী, তরুলতা, তৃণ-গুল্ম, পশু-পাখী—সকলই সারদার বিলাস-বিভূতি মাত্র,—সারদারই আত্ম-প্রকাশের লীলা। 'সারদা-মঙ্গলে'র ভিতরে অনেক স্থানে দেখিতে পাই, কবির মানস-সরোবরে প্রস্ফুটিত বাসনার কমলদলে চরণ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন যে সৌন্দর্যময়ী সারদা, তিনি শুধু কবির মানসী নন, তিনি সৃষ্টির আদি কবি ব্রহ্মার মানসী; প্রথম পূর্ণিমা যামিনীতে ব্রহ্মার সেই সৌন্দর্যময়ী মানসীরই প্রথম প্রকাশ।

ব্রহ্মার মানস-সরে ফুটে ঢল ঢল করে
নীলজলে মনোহর স্বুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায় হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী!

পূর্ণিমা রাত্রিতে আকাশ যে ভরিয়া যায় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারায় তাহা আর কিছুই নয়,—আদি স্রষ্টার মানস-সুন্দরীর প্রতিচ্ছবি।

আচম্বিতে অপরূপ রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে!

আপনার লাবণ্যের প্রকাশের ভিতর দিয়া সেই আদি মায়ারূপিণী যেন আপনার মায়ার খেলাই আপনি দেখিতেছেন।

স্থন্দরী দাঁড়ায়ে তায় হাসিয়ে যে দিকে চায়,
সেই দিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া।
তেমনি মানস-সরে লাবণ্য-দর্পণ-ঘরে
দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী দেখিছেন মায়া।
... ...
চমকি আপন-পানে চাহেন রূপসী!
চমকে গগনে তারা, ভূধরে নির্ঝর-ধারা,
চমকে চরণ-তলে মানস-সরসী!

এই মানস-সরসী শুধু হিমালয়ের মানস-সরোবর নহে,—বাহিরের সরসীর সঙ্গে সঙ্গে মনের সরোবরও চমকিয়া ওঠে। 'মায়াদেবী'তে এই সারদাকে কবি 'আদিদেব স্বপনরূপিণী' আখ্যা দিয়াছেন, এবং—

এ নীল আকাশ তরল আরশি, ব্রহ্মের বিমল মানস-সরসী
ফুটে ফুটে তায় ভাবের কুস্থম তারকা ছড়ায়ে আছে;
তুমি স্বপ্নময়ী রাজহংসমালা ঘুমঘোরে তার কর লীলাখেলা,
বসি, হাসি হাসি হেরিছে চন্দ্রমা ধরার কোলের কাছে।

এই সারদার পরিকল্পনাটি অনেকাংশে কবি বিহারীলালের নিজস্ব। আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে ইহার পূর্বে এ জাতীয় কল্পনা আর কাহারও ভিতরে দেখিতে পাই না। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কবিতায় অবশ্য অতি অস্পষ্টভাবে

সমজাতীয় শক্তির আভাস পাওয়া যায়। শেলীর কবিতায় জীবনযাত্রার পশ্চাতে একটা ঐক্যের কথা এবং সেই ঐক্যের অধিষ্ঠাত্রী এক অদৃশ্য বিশ্বশক্তির আভাস পাওয়া যায়।

'হিম্ টু ইন্টেলেক্চুয়াল বিউটি' (Hymn to Intellectual Beauty) কবিতায় শেলী এক অদৃশ্য শক্তির বন্দনা করিয়াছেন, সেই অদৃশ্য শক্তিই সকল সৌন্দর্যের ও রহস্যের

The awful shadow of some unseen Power
Floats though unseen among us,—visiting
This various world with as inconstant wing
As summer winds that creep from flower
to flower,—
Like moonbeams that behind some piny
mountain shower,
It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance;
Like hues and harmonies of evening,—
Like clouds in starlight widely spread,—
Like memory of music fled,—
Like aught that for its grace may be
Dear, and yet dearer for its mystery.

কীট্‌স্‌ও তাঁহার বহু কবিতায় এক সৌন্দর্যদেবীর বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে

একটা অশরীরী আত্মার সন্ধান পাইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর এই সকল ইংরেজী কবির সহিত বিহারীলালের কিছু কিছু পরিচয় থাকিলেও কবির উপরে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব নগণ্য বলিয়া মনে হয়। আমরা একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, সারদার পরিকল্পনার পশ্চাতে—বিশেষভাবে কবিমনের উপরে রহিয়াছে বহুযুগের প্রাচ্য চিন্তাধারারই প্রভাব। 'চণ্ডীমঙ্গল', 'কালিকামঙ্গলে'র দেশের কবির 'সারদামঙ্গলে' 'সারদা'র সূক্ষ্মভাবে 'চণ্ডিকা,' 'কালিকা'র সহিত যোগ থাকিবারই সম্ভাবনা। বিশ্বের অন্তর্নিহিত এক আদিশক্তির কল্পনা বহু প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুর মন অধিকার করিয়া আছে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই তন্ত্রে এই শক্তি বহুভাবে কল্পিতা এবং কীর্তিতা। সাংখ্যের প্রকৃতিও একটু একটু করিয়া তন্ত্রের এই বিশ্বশক্তির সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। বেদান্তে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারটি মায়া দ্বারা রচিত বলা হইয়াছে; বেদান্তের এই মায়াও সাধারণ লোকের ভিতরে শক্তি বলিয়াই কল্পিতা,—এবং তন্ত্রের শক্তি এবং বেদান্তের মায়াও পুরাণাদিতে এক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'তে এই বিশ্বদেবীকে সর্বভূতে মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, ক্ষান্তি, কান্তি, শান্তি, শক্তি প্রভৃতি রূপে সংস্থিতা বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছে। ইহার ভিতর হইতে আমাদের কবি বিহারীলাল দেবীর কান্তিমূর্তিকেই বিশেষভাবে তাঁহার আরাধ্যা বলিয়া গ্রহণ

করিলেও দেবীর তন্ত্রোক্তমূর্তি তাঁহার মনের অবচেতনে লুক্কায়িত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই সারদাকে কবি বহু স্থানেই 'যোগেশ্বরী' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন,—সারদা 'যোগানন্দময়ী-তনু, যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন',—তিনি যেমন কবির ধ্যেয় মূর্তি তেমনি যোগীর আরাধ্যা,—তিনি 'ভোলামহেশ্বর-প্রাণ',—তিনি কখনও 'বরাভয় করে', কখনও 'গেরুয়া-পরা, ভীষণ ত্রিশূল ধরা' এবং 'আলুথালু কেশে শ্মশানের প্রান্তদেশে' নিষণ্ণা। কিন্তু এই প্রাচীন হিন্দুর 'শক্তি'র আদর্শকে গ্রহণ করিয়া বিহারীলাল অনুভূতি এবং কাব্য-সাধনার ভিতর দিয়া তাঁহাকে যে ভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে সারদা 'কবি'র আরাধ্যা দেবীই হইয়া উঠিয়াছেন, এইখানেই বিহারীলালের কাব্য-সাধনা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

বিহারীলালের 'সারদা' সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমজাতীয় ভাবধারার কথা স্বতঃই মনে আসে। কাব্যধর্মে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের শিষ্য একথা বহুপ্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্থানে স্থানে বিহারীলালের প্রতি তাঁহার মনের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারীলাল রোম্যাণ্টিক্ ধর্মের কবি, আর পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙলা-সাহিত্যে বিহারীলাল-পন্থী রোম্যাণ্টিক্ ধর্মের পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের ভিতরে। বিহারীলাল সমগ্র জীবন ধরিয়া যেই রহস্যময়ীর পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও

সৃষ্টির অন্তর্নিহিতা সেই রহস্যময়ীর পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। এই রহস্যময়ী দেবীকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথও স্থানে স্থানে মিষ্টিক্ হইয়া উঠিয়াছেন; তবে বিহারীলালের সহিত রবীন্দ্রনাথের একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য এইখানে যে, বিহারীলালের মিষ্টিক্ দৃষ্টি সারদাকে অবলম্বন করিয়াই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সত্যকারের মিষ্টিক্ দৃষ্টি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল সৃষ্টির অন্তর্নিহিতা এই রহস্যময়ী দেবীর খোঁজ করিতে করিতে আরও অগ্রসর হইয়া 'জীবন-দেবতা'র সাহিত্যিক এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে।

বিহারীলালের 'সারদা'র আদর্শটি রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কবিমনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পূর্বেই দেখিয়াছি, বিহারীলালের 'সারদা-মঙ্গলে' বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভ অতি সুন্দর হইয়াছে; এ দৃশ্যটি রবীন্দ্রনাথেরও খুব ভাল লাগিয়াছিল, তাই রবীন্দ্রনাথের কৈশোর নাটিকা 'বাল্মীকির প্রতিভা'য় ইহার স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আমরা বিহারীলালের কাব্যে দেখিয়াছি, ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে করুণহৃদয় বাল্মীকি মুনির চিত্তে কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্যোতির্ময়ী বালিকার মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তেও দেখিতে পাই, ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে বিগলিত-হৃদয় ঋষির মুখ হইতে যখন প্রথম শ্লোক বাহির হইল, তখন কবি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন,—

পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
একি! হৃদয়ে একি দেখি!—
ঘোর অন্ধকার মাঝে, একি জ্যোতি ভায়,
অবাক্!—করুণা এ কার!

তখনই স্নিগ্ধ কিরণে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া 'স্থির-চপলা'র ন্যায় সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। তখন আদি কবি বলিলেন,—

তব কমল-পরিমলে, রাখো হৃদি ভরিয়ে,
চির-দিবস করিব তব চরণ-সুধা পান!

ইহার পরের দৃশ্যে লক্ষ্মী আসিয়া কবিকে প্রলুব্ধ করিতে চাহিল; কিন্তু কবি বলিলেন,—

কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!
তুমি ত নহ সে দেবী, কমলাসনা—
ক'রো আমারে ছলনা!
কি এনেছ ধন মান! তাহা যে চাহে না প্রাণ।

... ...

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না এসো না,
এস না এ দীনজন কুটিরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,—
আর কিছু চাহি না চাহি না!

তখন প্রত্যাখ্যাত লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন এবং সরস্বতীর পুনরাবির্ভাব হইল। কবি বলিলেন—

এই যে হেরি গো দেবী আমারি !
সব কবিতাময় জগৎ চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি !
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক-রবি-উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে ;
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে !
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি !

এই কবিতাদেবী যে বিহারীলালের 'সারদা' তাহা বুঝিয়া লইতে কোন কষ্ট হয় না। সরস্বতীর ধ্যানে মগ্ন কবি যে প্রলোভনকারিণী কমলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এ জিনিসটিও 'সারদা-মঙ্গল' হইতে গৃহীত। 'সারদা-মঙ্গলে' দেখিতে পাই,—

কমলা ঠমকে হাসি ছড়ান রতনরাশি,
অপাঙ্গে ভ্রূ-ভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও !
ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ, ইন্দ্রাসনে তুচ্ছজ্ঞান
হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল !

এমন করুণা মেয়ে আছে যাঁর মুখ চেয়ে,
ছলিতে এসেছ তাঁরে কেন গো চপলা ?
হেরে কন্যা করুণায় শোকতাপ দূরে যায়,—
কি কাজ—কি কাজ তাঁর তোমারে কমলা !

... ...

এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার !
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর !

..., ...

তোমারে হৃদয়ে রাখি— সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে ;

... ...

ভক্তিভাবে একতানে মজেছি তোমার ধ্যানে ;
কমলার ধন-মানে নাহি অভিলাষী ।

বিহারীলালের এই সব কথাই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে আরও সুন্দর এবং নিজস্ব করিয়া বলিয়াছেন,—

তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা ।
চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুণিয়া
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগ-সুধা । (পুরস্কার)

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় রহিয়াছে 'সারদা-মঙ্গলে'র অন্ধ-অনুকরণ ; কিন্তু পরবর্তী কালের কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে বিশ্বের অন্তর্নিহিতা 'কৌতুকময়ী' সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথের বহু বিচিত্র নিজস্ব দৃষ্টি । 'মানসী'র যুগ হইতেই

রবীন্দ্রনাথ এই অনন্ত রহস্যময়ী সম্বন্ধে একটু একটু করিয়া সচেতন হইয়া উঠিতেছিলেন। 'সুরদাসের প্রার্থনা'র ভিতরে সুরদাসের রূপে কবি নিজেই সৌন্দর্যরূপিণী বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট তাঁহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন, দেবীর যে বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্তি ছড়াইয়া রহিয়াছে বহির্বিশ্বে খণ্ড খণ্ড হইয়া তাহাকেই কবি তাঁহার মানসনেত্রে সীমাহীন রূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। 'মেঘদূতে'র ভিতরে কবি 'কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে' 'সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি' প্রিয়তমার নিকট তাঁহার কল্পনার 'মেঘদূত' পাঠাইতে চাহিয়াছেন। 'সোনার তরী'তে এই বিশ্বসুন্দরীকে দেখিলাম কবির মানস-সুন্দরী রূপে।

তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলিতে
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ-প্রভাতে
নবীন বালিকামূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণ-ধারে সদ্যঃস্নান করি'
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি,
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি।
বারে বারে শৈশব কর্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি'

পাঠশালা-কারা হ'তে ; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্য-ভবনে
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে ;
কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা ব'লে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্যমিথ্যা তুমি জান তা'র।

এইরূপে যে সৌন্দর্যরূপিণী জীবনের প্রভাতে ছিল 'খেলার সঙ্গিনী' যৌবনের বসন্তে প্রেমের অরুণরাগে মধুর হইয়া সে দেখা দিয়াছিল 'মর্মের গেহিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী'রূপে। এই 'বিশ্বপারে'র প্রিয়াকেই কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হ'য়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কি কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ?

কিন্তু প্রত্যুত্তরে— হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা !

জীবনের এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পিছনে কবি মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুধু চলিয়াছেন আর ক্ষণে ক্ষণে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে।

এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র অজানারূপিণীই কিছুকাল পরে কবির কাছে দেখা দিয়াছে 'চিত্রা'রূপে। বিহারীলালের সারদা যেমন—

কে তুমি সুষমা মেয়ে, আছ মুখপানে চেয়ে
আলো কোরে অন্তরাত্মা, আলো করে ধরণী ?

'চিত্রা'ও সেইরূপ একদিকে—

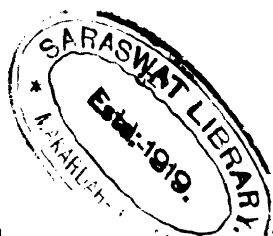
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।

অন্যদিকে— অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী—
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,

একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।

'চিত্রা' কাব্যের 'আবেদন' কবিতার 'মহারাণী'ও 'সারদা'র প্রতিরূপ। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন যে, 'উর্বশী'র পরিচয় 'ভাঙা-চোরা ভাবে' ছড়াইয়া আছে সকল নারীর ভিতরে, 'সারদা'র পরিচয় তেমনই ভাঙা-চোরাভাবে ছড়াইয়া আছে 'চিত্রা'র বহু কবিতার ভিতরে। 'জ্যোৎস্নারাত্রে', 'পূর্ণিমা' প্রভৃতির ভিতর দিয়া কবি দেখিয়াছেন সারদার সৌন্দর্যলক্ষ্মী মূর্তি; 'সাধনা'র ভিতরে সেই 'সারদা' বন্দিতা কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্তিতে; 'উর্বশী'তে বিশ্বসৌন্দর্যের আভাস এখানে সেখানে আসিয়া পড়িতে চাহিলেও এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে পরিপূর্ণ নারী-সৌন্দর্যের ভিতরে সারদার আংশিক পরিচয়। আবার 'বিদেশিনী' কবিতায় দেখিতে পাই, সারদা দেখা দিয়াছে শুধু বিশ্বের অন্তর্নিহিতা মায়াময়ী রহস্যমূর্তিরূপে, সে শুধু তাহার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিয়াই চলিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই আত্মপরিচয় দিতে চাহিতেছে না।

দিন শেষ হ'য়ে এল আঁধারিল ধরণী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
"হাঁগো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—



অমনি কথা না বলি
ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

এই রহস্যময়ীর সম্বন্ধে 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে,—কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপর তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে,—আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো শুনিয়াছি। সেই ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।"

কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বিহারীলাল এই রহস্যময়ীর যবনিকা দূরে সরাইয়া হৃদয়ের বিশ্বাসের আলোতে বহু স্থানে তাহাকে একটা অদ্বয় মূর্তিতে দেখিতে চাহিয়াছেন, এবং এই মিষ্টিক্ অদ্বয়-দর্শনের ফলে কবির দৃষ্টি স্থানে স্থানে একটা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে খানিকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' বা 'আবেদন'

কবিতায় একটু মিষ্টিক্ আমেজ থাকিলেও এই 'রহস্যময়ী'র বিচিত্র রূপ লইয়া কবি বহুলাংশেই রোম্যান্টিক্। কিন্তু এই রোম্যান্টিক্ দৃষ্টিই 'মিষ্টিক্' দৃষ্টিতে পরিবর্তিত হইল যখন এই 'রহস্যময়ী'ই 'কৌতুকময়ী' হইয়া কবিকে 'জীবন-দেবতা'র সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছে। এই অনন্ত রহস্যময়ীই যে কি করিয়া নীরব অঙ্গুলিসংকেতে মন্ত্রমুগ্ধ কবিকে বহু অপরিচয়ের বিস্ময়ের ভিতর দিয়া শেষে 'জীবন-দেবতা'র কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহারই ইতিহাস দেখিতে পাই 'চিত্রা'র 'সিন্ধুপারে' কবিতায়। কিন্তু একবার 'জীবন-দেবতা'র সহিত পরিচয় হইবার পরই যে কবি তাঁহার 'রহস্যময়ী'কে ভুলিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে; তাই 'পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ' যেদিন বাজিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আবার—

> দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
> মনে হ'লো যেন চিনি,
> কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
> ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।

রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার সহিত বিহারীলালের এই ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা একথা মনে করা কখনই উচিত হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই জাতীয় প্রধান প্রধান ভাবগুলি বিহারীলালের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিমনে বিহারীলালের প্রভাব খানিকটা পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সেই প্রভাবের

উপরে ভিত্তি করিয়াই রবীন্দ্রনাথের বিরাট কল্পনাসৌধ গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না। এই সব ভাবধারায় রবীন্দ্রনাথের উপরে বিহারীলালের প্রভাব রহিয়াছে বলা অপেক্ষা বিহারীলালের ভাবধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে বলাই অধিক সঙ্গত হইবে। এই নিকট-সাদৃশ্যের কারণ রবীন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের কবি-মানসের নিগূঢ় সাধর্ম্য। অনেকখানি সমজাতীয় ধাতুতে রবীন্দ্রনাথ এবং বিহারীলালের আন্তর সত্তা গঠিত ছিল, তাই উভয়ের কাব্যধর্মে রহিয়াছে এত সাদৃশ্য। রবীন্দ্রনাথ বিরাট প্রতিভাবান্ পুরুষ, তাই তাঁহার আন্তর সত্তা তাঁহার কাব্য-কবিতায় সুষ্ঠু প্রকাশ লাভ করিয়াছে; বিহারী-লালের কবি-প্রতিভা সমান ছিল না, তাই সকল সাধর্ম্য সত্ত্বেও কবিহিসাবে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সহিত দাঁড়াইতে পারেন না।

এই 'সারদা'র পরিকল্পনা ছাড়াও লিরিক্ কবি হিসাবে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য অনেক স্থানে পরিস্ফুট। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'র প্রথমেই দেখিতে পাই এক বিচিত্র অনুভূতির বাসনা। কভু মনে হয়, সমস্ত গ্রামনগর ত্যাগ করিয়া একটি অজ্ঞাত ভগ্ন নির্জন প্রদেশে বাস করিতে পারিলেই আনন্দ; আবার—

কভু ভাবি কোন ঝরণার উপলে বন্ধুর যার ধার;
প্রচণ্ড প্রপাতধ্বনি, বায়ু বেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার,—

এমন একটি প্রকৃতির বিচিত্র আবেষ্টনীর ভিতরে বনের পশুপক্ষীদের সহিত মিত্রভাবে বাসের ভিতরে যে বিচিত্র আনন্দ তাহাও কবিকে প্রলুব্ধ করিতেছে। আবার কখনও সমুদ্রের উপকূলে—যেখানে প্রলয়ের নৃত্যরোলের ন্যায় বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাজি বিরাট সৈকতভূমিতে আছড়াইয়া মরিতেছে, সেখানে বাসের প্রচণ্ড আনন্দও কবিকে আকর্ষণ করিতেছে। আবার প্রত্যূষে শ্যামল মাঠের উপর দিয়া যখন নির্মল বায়ু ঝর ঝর বহিয়া যাইবে তখন চাষীদের সহিত মাঠে মাঠে বেড়াইবার আনন্দ, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে সহজ সরল গ্রাম্য গানের সুরে কালো হইয়া আসা দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া দিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিবার যে আনন্দ,—ঘোর বর্ষার নিশীথে—যখন বজ্রের গর্জনে বিদ্যুতের ঘন ঘটায় প্রকৃতির একটি ভীষণ মূর্তি প্রকটিত—তাহার ভিতরে মাঠের প্রান্তে একটি জীর্ণ কুটীরে রাত্রি যাপন—সকলই যেন কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিতেছে। ধরণীর বিচিত্র অনুভূতির এই যে বাসনা তাহা পরবর্তী যুগে প্রকাশের পূর্ণতা লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতায়—

হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে।

রোম্যান্টিকতার একটা প্রধান লক্ষণ প্রকৃতির পানে ফিরিয়া তাকান। চিরাচরিত বাঁধাধরা পদ্ধতির পথে না চলিয়া একটি সহজ স্বাধীন দৃষ্টিতে জগৎ এবং জীবনের পানে তাকানই রোম্যান্টিক্ কবির বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির পানে তাকাইবার বহুদিনের কতগুলি পদ্ধতি রহিয়াছে; সেই একই রঙীন সংস্কারের চশমা আঁটিয়া প্রকৃতির পানে তাকাইতে তাকাইতে প্রকৃতির সবুজ তাজা রূপ ঢাকা পড়িয়া যায়। এই সংস্কারের আবরণ ছিন্ন করিয়া নূতন চোখে প্রকৃতির দিকে তাকান, ইহাই রোম্যান্টিক্ কবির কাজ। বিহারীলালের ভিতরে এই জাতীয় একটা নিজস্ব দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে তাকাইবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেখানে কবি খানিকটা প্রাচীন পথেই চলিয়াছেন সেখানেও তিনি একটা নবীন সরসতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহার ভিতরে একটা সহৃদয় নিবিড়তারও পরিচয় রহিয়াছে। যেমন—

প্রণয় করেছি আমি, প্রকৃতি রমণী সনে,
যাহার লাবণ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে।
মুখ—পূর্ণ সুধাকর, কেশজাল—জলধর,
অধর—পল্লব নব রঞ্জিত যেন রঞ্জনে;
সমুজ্জ্বল তারাগণ শোভে হীরক ভূষণ,
শ্বেত ঘন সুবসন উড়ে পড়ে সমীরণে;
বায়ুর প্রতি হিল্লোলে লতাগুলি হেলে দোলে
কৌতুকিনী কুতূহলে নাচে চঞ্চল চরণে;—

স্তবকভার সে প্রিয়ার সমুন্নত পয়োধর, প্রফুল্ল কুসুমরাজি তাহার অধরের উজ্জ্বল হাসি,—অলির গুঞ্জনে সে প্রিয়া বাঁশী বাজায়, কমল-নয়নে প্রিয়ার ঢলঢল চাহনি, পাখীর কূজনে প্রিয়ার ললিত সঙ্গীত! প্রকৃতির সহিত এই অন্তরঙ্গযোগ বিহারীলালের পূর্বে বাঙলা-সাহিত্যে দুর্লভ।

'সারদা-মঙ্গলে' কবি প্রকৃতির যে চপল বালিকা-মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন সংস্কারবর্জিত অন্যদিকে তেমনি একান্ত সজীব।

সেই সুরধুনী-কূলে ফুলময় ফুলে ফুলে,
বেড়াইতে বনবালা পরি ফুলহার।
নবীন-নীরদ-কোলে সোনার যে দোলা দোলে,
ক্ষণেক দুলিতে, ক্ষণে পালাতে আবার!
সুধাংশু-মণ্ডলে বসি, খেলিতে লইয়ে শশী;
হাসিয়ে ছড়িয়ে দিতে তারকারতন;—
হাসি দিগঙ্গনাগণে ধরি ধরি সে রতনে
খেলিত কন্দুক-খেলা, হাসিত সংসার

কবির ঊষা বর্ণনা,—

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে
ঘুমন্ত প্রকৃতিপানে চেয়ে আছে কুতূহলে!
চরণ-কমলে লেখা আধ আধ রবিরেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।

চিত্রে, সঙ্গীতে ও ভাবে ইহা অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। কবির মধ্যাহ্ন বর্ণনা,—

বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর ! দিনকর খরতর,
নিঝুম নীরব সব—গিরি, তরু, লতা।
কপোতী সুদূর বনে ঘুঘু—ঘু করুণ স্বনে
কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা।

ইহার ভিতরে মধ্যাহ্নকে যেন আমরা অনেকখানি মূর্তিমান দেখিতে পাই। 'সাধের আসনে'র ভিতরে কবি যেখানে প্রভাতের বর্ণনা করিতেছেন,—

সহর্ষ কেতকীকুঞ্জ, প্রফুল্ল চম্পকপুঞ্জ,
সোণার কদম্ব সব রসে রোমাঞ্চিত-কায় ;
উল্লাসে মাঠের কোলে তৃণের তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায় !

গন্ধবায়ু ঝুরু ঝুরু, কাঁপে তরুরেখা-ভূরু
আরামে পৃথিবীদেবী এখনো ঘুমায় !

এখানে এই পৃথিবীকে—এই প্রভাতকে কবি নিজের চোখে দেখিয়া ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

স্থানে স্থানে বিহারীলাল বিশ্বপ্রকৃতিকে পটভূমিতে রাখিয়া মানুষের যে সুকুমার চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া মানুষের জীবন-ধারার সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির একটি নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে। 'বঙ্গসুন্দরী'র 'অভাগিনী' কবিতায় দেখি—

উষসীর কোলে কুসুম কলিকা
প্রফুল্ল হইয়ে বাতাসে দোলে,

যবে শিশুমতি ছিলেম বালিকা
দুলিতেম বসি মায়ের কোলে।

এখানে একদিকে মায়ের কোলের শিশুমতি বালিকাও যেমন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে,—উষসীর কোলের কুসুম-কলিকার সহিত তাহার যোগও সুকুমার হইয়া উঠিয়াছে। 'সাধের আসনে'ও দেখি,—

সুশান্ত গোধূলি বেলা!
নদীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা।
চেয়ে দেখে কুতূহলে সূর্য্য যায় অস্তাচলে,—
কেমন প্রশান্ত মূর্ত্তি কোথায় চলিয়া গেল!
লাল নীল মেঘে মাখা, কিরণের শেষ রেখা
আর নাহি যায় দেখা আঁধার হইয়া এল!

এই পটভূমিকায়ই অন্যদিকে দেখিতে পাই—

বসিয়ে মায়ের কোলে আদর করিয়া দোলে
আকাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে,
হয়েছে নূতন আলো চাঁদমুখের হাসিতে।

'বঙ্গসুন্দরী'র 'সুরবালা'র ভিতরেও দেখি,—

এক দিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনী দলে।

কিছুক্ষণ পরেই কবি বলিতেছেন,—

তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুরফুলের মালা;
জননীর হৃদিকমল উপরে,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা!

আমরা উপরে বিহারীলালের সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি তাহার ভিতর দিয়া সব দিক হইতে আমরা তাঁহার কবিমন এবং তাঁহার কাব্য-ধর্ম্মেরই পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কবিমনের প্রধান প্রধান ভাবধারাগুলির সহিত পরিচয়ই কোনো কবির কাব্যবিচারে যথেষ্ট নহে; সেই ভাবধারা তাঁহার কাব্য-কবিতার ভিতরে কতটা সার্থক রূপ লাভ করিতে পারিয়াছে তাহার বিচারও এক্ষেত্রে কিছু গৌণ নহে; বরঞ্চ কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় অংশটার উপরেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। কাব্যের ক্ষেত্রে বক্তব্যটাই প্রধান নহে; একটা সুষ্ঠু রূপায়ণের ভিতর দিয়া সে কোনও রসধ্বনিতে পর্যবসিত হইতে পারিয়াছে কি না, সেইটাই বড় কথা। বিহারীলালের কবিমনকে বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার প্রধান প্রধান ভাবধারাগুলি আমাদিগকে যতখানি উৎসাহিত করে, সেই ভাবধারাগুলির কাব্যরূপ সেই উৎসাহকে বেশীক্ষণ জাগাইয়া রাখিতে পারে না।

বিহারীলালের ভাবধারাগুলির স্বতন্ত্র মূল্য যে তাহাদের কাব্যরূপের মূল্য হইতে অনেক বেশী এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এই কথাটিকেই ফিরাইয়া বলিলে

বলিতে হয়, কবির ভাবধারা অপেক্ষা তাঁহার কাব্য-রচনা নিকৃষ্ট হইয়াছে। আসলে কবি ভাবুক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাবুকতা তত্ত্বরূপেই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে, উত্তম কাব্যরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই; অর্থাৎ তত্ত্ব যত গভীর হইয়াছে, কাব্যরস সেই অনুপাতে জমিয়া ওঠে নাই। স্থানে স্থানে তত্ত্ব বেশ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু কবির সমগ্র কাব্যে সেই সকল রসোত্তীর্ণ কাব্যাংশ নদীর বুকে এখানে সেখানে জাগিয়া ওঠা শস্যশ্যামল চড়ার মত। বিহারীলাল যত বড় 'ঋষি' ছিলেন, তত বড় 'কবি' ছিলেন না বটে; কিন্তু এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করা উচিত যে, তাঁহার কাব্যের যত গভীর ভাবধারা তাহা তাঁহার বুদ্ধির কৃপাদত্ত সামগ্রী নহে, হৃদয়ের প্রীতিময় উপহার। এই হৃদয়ের কথাকে যথাযথ রূপায়িত না করিতে পারিয়া তিনি হয়ত অনেক স্থানে 'অকবি' হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার তত্ত্বের বোঝা কোথাও তাঁহাকে নীরস দার্শনিক করিয়া তোলে নাই।

বিহারীলালের অন্তরের এই ভাবুকতা এবং বাহিরে কাব্যময় দেহে তাহার প্রকাশের ভিতরে যে একটা গরমিল রহিয়াছে সেই সত্যই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তির ভিতরে;—"বিহারীবাবু সর্ব্বদাই কবিত্বে মজগুল থাকিতেন, তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় কবি

ছিলেন।” মোটের উপরে তাহা হইলে এখানে কাব্যের ‘অন্তঃকরণে’র এবং ‘বহিঃকরণে’র ভিতরে একটা ব্যবধান ঘটিয়াছে। ‘অন্তঃকরণ’ (intuition) বা রসানুভূতির ভিতর দিয়া বহির্বিশ্বকে কাব্যরূপে অন্তরে গ্রহণ তাহার ‘বহিঃকরণ’ (expression) বা প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে আমরা কথাটিকে ফিরাইয়া বলিব, এখানে কাব্যকে অন্তরে গ্রহণ অপেক্ষা তাহার কাব্যরূপে প্রকাশ তুলনায় নিকৃষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু কাব্যের এই রসানুভূতি ও প্রকাশের ভিতরে এই জাতীয় একটা দ্বৈতসম্বন্ধ বিষয়ে আজকাল বেশ মতবিরোধ দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ক্রোচে এই দ্বৈতবাদকে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্যের এই রসানুভূতি এবং রূপায়ণ চিত্তের দুইটি পৃথক প্রক্রিয়া নহে, একই প্রক্রিয়া; সুতরাং তাহারা নিত্য অদ্বয়যোগে যুক্ত। যেখানে কাব্য তাহার বহিঃপ্রকাশের ভিতর দিয়া সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই সেখানে বুঝিতে হইবে, কবির রসানুভূতিও কাব্য-রচনার পক্ষে সার্থক নহে; কারণ ক্রোচের মতে কাব্যের বাহিরের রূপ তাহার সকল ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া কাব্যের রসানুভূতির ভিতরেই নিহিত থাকে।

কাব্য-রচনা সম্বন্ধে ক্রোচের এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না হইলেও ইহার ভিতরে একটা বড় সত্য নিহিত আছে।

আমাদের কবি কালিদাস শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে পার্বতী-পরমেশ্বরের নিত্যসম্বন্ধের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ যেখানে রস ও অলঙ্কারকে 'অপৃথক্‌যত্ননির্বর্ত্য' বলিয়াছেন সেখানেও তাঁহারা কাব্যের আত্মা ও দেহের এই নিকট সম্বন্ধেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই মত অনুসারে বিহারীলালের কাব্যকে আলোচনা করিতে গেলে আমরা বলিব, বিহারীলালের কাব্য যেসব স্থানে যথার্থ কাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই সেখানে তাহার কারণ, তাঁহার অনুভূতিই সব সময় রসঘন হইয়া ওঠে নাই। তরল ভাবালুতা প্রকাশিত হইয়াছে তরলায়িত লৌকিক উচ্ছ্বাসে—রসানুভূতি যেখানে হৃদয়ের ভিতরে গভীরতা লাভ করিয়াছে, কাব্যে তাহার প্রকাশও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের ভিতরে তাঁহার সুর যে নিরন্তর ওঠা-নামা করিয়াছে এবং প্রতিপদে সুরগ্রামের আকস্মিক উত্থান-পতনে যে রসানুভূতিতে বাধা জন্মাইয়াছে, তাহার কারণ, কবির হৃদয়-তারেই নিরন্তর চলিয়াছে সুরের ওঠা-নামা, হৃদয়-তারেই মাঝে মাঝে সুর গিয়াছে কাটিয়া।

বস্তুতঃ বিহারীলালের কাব্যগুলি বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব, কোন কাব্যেই কবি যে সুরে তান ধরিয়াছেন সে সুর বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। কবির বিখ্যাত দু'খানি কাব্য 'সারদা-মঙ্গল' এবং 'সাধের আসনে'ও কবি নিজের সুরকে নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন

নাই। তাহার ফলে তাঁহার কোন কাব্যকেই সমগ্রভাবে একটানা পড়িয়া আস্বাদ করা যায় না; প্রতিপদে থামিয়া *বাছিয়া বাছিয়া পড়িতে হয়; সেই সকল সার্থক কাব্যাংশ* পাহাড়ের ফাটলে সোনার রেখার ন্যায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে কবির কাব্যে। এইজন্য "বিহারীলালের কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন শ্লোক বা শ্লোক-সমষ্টির উদ্ধার করা যত সহজ, ভাবে ও আকারে একটি সম্পূর্ণ কবিতা সংগ্রহ করা তার তুলনায় কঠিন।" 'সারদা-মঙ্গল' সর্গবন্ধ কাব্য বটে, কিন্তু সমগ্র কাব্যের ভিতরে কোথাও কোনো ক্রম বা ভাব-প্রকাশের পরিণতি দেখা যায় না। বিভিন্ন সর্গের ভিতরে যোগসূত্র একমাত্র 'সারদা'; এই সর্গবন্ধনের অন্তর্নিহিত নীতিটিও স্পষ্ট নহে। একই সর্গ হইতে কবি এক প্রসঙ্গ হইতে অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন,—এই প্রসঙ্গের সহিত প্রসঙ্গান্তরের, এমন কি শ্লোকের সহিত শ্লোকের যোগসূত্রও সর্বত্র স্পষ্ট নহে। সমগ্র কাব্যের মূল ভাবধারার সূত্রেই পাঠককে নিজেরই সব জিনিসটি গুছাইয়া লইতে হয়; পাঠকের সে চেষ্টাও যে সর্বত্র ফলবতী হইবে এমন সুনিশ্চিত ভরসা দেওয়া যায় না।

সত্যকারের কাব্য-কবিতা সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্ত এবং এই জন্যই অনেক সময়ে বনবিহগের সহিত কবির তুলনা করা হইয়া থাকে। কূজন করা অর্থে 'কু' ধাতু হইতেই কবি শব্দ নিষ্পন্ন; সুতরাং কাব্য-কবিতার ভিতরে একটা স্বতঃস্ফূর্তির

কথা সর্বদাই রহিয়াছে। কিন্তু আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে আসিয়া কোনও বিরাট কবি-প্রতিভাকে যখন বিশ্লেষণ করি, তখন তাহার ভিতরে যে একটা স্বতঃস্ফূর্তির ধর্মই আবিষ্কার করি তাহা নহে, তাহার ভিতরে আবিষ্কার করি আর একটি নিপুণ কলাধর্মকে; সেই স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগকে নিপুণ কলাবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াই আমরা আমাদের বিপুল ভাবাবেগকে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত করিতে পারি। মনে যখন যে ভাব আসিল তাহাকে কোন কলাকৌশলের দ্বারা সাজাইয়া গুছাইয়া না বলিয়া একেবারে বনের পাখীর ন্যায় ভাবঘোরে গান গাহিয়া যাওয়া সম্বন্ধে আমাদের অনেক সময়ে একটা সস্তা করতালি থাকে বটে, কিন্তু কাব্যের ভিতরে কলা-কৌশলকে একেবারে গৌণ করিয়া দেখা যায় না। কাব্যের ক্ষেত্রে কলা-কৌশল সর্বদাই যে কৃত্রিম একথা বলা উচিত হইবে না; বড় কবি-প্রতিভার লক্ষণই এই যে তাহার ভিতরে যেমন থাকে ভাবাবেগের বিপুলতা, আবার তেমনিই সেই ভাবাবেগের সহিতই মিশিয়া থাকে নিপুণ প্রকাশ-ভঙ্গির সূক্ষ্ম কলা-কৌশল। এই কলা-কৌশলের অভাবই বিহারীলালের সমস্ত কাব্য-সাধনায় উঠিয়াছে বড় হইয়া। নিজের ভাবধারাকে সংহত করিয়া তিনি সর্বত্র তাহাকে কাব্যরূপ দান করিতে পারেন নাই। অনেকে বিহারীলালের কাব্য-সাধনাকে আপন মনের গুঞ্জরণ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু কাব্য কখনও কবির একা

আপনার জিনিস নহে ; নিজের রসানুভূতিকে অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া বিশ্বজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আপনার সঞ্চিত মধুকে আস্বাদন করিতেই কাব্য-কবিতার জন্ম। এইখানেই বড় হইয়া ওঠে কাব্যসৃষ্টির ভিতরে বহিঃপ্রকাশের কথা। কাব্যের যাহা কলা-কৌশল তাহা তাহার বহিরঙ্গ-ধর্ম নহে, কারণ 'প্রকাশ' কাব্যের বহিরঙ্গ-ধর্ম নয়; একের মনের কথা বিশ্বজনের মনে সংক্রামিত করিবার কৌশলই কাব্যের যথার্থ কলা-কৌশল।

বিহারীলালের কাব্যের প্রধান দোষ হইয়াছে এই যে, তিনি তাঁহার মনের কথাকে সর্বত্র সুন্দর এবং মধুর করিয়া অপরের চিত্তে সংক্রামিত করিতে পারেন নাই; যেখানে তাহা পারিয়াছেন, সেইখানেই তিনি বড় কবি হইয়াছেন, যেখানে তাহা পারেন নাই, সেখানে তাঁহার ভাবের গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য-সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। একটা অতিরিক্ত আত্মগত ভাবই কবির কাব্যের এই দোষের জন্য দায়ী। এই অতিরিক্ত আত্মগত ভাবই তাঁহাকে কাব্যের প্রকাশধর্মের প্রতি অনেকখানি উদাসীন করিয়া রাখিয়াছিল। কবির কাব্যে এখানে সেখানে বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় যে প্রতিভার দীপ্তি পরিস্ফুট তাহাতে কবি আর একটু সচেতন শিল্পী হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে আরও সার্থক কাব্যসৃষ্টি আশা করিতে পারিতাম। বস্তুতঃ স্থানে স্থানে কবির লেখনী হইতে এমন চকিত ঝলকের

ন্যায় উজ্জ্বল পংক্তি বাহির হইয়াছে যে, তাহা একজন প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের কোন দ্বিধা বা সংশয় থাকে না। 'সারদা-মঙ্গলে'র প্রথমে উষার বর্ণনা করিতে কবি বলিতেছেন,—

বিরল তিমিরজাল, শুভ্র অভ্র লালে-লাল
মগন তারকারাজি গগনের নীলজলে।

এই 'মগন তারকারাজি গগনের নীলজলে' কথাটি কবির কাব্যে একটি নীলকান্তমণির ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল। তারপরে 'হিমাদ্রি-শিখর-পরে' আসিয়া যখন অকস্মাৎ আকাশের জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তখন—

বিকচ নয়নে চেয়ে হাসিছে দুধের মেয়ে,
তামসী-তরুণ-উষা কুমারীরতন।

হিমালয়ের বুকে ঝড়ের খেলা বর্ণনা করিতে গিয়াও কবি বলিয়াছেন—'ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে, বুকে খেলা করে ধেয়ে',— এ বর্ণনাও সার্থক। গীতহীনা বীণার বর্ণনা করিতে কবি বলিয়াছেন,—

চির আদরিণী বীণা কেন, যেন দীনহীনা
ঘুমায়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে অচেতন!

'প্রেম-প্রবাহিনী' কাব্যে 'বিষাদ' কবিতায় সন্ধ্যা বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাদেবী হাসিছেন রক্তাম্বর পরি,
ভৈরবে ভেটিছে যেন ভৈরবীসুন্দরী।

এই সকল চকিত চমকের ভিতর দিয়া কবির কাব্য-প্রতিভার

পরিচয় মেলে—কিন্তু চকিত চমকের ন্যায় তাহা বড় ক্ষণস্থায়ী। কাব্যের লোকোত্তর চমৎকারিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত আসিয়া গিয়াছে এমন লৌকিক বর্ণনা ও তাহার লৌকিক ভাষা যে আমাদের স্বপ্নও সব সময়ে জমিয়া উঠিতে সুযোগ পায় নাই; স্বপ্নমগ্ন মন সোনালি হইয়া রাঙিয়া উঠিতে উঠিতেই দমকা বাতাসে অপ্রত্যাশিত কালোমেঘ ভাসিয়া আসিয়াছে।

এই অলৌকিক ও লৌকিকের নিরন্তর মিশ্রণও বিহারী-লালের কাব্যে অনেক স্থানে রসভঙ্গের কারণ হইয়াছে। এই লৌকিক অলৌকিকের মিশ্রণ যেমন ঘটিয়াছে ভাবে, তেমনই ঘটিয়াছে ভাষায়। কাব্যের ভাষার ভিতরে এই লৌকিক এবং অলৌকিকের জাতিভেদের বিরুদ্ধে অনেক সময়ে কথা উঠিয়াছে। ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এক 'মাইকেল' কবিতায় এই ভাষার সাম্যবাদ খানিকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ নিজে তাঁহার কবিতা হইতে কি এই ভেদকে দূরীভূত করিতে পারিয়াছিলেন? 'প্রকৃতি-শিশুর আদিম উলঙ্গ' ভাষার জয়ধ্বনি করা অনেক সময়ে একটা সমজদারী রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কাব্যকে যতদিন অলৌকিক বা লোকোত্তর আখ্যা দেওয়া হইবে ততদিন কাব্যের ভাষার ভিতরেও এই লৌকিক এবং অলৌকিকের ভেদ থাকিয়াই যাইবে।

আমরা ভাষা দ্বারা চিন্তা করি না মনের চিন্তাকে ভাষা দ্বারা প্রকাশ করি, ইহা লইয়া দার্শনিক মহলে বিতর্ক রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে দার্শনিক সিদ্ধান্ত যাহাই হোক, কাব্যের ক্ষেত্রে সকল চিন্তা এবং ভাষা পরস্পর জড়িত হইয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। বিহারীলালের কাব্যের ভাব যে সর্বদা আমাদের কাছে পরিস্ফুট নহে, তাহার একটা কারণ এই বলিয়া মনে হয়, বিহারীলাল সচেতন ভাবে কাব্যের ভাষার তেমন কোনদিন অনুশীলন করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ভাবের রাজা, কিন্তু তথাপি তিনি আজীবন ভাষার অনুশীলন করিয়াছেন; ইহা রবীন্দ্রনাথের কিছুই অগৌরবের নহে। বিহারীলাল যদি ভাবের নেশায় মশগুল হইয়া নিজেকে বিশ্বজগৎ হইতে একেবারে একান্ত নিভৃতে আপনার ভিতরেই গুটাইয়া না লইয়া কাব্যের এই ভাষা—এই কলা-কৌশল সম্বন্ধে আর একটু অবহিত হইতে পারিতেন, তবে তাঁহার বিরাট কবিমন লইয়া তিনি বাঙলা-সাহিত্যের গগনে হয়ত আরও উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে পারিতেন। তথাপি তাঁহার 'সারদা'র কল্পনার মৌলিকতায় ভাবের গভীরতায় এবং স্থানে স্থানে বর্ণনার চমৎকারিত্বে তিনি যে কাব্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও বাঙলা-সাহিত্যে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল ভাবিতে মন বিস্মিত এবং পুলকিত হইয়া ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা

ভারতীয় চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করিলে একথা স্বতঃই মনে উদিত হয়, বাস্তব জগৎ এবং জীবনকে আমরা কোন দিনই যেন তেমন একটা মূল্য দিই নাই। সাহিত্যের ভিতরে অবশ্য জীবনকে অনেক স্থানে পাইয়াছি তাহার বাস্তব রূপে,—কিন্তু সেখানে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসা নাই,—নিজস্ব কোন সিদ্ধান্তও নাই। অন্য প্রায় সর্বত্রই আমাদের যে পরম শ্রেয়োবোধ তাহা এই ধূলামাটির জীবনকে ছাড়াইয়া অন্য লোকে তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে। আমাদের পরম শ্রেয়োবোধটি কি তাহা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইহা মোক্ষ; এই মোক্ষের আদর্শই বিভিন্ন চিন্তাধারার ভিতর দিয়া বিভিন্ন রূপে আমাদের সম্মুখে শ্রেয়োবোধ রূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই মোক্ষের ভিতরে ত রহিয়াছে বাস্তব জীবনের চরম অস্বীকার,—জীবনের সেখানে মূল্য কোথায়? বৈষ্ণবেরা অবশ্য মোক্ষের আদর্শ ত্যাগ করিয়া অনাদি অনন্ত প্রেমাস্বাদনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সেখানেও ত সকলই অপ্রাকৃত, প্রাকৃত জীবনটির কি তবে আর কোনও মূল্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? অবশ্য বৌদ্ধ 'শূন্যবাদ'

এবং বেদান্তের 'মায়াবাদে' হাঁপাইয়া ওঠা আমাদের মনটি বৈষ্ণবদের কাছে আসিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইল ; অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিলাম, এই যে বহুবিচিত্র বাস্তব জগৎ, ইহা একেবারে অর্থহীন নির্মম মিথ্যা নহে,—এই বিরাট সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে যে বিরাট শক্তি সে নিছক ভ্রম মাত্র নহে,—নিছক মায়া মাত্র নহে,—সে বিধাতা-পুরুষেরই আপন শক্তি,—সেও পারমার্থিক সৎ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধাতা-পুরুষেরই বিলাসবিভূতি মাত্র (তদ্বিভূতিভূতং জগদপি পারমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে)।

জগৎটা যে একেবারে অর্থহীন মিথ্যা ভ্রম মাত্র নহে, বৈষ্ণবদের কাছে এইটাই পাইলাম একটা পরম লাভ। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণবেরাও আর মাটির ধরায় বেশী দূর নামিলেন না,—তাঁহারাও ছুটিলেন অপ্রাকৃত প্রেমের দিকে ;—প্রাকৃত জগতের প্রেমকে বুকে করিয়া প্রাকৃত জনগণ শুধুই বসিয়া ভাবিতেছে,—এ প্রেমের জন্য স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—কোথায় একটুকু ঠাঁই করিয়া লওয়া যায় !

এই যে বৈষ্ণবদৃষ্টিটি—যাহা জগৎকে একেবারে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেয় না,—অথবা এই জগৎ-ব্যাপারের অন্তর্গূঢ় সৃজনি-শক্তিকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে না, এই দৃষ্টিভঙ্গিটি একটি বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে। রবীন্দ্রনাথের এই যে

বিশিষ্ট বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গি তাহা তাঁহার বিশেষ কোন কাব্য বা রচনার ভিতর দিয়াই যে একটা সুযৌক্তিক দার্শনিক মতবাদ-রূপে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, একথা বলা যায় না। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কবিতার ভিতর দিয়া এই মতবাদগুলি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং তাহার কাব্যসৃষ্টির ভিতর এই মতবাদটির একটি সমগ্র রূপ ব্যতীত সুনিয়ন্ত্রিত কালগত ক্রমাবর্তনের ধারাও খুব স্পষ্ট করিয়া খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

আমরা রবীন্দ্রনাথের বলাকার যুগের কবিতাগুলির ভিতর একটা মূলসুর পাই যে, জীবনের গতিই সব চেয়ে বড় সত্য,—সে শুধু ব্যক্তি-জীবনের সত্য নহে,—সে বিশ্ব-জগতেরই বিশ্বজীবনেরই মূল সত্য।

দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
... ...
শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনেরাতে

এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে!"

ইহাই বলাকার মূল সুর। শূন্য আকাশের নিরুদ্দেশগামী বলাকা-শ্রেণীর ন্যায় এই নিখিল বিশ্ব-সৃষ্টি যেন একটা অনাদি অনন্ত প্রবাহের স্রোতে ছুটিয়া চলিতেছে,—কোথায় যাইতেছে তাহাও জানা নাই—কোথা হইতে তাহাও জানা নাই। কিন্তু বিশ্ব-সৃষ্টি যদি আকাশের বলাকার মত গতির আবেগে মত্ত হইয়াই অনন্ত প্রবাহে নিশিদিন ছুটিয়া চলিবে, এবং আমাদের জীবনও যদি এই বিশ্বপ্রবাহের তালে তালে গতির আবেগে অনন্তকাল ছুটিয়া চলে, তবে বিশ্ব-সৃষ্টিরই বা মূল্য কোথায়,—আমাদের জীবনেরই বা মূল্য কোথায়? অনেকস্থানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, জীবনে তিনি পথিক মাত্র,—পথ চলাতেই তাঁহার আনন্দ,—পথে চলার নিত্য রসেই তাঁহার জীবন মত্ত হইয়া উঠিতেছে।

বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে,
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি॥ (গীতালি)

'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতায়ও দেখিতে পাই,—

পার্‌বি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে,
খ'সে যাবার ভেসে যাবার ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে।
পাতিয়া কান শুনিস্‌ না যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণ বীণায় কি সুর বাজে তপন-তারা-চন্দ্রেরে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে জ্বল্‌বারই আনন্দে রে॥
পাগল করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেইবা জানে,
চায় না ফিরে পিছন পানে রয় না বাঁধা বন্ধেরে
লুটে যাবার ছুটে যাবার চল্‌বারই আনন্দে রে॥
সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন ব'য়ে যায় ধরাতে বরণ গীত গন্ধেরে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার মর্‌বারই আনন্দে রে॥

কিন্তু এই যে পাগল-করা গানের তানেই বাধা-বন্ধহীন ছুটিয়া চলার আনন্দ—এই যে খসিয়া যাওয়া—ধ্বসিয়া যাওয়া—এই যে জীবন হইতে মরণে এবং মরণ হইতে জীবনের দিকে যাত্রা ইহার পশ্চাতে যদি জীবনের আর কোনও গভীর অর্থ আবিষ্কৃত না হইয়া থাকে, তবে এ চলার আনন্দ শুধুই কাব্যানন্দ,—মন তাহাতে সত্যকার কোন সান্ত্বনাই লাভ করিতে পারে না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলি বিচার করিলে মনে হয়, কবি হিসাবে তিনি এই অনাদি অনন্ত

চলার আনন্দকেই জীবনে সব চেয়ে বেশী মূল্য দিয়াছেন। 'বলাকা'র পূর্ববর্তী যুগের কবিতাগুলির ভিতরে দেখিতে পাই, কবি আভাসে ইঙ্গিতে অনেক স্থলে এ কথা বলিয়াছেন যে, এই চলা একদিন যেন কোথায় কোন্ এক প্রিয়তমের সহিত মিলনে সার্থক হইয়া উঠিবে; কিন্তু 'বলাকা' এবং তৎপরবর্তী যুগে দেখিতে পাই, চলার এই পরিণতি বা চরম উদ্দেশ্যকে কবি যেন আর কোথাও স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করেন নাই,—শুধু "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!' ইহাই যেন সেখানে কবির প্রধান সুর। তবে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় যত চলার গান তাহাকে সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে জীবনের একটা গভীর দর্শন। সেই দর্শনটিকেই আগে একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জীবনের সত্য একটি অখণ্ড প্রবাহে —এবং একটি সমগ্রতার ভিতরে। অখণ্ডত্ব এবং সমগ্রত্বই সত্যের লক্ষণ। খণ্ড আপনাতে আপনি অসৎ,—সে অর্থহীন। তাহার সত্তার ভিতরে রহিয়াছে যেখানে একটা সমগ্রতার সহিত অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ, সেইখানেই তাহার সত্য—সেইখানেই তাহার মূল্য। মানুষের ধর্ম ই তাই গতির ধর্ম এবং সমগ্রতার ধর্ম। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম, অঙ্কুর হইতে পল্লব,—তাহা হইতে শাখা-প্রশাখা—তাহা হইতে ফুল,—তাহা হইতে ফল,—ফল হইতে আবার বীজে পরিণতি,—বৃক্ষের জীবনের

এই প্রবাহের ভিতরে কোথাও থামিয়া আমরা বৃক্ষের সত্যকে লাভ করিতে পারি না; তাহার সত্য নিহিত রহিয়াছে অখণ্ড প্রাণ-স্পন্দনের ভিতরে সকল অংশ জুড়িয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন 'হওয়া'র ভিতরে।

'বঙ্গভাষার লেখকে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"ফুল যখন ফুটিয়া ওঠে, তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—এম্‌নি তাহার সৌন্দর্য্য—এমনি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয়, যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরম ধন—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্যমাত্র, সে কথা গোপনে থাকে—বর্ত্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সে-ই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এম্‌নি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।" এই সমগ্রের পরিণতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমরা যদি কোনও বিশেষ খণ্ডরূপের ভিতরে ফুলের সত্য খুঁজিতে যাই, তবে সত্যকে লাভ করিতে পারিব না।

মানুষের জীবনের ভিতরেও রহিয়াছে এই জাতীয় একটা নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ডত্ব। জীবনের কোনও অংশকে যখন আমরা এই সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র মূল্য

দিতে যাই, তখনই আমরা জীবনের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না। সুতরাং জীবনকে যখনই বিচার করিতে হইবে, তাহাকে একটি সমগ্রের অংশ করিয়া—সমগ্রের সহিত একতানতায় তাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে হইবে। 'বলাকা'র ভিতরে দেখিতে পাই জীবনের সেই অখণ্ড দৃষ্টি—সেই প্রবহমান সমগ্রতা,—প্রথম প্রাণ-স্পন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া অতীতের নিরবচ্ছিন্ন ধারা এবং ভবিষ্যতের অখণ্ড প্রবাহের সহিত তাহার নিবিড় সংযোগ।

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে,
গান হ'তে গানে। (বলাকা)

জীবনের প্রথম স্পন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবন ছুটিয়া চলিয়াছে একটি পরিপূর্ণ বিকাশের পথে। এই পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যে অনন্ত প্রবাহ, তাহার সমগ্রতার ভিতরেই আছে জীবনের ধর্ম। জীবনের সকল ওঠা-নামা, ভাঙা-পড়ার ভিতর দিয়া পার্বত্য উপলখণ্ডের ভিতরে প্রবাহিত

ধারাটির মত জীবন সম্মুখের পানেই ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনের যে সুখদুঃখ, যে প্রেম-ভালবাসা জীবনের সেই প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া সমগ্র-নিরপেক্ষ ভাবে আপনার অস্তিত্ব জাহির করিতে চায়, জীবন তাহাকে উৎসবের শেষে মৃৎ-পাত্রের মত দুই পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু জীবনের এই অখণ্ডত্বের ভিতরেই বা জীবনের মূল্য কোথায়? জীবনের কীর্তি হইতে জীবন অনেক মহৎ, তাই জীবনের একান্ত বড় পাওয়াও যেমন সত্য,—সম্মুখের প্রবাহে তাহাকে একান্তভাবে ছাড়িয়া যাওয়াও সেইরূপই সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,—

এ দু'য়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।

এমন একটি মিল নিশ্চয়ই বিশ্ব পাইয়াছে যেখানে তাহার সকল পাওয়া এবং ছাড়িয়া যাওয়া উভয়ই সমান হইয়া যায়। এই মিলটি রহিয়াছে জীবনের মূল আদর্শটির ভিতরে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই মূল আদর্শটির সহিত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হেগেলের মতের একটি অত্যাশ্চর্য মিল রহিয়াছে,—এ ইঙ্গিত পূর্বেই কেহ কেহ করিয়াছেন; কিন্তু হেগেলীয় মতবাদের সহিত মিল থাকা সত্ত্বেও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, এ আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে

উপনিষদের মূলভিত্তিতে, এবং ভারতীয় বিভিন্ন যুগের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভক্ত কবিগণ ইহার ভিতরে জোগাইয়াছেন কিছু কিছু প্রেরণা।

'বলাকা'র বহু পূর্বযুগেই রবীন্দ্রনাথের ভিতরে জীবনের এই দর্শনটি বহু স্থানে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হেগেলের মতবাদের সহিত যখন তাহার গভীর সামঞ্জস্য, তখন সেই দিক হইতেই এই মতবাদটিকে একটু চিনিয়া লওয়া যাক। হেগেলের মতে এই যে বিশ্বসৃষ্টির নিখিল প্রবাহ, ইহার কিছুই অর্থহীন নহে,—একটা গভীর অর্থকে বহন করিয়া তাহারই প্রকাশরূপে এই সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদিকাল হইতে অনন্তের পথে ধাইয়া চলিতেছে। এই নিখিল বিশ্বপ্রবাহটি একটি বিরাট বিশ্ব-মনেরই চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এক সর্বনিরপেক্ষ (Absolute) পুরুষই এই সকল সৃষ্টি প্রবাহের ভিতর দিয়া আত্মোপলব্ধি করিতেছেন মাত্র। এই আত্মোপলব্ধির মূল কথা হইল আত্ম-চেতনা; এই আত্ম-চেতনার ভিতর দিয়াই আমরা নিজেদের ভিতরে একটু একটু করিয়া পাই নিজেদের পরিচয়। কিন্তু এই আত্ম-চেতনা লাভ হয় কি করিয়া? নিজের সত্তার ভিতরে যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার বহিঃপ্রকাশের ভিতর দিয়াই আমরা লাভ করি আমাদের সত্যকার পরিচয়। সেই আত্ম-পরিচয় এবং আত্ম-চেতনার ভিতরেই রহিয়াছে আমাদের আত্মোপলব্ধি। চিন্মাত্র-সৎ ব্রহ্মের ভিতরে এই

বিরাট জগৎ-ব্যাপার তাহার সকল অতীত, অনাগত এবং বর্তমানকে লইয়া নিহিত আছে অনন্ত সম্ভাবনারূপে। আপন সত্তার সেই অনন্ত সম্ভাবনার বাস্তব পরিণতিতে হইল এই বিশ্ব-সৃষ্টি। এই সৃষ্টি-প্রবাহের ভিতর দিয়া সেই বিরাট পুরুষ শুধু লাভ করিতেছেন আত্ম-পরিচয়, এবং ইহার ভিতর দিয়াই তিনি আপন অনন্ত সম্ভাবনাময় সত্তায় সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। সুতরাং এই জগৎটি—এই প্রবহমান সৃষ্টিটি মিথ্যা নহে,—মায়া নহে,—ইহার মূলে রহিয়াছে গভীর অর্থ,—একটা গভীর উদ্দেশ্য। সৃষ্টি-প্রবাহ ঠিক ততখানি সত্য যতখানি সত্য স্রষ্টার আপন সত্তা—কারণ এই সৃষ্টি-প্রবাহের ভিতর দিয়াই জাগিয়া উঠিতেছে স্রষ্টার বহুবিচিত্র সত্তাটি। এইভাবে সমগ্র বিশ্ব-প্রবাহের ভিতরে রহিয়াছে একটি গতির ছন্দ—একটি গভীর ঐক্যতান,—সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির প্রবাহ জড়াইয়া আপন অন্তর্গূঢ় মহিমায় জাগিয়া উঠিতেছে বিশ্বের জীবনদেবতা,—তিনিই বিশ্বদেবতা।

রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও বহুরূপে পাইয়াছি এই বিশ্ব-জীবন এবং জীবনদেবতার আদর্শ। আমাদের জীবনের ভিতরে যে শুধু অতীত, বর্তমান ও অনাগতকে জুড়িয়া রহিয়াছে একটা অনন্ত ধারা তাহা নহে, বিশ্বজীবন—নিখিল সৃষ্টি-প্রবাহের সহিতও তাহার রহিয়াছে একটা ঐক্যতান। এই জীবনের সকল সুখদুঃখ, ওঠা-নামা, ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়া আমরা বিশ্ব-জীবনের সহিত একযোগে একটা

প্রকাশের পথে একটা পূর্ণতার পথে ছুটিয়া চলিয়াছি; সুতরাং জীবনের কিছুই তুচ্ছ ক্ষুদ্র নহে,—কিছুই অর্থহীন নহে; জীবনের প্রবাহ চলিয়াছে এই দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা, আশা-নিরাশা, উত্থান-পতন লইয়া। সে প্রবাহের প্রতিটি স্পন্দন আমাদিগকে আগাইয়া দিতেছে পূর্ণ প্রকাশের পথে,—আর আমাদের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইতেছেন—আত্ম-সচেতন হইয়া উঠিতেছেন আমাদের জীবন-দেবতা! The Religion of Man গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি বাল্যকালের অনুভূতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—একদিন তিনি তাঁহার পড়ার ঘরে বসিয়া পাঠ্য পুস্তক পড়িতেছিলেন; সেখানে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে', —এই ছন্দোযুক্ত বাক্যটি এবং তাহার ছবিটি বালক রবীন্দ্রনাথের মনে এক নূতন অনুভূতির রাজ্য খুলিয়া দিয়াছিল। "The unmeaning fragments lost their individual isolation and may mind revelled in the unity of a vision. In a similar manner on that morning in the village the facts of my life suddenly appeared to me in a luminous unity of truth. All things that had seemed like vagrant waves were revealed to my mind in relation to a boundless sea. I felt sure that some Being who comprehended me and my world

was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever-widening individuality which is a spiritual work of art." (পৃঃ ৯৬) অর্থাৎ, "জগতের সকল অর্থহীন খণ্ডতা তাহাদের অবিযুক্ত স্বাতন্ত্র্যকে হারাইয়া ফেলিল এবং আমার মন একটা ঐক্যের ধ্যানের ভিতরে মগ্ন হইয়া গেল। সেই একই ভাবে সেই পল্লীর প্রভাতে আমার জীবনের সকল ঘটনাগুলি সহসা একটা জ্যোতির্ময় অদ্বৈত সত্যের ভিতরে প্রতিভাত হইল। যাহা কিছু উদ্দেশ্যহীন অসংহত ঢেউয়ের মত মনে হইতেছিল, তাহারা আমার মনের মধ্যে একটা সীমাহীন সাগরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইল। আমি স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিলাম যে,—একটি পুরুষ আমাকে এবং আমার জগৎকে নিজের ভিতরে ধারণ করিয়া আছেন, এবং আমার সকল অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, এবং আমার জীবনের সকল অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিগুলিকে একটি ঐক্যের ভিতরে ধারণ করিয়া একটি অনন্তপ্রসারী ব্যক্তি-পুরুষ গড়িয়া তুলিতেছেন, ইহা একটা আধ্যাত্মিক শিল্প-সৃষ্টি মাত্র।"

একদিকে অতীত, বর্তমান এবং অনাগতকে জুড়িয়া ব্যক্তিজীবনের অখণ্ডতা এবং অন্যদিকে এই অখণ্ড ব্যক্তি-জীবনের সহিত অখণ্ড বিশ্বজীবনের নিগূঢ় যোগের দিকে

দৃষ্টিপাত করিলে জীবনের আর কিছুই অর্থহীন থাকে না,—জীবনের অনাদি অনন্ত চলার গানও তখন একটা গভীর অর্থে ভরপূর হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন,—"আমি বেশ বুঝতে পারচি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,—আমার সুখ, দুঃখ, অন্তর, বাহির, বিশ্বাস, আচরণ, সমস্ত মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।......... জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজন-রহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে—প্রত্যেক কথাটা বানান করে' পড়তে হ'লে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না, কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজন-শক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে' তৈরি হ'য়ে উঠবে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে' একটা সৃজন চল্‌চে; আমার সুখ-দুঃখ-বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ কর্‌চে। এই থেকে কি হ'য়ে উঠ্‌বে জানি নে, কারণ, আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ ক'রে দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ

আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখ্‌তে পাই—আমি আছি, আমি হচ্চি, আমি চল্‌চি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাক্‌তে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—এই জন্যই এই জ্যোতির্ম্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে' পরিব্যাপ্ত করে' নেয়।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাত্মবোধের সহিত মিলিত হইয়া আছে একটি পূর্ণের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই আমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব এই পূর্ণের আদর্শ। আমাদের ভিতর দিয়াই বিশ্বদেবতা লাভ করিতে চলিয়াছেন তাঁহার পূর্ণ আত্মানুভূতি; সেই চাওয়ার ফলেই বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে লাগিয়াছে একটা প্রকাশের ঢেউ। সেই প্রকাশের ছন্দেই জাগিয়াছে গতি-প্রবাহ;—সেই প্রকাশের পরিপূর্ণতা এবং তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বদেবতার আত্ম-চেতনা এবং আত্মানুভূতির পরিপূর্ণতাই সকল সীমাকে সকল খণ্ডকে গভীর অর্থ দান করিতেছে। সকল চলার ভিতরে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রকাশমান দেবতার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছেন,—তাই সকল চলা উঠিয়াছে সার্থক হইয়া। তাই ত তিনি বলিয়াছেন,—

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দ গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া॥ (গীতাঞ্জলি)

যাত্রা-পথের আনন্দ-গান গাহিয়া যে চলিতেছে তাহার কণ্ঠে সেই প্রকাশের দেবতাই আপন গান গাহিতেছেন,—সেই গানেই তাহার যাত্রা-পথের গান সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। এই যে গভীর বিশ্বাস,—আমার ভিতরে থাকিয়া এক অন্তর্যামী পুরুষ তাঁহার সুন্দরতম প্রকাশ খুঁজিতেছেন এবং আমাদের সকল অনুভূতিগুলিকে একটা ঐক্যের ভিতরে ধারণ করিয়া আমাদের মধ্যে একটি অনন্তপ্রসারী ব্যক্তি-পুরুষ গড়িয়া তুলিতেছেন, ইহাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি নূতন অর্থের সঞ্চার করিয়াছে। তাই দেখি জীবনে কিছুই নষ্ট হয় না। যে অলস মুহূর্তগুলি নষ্ট হইয়া গেল বলিয়া মনে হয় তাহাও নষ্ট হয় নাই,—

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি' কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুর রূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুট বর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে॥ (নৈবেদ্য)

আমাদের বর্তমান কখনও বর্তমানের ভিতরে সম্পূর্ণ বা সার্থক নহে। তাহাকে সেই বর্তমানের ভিতরেই যখন জীবনের

পূর্ণাদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া খণ্ড করিয়া দেখি তখনই সে হয় অর্থহীন,—তখনই সে বহন করে অপূর্ণতার বেদনা। কিন্তু জীবনের যে অখণ্ড পূর্ণাদর্শ রহিয়াছে, তাহার ভিতরে কোনও অসম্পূর্ণতা বা অসমাপ্তি নাই। তাই জীবনের সন্ধ্যায় দাঁড়াইয়া কবি বলিতেছেন,—

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চল তলে ঢাকি'।
আঁধারের সাথী তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকী॥

যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল প'ড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হ'য়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে॥ (গীতালি)

এই যে পূর্ণের ভিতরে জীবনের কিছুই ফেলা যায় না,—আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের অযাচিত ভাবে পূর্ণ-স্বরূপের বীণায় যে তাহারা গিয়া অপূর্ব ঝঙ্কার তুলিতেছে, গীতাঞ্জলির

আর একটি গানে তাহা অতি স্পষ্ট এবং মধুর হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে কবির দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে,—

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥

জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তা'রা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥

এই যে পরম সত্যস্বরূপ আমাদের খণ্ড জীবনের ভিতর দিয়া নিরন্তর বিকাশ লাভ করিতেছেন, এবং সেই বিকাশের ভিতর দিয়া দুঃখ-সুখের লক্ষ রস-ধারায় আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতেছেন, তিনিই জীবন-দেবতা। বিশ্বজীবনের সমগ্রতার ভিতর দিয়া যে দেবতা নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই প্রকাশের ভিতর দিয়া নিজেকে নিরন্তর উপলব্ধি এবং আস্বাদ করিতেছেন, তিনি বিশ্ব-দেবতা; কিন্তু সেই বিশ্ব-দেবতাই আবার আমার বিশেষ ব্যক্তিসত্তার ভিতর দিয়া লাভ করিতেছেন একটি বিশেষ প্রকাশ—একটি বিশেষ 'আমি'র ব্যক্তিকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত

বিশ্ব-দেবতার বিশেষ রূপই হইতেছেন জীবন-দেবতা এ-সম্বন্ধে The Religion of Man গ্রন্থে কবি বলিয়াছেন, "To this Being I was responsible; for the creation in me is his as well as mine. It may be that it was the same creative Mind that is shaping the universe to its eternal idea: but in me as a person it had one of its special centres of a personal relationship growing into a deepening consciousness. I had my sorrows that left their memory in a long burning track across my days, but I felt at that moment that in them I lent myself to a travail of creation that ever exceeded my own personal bounds like stars which in their individual fire-bursts are lighting the history of the universe. It gave me a great joy to feel in my life detachment at the idea of a mystery of a meeting of the two in a creative comradeship. I felt that I had found my religion at last, the religion of Man, in which the infinite became defined in humanity and came close to me so as to need my love and co-operation."

এই জীবন-দেবতার প্রকাশ সুন্দরতম, মধুরতম, বিচিত্রতম হইয়া উঠিয়াছে সসীম মানুষের সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়া। তাই মানুষের খণ্ড ব্যক্তিপুরুষের সহিত সেই অখণ্ড পরম পুরুষের রহিয়াছে একটি নিবিড়তম রসসংযোগ, তাহাই গভীর প্রেম। জীবনের সকল দুঃখসুখের লক্ষ ধারাকে দলিত দ্রাক্ষারসের মতন আমরা নিশিদিন পাত্র ভরিয়া সেই অন্তরতমের মুখের কাছে ধরিতেছি,—এ জীবনের সকল রস-সম্ভারের ভিতর দিয়া সেই জীবন-দেবতাই যেন নিজেকে অনন্ত রসে সিক্ত করিয়া অনুভব করিতেছেন। তাইত ব্যক্তি-পুরুষ সেই জীবন-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—

আপনি বরিয়া ল'য়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো হে জীবন-নাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে।
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া আপন সিংহাসনে।
মানস কুসুম তুলি' অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ মম যৌবনবনে॥ (চিত্রা)

কবি বলিতেছেন, এ জীবনের বৈচিত্র্য এবং রস-মাধুর্য যদি জীর্ণ হইয়া থাকে, তবে নব-জীবনের ভিতর দিয়া জীবন

আবার বিচিত্র মধুর হইয়া উঠুক,—সেখানে জীবনের নব নব রসলোকে জীবন-দেবতা নিজকে আবার নবীনতার গভীরতার ভিতরে উপলব্ধি করিতে পারিবেন,—ব্যক্তি-জীবনের সহিত সেখানে জীবন-দেবতার লাগিবে নব জীবনের ডোর।

এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ যা কিছু আছিল মোর,
যত শোভা যত গান যত প্রাণ, জাগরণ, ঘুমঘোর।
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরা-বিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা আজি কি হয়েছে ভোর।
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আন নবরূপ, আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে॥ (চিত্রা)

এই 'জীবন-দেবতা' রবীন্দ্রনাথের নিকটে একটা স্পষ্ট কোন ধর্ম বা দার্শনিক মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয় নাই; এ সত্যকে তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার সমগ্র জীবনের হৃদয়ানুভূতির ভিতর দিয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র কাব্য-কবিতার ভিতর দিয়া যে সত্যকে লাভ করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই হৃদয়ের সত্য। উপনিষদের ঋষি যেমন বুদ্ধির হিরণ্ময় পাত্রকে সরাইয়া ফেলিয়া হৃদয়ের গভীর কন্দরে লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন সত্যকে, রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন তাহাই। এই যে হৃদয়ের

রসানুভূতির ভিতরে সত্যলাভ, ইহা শুধু কাব্যের সত্য নহে,—রবীন্দ্রনাথ এই রসানুভূতিলব্ধ সত্যকে দিয়াই গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন সাহিত্য, নীতি, ধর্ম ও সমাজ। রবীন্দ্রনাথের ভিতরে যে কবিপুরুষ ছিলেন এবং তত্ত্বার্থী ধার্মিক পুরুষ ছিলেন, এ দু'য়ের ভিতরে তিনি কখনও কোনও তফাৎবাদ করিতে পারেন নাই,—সত্যকার কবির পক্ষে সে তফাৎবাদ কখনো সম্ভবও নহে। আজীবনের যে রসানুভূতি তাঁহাকে দান করিয়াছিল তাঁহার কাব্য-প্রেরণা, তাহাই দান করিয়াছিল তাঁহাকে ধর্মপ্রেরণা; হৃদয়ের এক উৎস হইতেই সকল ধারা প্রবাহিত। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের নিকটে কাব্যের সত্য এবং পারমার্থিক সত্যের ভিতরে কোনই তারতম্য নাই,—রসানুভূতির ভিতর দিয়া যে সত্যই আবির্ভূত হইয়াছিল তাঁহার অন্তরে, তাহাদ্বারাই তিনি লাভ করিতে চাহিয়াছেন পরমার্থকে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার 'অন্তর্যামী' কবিতাটির ভিতর দিয়া। আলোচনার সুবিধার জন্য কবিতাটিকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি; প্রথমভাগে যে অন্তর্যামীর কথা কবি বলিয়াছেন,—উহাকে ইচ্ছা করিলে আমরা নিছক কাব্যের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি,—সে অন্তর্যামী কবির কাব্য-জীবনের অন্তর্যামী। দ্বিতীয়ভাগে সেই কাব্য-জীবনের অন্তর্যামীই আসিয়া দেখা দিল সমগ্র ব্যক্তি-জীবনের

অন্তর্যামীরূপে,—সেই ব্যক্তি-জীবনের অন্তর্যামীই গিয়া পরিণতি লাভ করিল বিশ্ব-জীবনের অন্তর্যামীরূপে। বুদ্ধির-দ্বারা বিচার করিয়া লইতে হইলে আমরা এখানে আপত্তি তুলিতে পারিতাম যে, কাব্যের সত্য যে কেমন করিয়া জীবনের অধ্যাত্মসত্য হইয়া উঠিল,—ব্যক্তি-জীবনের সত্য যে আবার কেমন করিয়া বিশ্ব-জীবনের সত্য হইয়া উঠিল, তাহার ভিতরকার যোগসূত্রটি এই কবিতায় আমরা স্পষ্ট করিয়া পাই নাই; কিন্তু কবির কাছে কাব্য-জীবনের সত্যই যে ব্যক্তি-জীবনের অধ্যাত্মসত্য এবং তাহাই যে আবার বিশ্ব-জীবনেরও সত্য—ইহা একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নহে,—ইহা একটা হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস।

প্রথমভাগের এই কৌতুকময়ী অন্তর্যামী কে? এখানে কোন আধ্যাত্মিক সত্যের দ্বারস্থ না হইয়া প্রথমে আমরা বলিতে পারি যে, এ অন্তর্যামী কবির চেতন লোকের আড়ালে বিরাজমান আন্তর সত্তা। আমাদের কাব্য-প্রক্রিয়া কোন সচেতন প্রক্রিয়া নহে,—তাহার রহস্য নিহিত হইয়া আছে আমাদের অন্তরের গভীরতম রহস্যলোকে,—যাহাকে দেখিয়া বুঝিয়া আমরা নিজেরাই বিস্মিত হইয়া যাই,—ইহা কোথায় ছিল, কিরূপে ইহার সৃষ্টি হইল। শুধু কাব্য-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই নহে,—মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, আমাদের সমগ্র মানসিক প্রক্রিয়ার প্রধান অংশই এইরূপ যবনিকার অন্তরালে সাধিত হইতেছে, কারণ, মন

জিনিসটিরই নবমাংশের একাংশ শুধু থাকে চেতন-বারির উপরে ভাসমান,—আর অবশিষ্ট সব অংশ থাকে অবচেতন এবং অচেতনে ডুবিয়া। সেই অবচেতন এবং অচেতনে আমাদের চলিতেছে যত প্রক্রিয়া তাহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে আমাদের চেতন-লোককে। চেতন-লোক তাই নিজেই সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না,—কাহার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিশিদিন তাহাকে কি রাগিণীতে বাজিয়া উঠিতে হইতেছে। সেই রহস্যময় অবচেতন ও অচেতনের অন্ধকারেই বাস আমাদের অন্তর্যামীর।

আসল কথা এই, আমাদের সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমাদের অজ্ঞাতে গড়িয়া উঠিতেছে এক রহস্যময় লোকে একটি আন্তর সত্তা। জীবনের যত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সকল ভাল-লাগা মন্দ-লাগা—কিছুই একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে না,—সকল অনুভূতি একে একে গিয়া আমাদের ভিতরে জমা হইতেছে একটি ক্রম-বিকাশমান ব্যক্তিসত্তার ভিতরে; সেই অখণ্ড আন্তর সত্তাই আমাদের অন্তর্যামীরূপে সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে নিজ হাতে। কবির মনে যাহা কিছু কাব্য-প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহা তাঁহার এই সমগ্র আন্তর সত্তারই স্পন্দনমাত্র। সচেতন লোকে বর্তমানের ভাসমানতায় জাগিয়া ওঠে কবির যে 'আমি', সে 'আমি' খুঁজিয়া পায় না তাহার

অন্তরের গভীরে নিমগ্নমান 'আমি'কে ; অথচ প্রতি মুহূর্তে কবি সচেতন হইয়া ওঠেন তাঁহার সেই আন্তর-পুরুষের বহু-বিচিত্র সৃষ্টিলীলা সম্বন্ধে। সত্যকারের কোন কাব্যই কবির কোন এক মুহূর্তের খেয়ালে সৃষ্ট হয় না ; বর্তমানের আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাবকে অবলম্বন করিয়া কবির সমগ্র পুরুষীয় সত্তার ভিতরে আসে যে স্পন্দন, তাহারই স্বতঃপ্রকাশ কাব্যে। স্বতঃপ্রকাশ বলিতেছি এই অর্থে যে, সে প্রকাশের ভিতরেও যতটুকু থাকে কবির বর্তমান আমির সচেতন প্রচেষ্টা, তদপেক্ষা অনেক বেশী থাকে সেই আন্তর স্পন্দনেরই আপনাকে আপনি বাহিরে আনিবার অচেতন এবং অবচেতন প্রক্রিয়া।

সকল যুগের সকল কবিই নিজের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার ভিতরে এই অন্তর্যামী আন্তর সত্তাকে অনুভব করিয়াছেন। নিজের সৃষ্টি যেন নিজের সৃষ্টি নয়, আর একটি অজ্ঞাত সত্তা যেন নিজের ভিতর হইতে সমস্ত সৃষ্টি-কার্য তাহারই ইচ্ছানুরূপ সম্পন্ন করাইতেছে। আদিকবি বাল্মীকিও এই কথা বলিয়া-ছিলেন। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিরহে বিমথিত হৃদয় হইতে তাঁহার অজ্ঞাতে আপনা আপনি পাদবদ্ধ, অক্ষরসম, তন্ত্রীলয়-সমন্বিত যে কাব্য বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছিলেন,—

'শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।'

এই ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে শোকার্ত হইয়া আমি যাহা

বলিলাম, তাহা কি? কবির বর্তমানের সচেতন 'আমি' ভাবিয়া পাইতেছে না,—ইহা কি, কেমন করিয়া হইল;—কবির অন্তর্যামী-পুরুষ অন্তরে বসিয়া হাসিতেছেন,—এ সৃষ্টি যে তাঁহার। ক্রৌঞ্চমিথুনের শোক দ্রবীভূত করিয়া দিয়াছিল কবির আন্তর সত্তাকে,—সেই বিদ্রাবণে আপনা আপনি জাগিল ছন্দ, সঙ্গীত—কারুকার্যময়ী ভাষা। সত্যকার কাব্যের ধর্মই এই। অভিনব গুপ্ত আনন্দবর্ধনের টীকায় বলিয়াছেন,—"নিরূপ্যমাণানি সন্তি দুর্ঘটনানি বুদ্ধিপূর্বং চিকীর্ষিতমপি কর্তুমশক্যানি। তথা নিরূপ্যমাণত্বে দুর্ঘটনানি। কথমেবং রচিতানীত্যেবং বিস্ময়াবহানি।" ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা করিয়া ইহাকে রচনা করা যাইতেছে না,—অথচ আপনা আপনিই কি করিয়া যে সে রচিত হইয়া উঠিল, ইহাই কবির পরম বিস্ময়। সমগ্র হৃদয়কে বিমথিত করিয়া কোথা হইতে যে এ সঙ্গীত, এ লাবণ্য—এত আনন্দ, এত বেদনা ফুটিয়া উঠিতেছে, বর্তমানের 'আমি' তাহা কিছুই জানিতেছে না;—নিজের সৃষ্টির পানে তাকাইয়াই তাহার অন্তরে জাগিতেছে পরম বিস্ময়!

আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

কবি তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া যে সত্যকে লাভ করিলেন, তাহাই সত্য বলিয়া মানিলেন তাঁহার সমগ্র জীবন-লীলায়। কাব্য-সৃষ্টিও যেমন কবির নিজের নহে, সে যেমন কবির অন্তর্যামীর সৃষ্ট, তেমনি আমাদের জীবনের কোন কর্মই যেন আমাদের নহে,—সে আমাদের অন্তর্যামীর। কাব্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া যেমন অনুভব করিতে পারি যে, আর একটি অজ্ঞাত সত্তা আমাদের কাব্য-জীবনকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তেমনিই যেন আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 'সকল কর্মে সকল মননে' আর একটি গভীরতর সত্তা যেন আমার জীবনকে লইয়া আপন বিচিত্র লীলায় মত্ত হইয়া আছেন। আমাদের প্রতি মুহূর্তের 'আমি'গুলিকে যেন একটি রসসৃষ্টির ভিতরে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন এক অন্তর্যামী দেবতা;—কাব্যের দেবতা এখানে আসিয়া দেখা দিলেন 'জীবন-দেবতা'রূপে। জীবনের সেই

'অন্তর্যামী' ও 'আমি'র ভিতরে সম্বন্ধ কি? সে সম্বন্ধ ঠিক যন্ত্র এবং যন্ত্রীর,—এই জীবন-বীণার ভিতরে ভরিয়া দিতেছেন সেই অন্তর্যামী পুরুষ অসীম ঝঙ্কার।

আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনা-ভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম মাঝে।
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ব-বেদনা
মোর বেদনায় বাজে।

অথবা এই ক্ষুদ্র বর্তমানের ব্যক্তি-জীবন—ইহা যেন একটি মাটির প্রদীপ—সেই অন্তর্যামী যেন ইহাকে লইয়া বিশ্ব-দেবতার দেউল-প্রাঙ্গণে আরতি জাগাইতেছেন।

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন দেবতার,
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দির তলে।

দেখিতে পাইতেছি, যিনি ছিলেন শুধু কাব্য-জীবনের অন্তর্যামী তিনিই একটু একটু করিয়া দেখা দিলেন জীবনের অন্তর্যামী, জীবন-দেবতারূপে।

ছাড়ি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী

জীবনের শেষে কী নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি।
চির দিবসের মর্মের ব্যথা,
শত জনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ-নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি।

এই কাব্যের অন্তর্যামী, যিনি ক্রমে জীবনের অন্তর্যামিরূপে আসিয়া দেখা দিলেন, তিনিই আবার একটু পরে দেখা দিলেন বিশ্বের অন্তর্যামী—বিশ্বদেবতারূপে। আমাদের কাব্যসৃষ্টি যেমন আমাদের বহিঃসত্তার অতিরিক্ত একটি গভীরতর সত্তাদ্বারা বিধৃত এবং নিয়ন্ত্রিত, আমাদের জীবন-সৃষ্টির মূলেও যেমন রহিয়াছে সেই সত্য, বিশ্ব-সৃষ্টির মূলেও রহিয়াছে সেই একই সত্য। কোনও এক অজ্ঞাত বিশ্ব-দেবতা অন্তর্যামীরূপে এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনার সুরে তাঁহার বিশ্ব-বীণাখানি নিজের রাগিণীতে ভরিয়া তুলিতেছেন; সেই রাগিণীতেই জাগিয়াছে অনাদিকালের এই সৃষ্টি-প্রবাহ। সেই বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বিশ্ব-দেবতারই একটি বিশেষ প্রকাশ আমার

ব্যক্তি-জীবনের ভিতর দিয়া; ব্যক্তি-জীবনের সেই বিশেষ দেবতা আমাদের জীবনের প্রদীপ লইয়া আরতি করিতেছেন সেই বিশ্ব-দেউলের মহাপ্রাঙ্গণ-তলে। কবির গভীর অনুভূতির ভিতরে কাব্য-ধারা, জীবন-ধারা এবং বিশ্ব-ধারা মিলিয়া গিয়াছে একটি মাত্র প্রবাহের ভিতরে অঙ্গাঙ্গিভাবে। *বিশ্ব-সৃষ্টির পশ্চাতে রহিয়াছে যে সত্য*—যে রহস্য, তাহাই রহিয়াছে জীবনের প্রতিটি কর্মে,—তাহাই রহিয়াছে আবার আমাদের কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে। কাব্যের অন্তর্যামী তাই জীবনের অন্তর্যামী হইয়া ক্রমে দেখা দিলেন বিশ্বের অন্তর্যামি-রূপে। 'জীবন-দেবতা'র ভিতরে কবি জীবন-দেবতাকে যেমন আহ্বান করিয়াছেন নব নব জীবনের নব নব বৈচিত্র্য ও মাধুর্যের ভিতর দিয়া তাঁহাকে নিত্য নবীন করিয়া তুলিতে, এখানেও দেখিতেছি সেই প্রার্থনা,—

> তবে তাই হোক, দেবি অহরহ
> জনমে জনমে রহ তবে রহ,
> নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
> জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
> নব নব রূপে ওগো রূপময়
> লুণ্ঠিয়া লহ আমায় হৃদয়,
> কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দয়
> চঞ্চল প্রেম দিয়ে।

... ...

এবারের মতো পূরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান ;
সে সুরা তরল অগ্নিসমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি।

এই যে ব্যক্তিজীবনের ভিতর দিয়া পরম সত্য-স্বরূপের আত্মোপলব্ধি, এই যে সীমার ভিতর দিয়া অসীমের আত্ম-সচেতনতা, ইহার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যে ব্যক্তিজীবন লাভ করিয়াছে একটি গভীর অর্থ। শুধু ব্যক্তি-জীবন নহে, এই দৃষ্টিতে নিখিল সৃষ্টিই আপন মহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্রষ্টার সত্য ব্যতীত সৃষ্টির যেমন কোনই সত্য নাই,—আবার অন্যদিকে সৃষ্টিকে বাদ দিয়া স্রষ্টার যে আপনাতে আপনি সমাহিত রূপ সেও তাঁহার শূন্যরূপ,—কারণ সেখানে নাই তাঁহার কোনও আত্ম-চেতনা বা আত্মোপলব্ধি। আবার এই বহিঃসৃষ্টি তাহার সুন্দরতম, মধুরতম এবং বিচিত্রতম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে আমাদের জীবনের ভিতরে,—তাই মানুষের অন্তরের সহিত তাহার অন্তরতম পুরুষের যে সম্বন্ধ তাহা অনাদি অনন্ত প্রেম-সম্বন্ধ। এইখানেই জাগিয়াছে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি,—এবং সেই দৃষ্টির একটি বিশেষ পরিচয় লাভ করিতে পারি আমরা 'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলি কবিতার ভিতরে।

সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার রহিয়াছে একটা অনাদি অবিচ্ছেদ্য প্রেম-সম্বন্ধ। সীমা চাহিতেছে অসীমের ভিতরে খুঁজিয়া পাইতে আপন সার্থকতা,--অসীম চাহিতেছে সীমার ভিতর দিয়া আত্ম-চেতনা এবং আত্মানুভূতি। উভয়ের ভিতরে চলিয়াছে এই অনাদি প্রেমের খেলা। অসীম চিন্ময় ভাবস্বরূপ চাহিতেছেন অনন্ত সীমার রূপের ভিতর দিয়া আপনাকে আপনি অনন্তরূপে আস্বাদ করিতে, সসীম রূপ আবার প্রতি নিয়ত চাহিতেছে সেই পরম ভাব পুরুষের অসীমত্বের সহিত মিলনের মধ্যে আপনার অস্তিত্বকে পূর্ণতার ভিতরে সার্থক করিতে। তাই—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা॥

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা। এই যে রূপের ভিতর দিয়া ভাবের প্রকাশ এবং আত্মানুভূতি—আবার ভাবের ভিতরে রূপের সার্থকতা এই দৃষ্টই বৈষ্ণব দৃষ্টি। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের উর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, এই দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব-ব্যাখ্যা। রাধার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই,—সে শুধু 'কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহ্লাদিনী-শক্তিঃ',—

'মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।'

শ্রীভগবানের ভিতরে রহিয়াছে অনন্ত প্রেম-সম্ভাবনা; কিন্তু এই অন্তর্নিহিত অনন্ত প্রেমশক্তিকে তিনি নিজেই ততক্ষণ আস্বাদ করিতে পারেন নাই যতক্ষণ না সে অনন্ত প্রেম প্রকাশ লাভ করিয়াছে মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ভিতর দিয়া।

আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

প্রেমময়ী রাধার হৃদয়ের অতলে অবগাহন করিয়াই শ্রীভগবান আস্বাদ করিলেন আপনার অনন্ত প্রেম-সম্ভাবনাকে। তাই সন্মাত্র পুরুষ গোলক হইতে নামিয়া আসিলেন এই সৃষ্টির বৃন্দাবনের ভিতরে,—সেইখানেই চলিয়াছে তাঁহার আত্ম-রতির নিত্য-লীলা। কৃষ্ণ যেমন আপন সমগ্র প্রেমকে লাভ করিলেন রাধার ভিতরে, রাধা তেমনই আবার বলিলেন,—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমার রূপে।

এইখানেই আবার রাধার সকল জীবন-যৌবনের সার্থকতা। তাইত রাধার সব চেয়ে বড় গর্ব,—

সখীগণে বলে শ্যাম সোহাগিনী— গরবে ভরল দে।
হামারি গৌরব তুহু বাঢ়য়লি অব টুটায়ব কে ॥

রাধা-প্রেমের ভিতর দিয়া কৃষ্ণের যেমন আত্মোপলব্ধি, তেমনই আবার 'শ্যাম-সোহাগিনী'ত্বের ভিতরেই রাধার সকল পরিপূর্ণতা। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-দেবতা'কে কোনদিনই স্পষ্ট করিয়া কোন

ধর্মমত বা দার্শনিক মতবাদের আওতায় আনিয়া ফেলিতে চান নাই; তথাপি মনে হয় উপনিষদের একটা গভীর প্রভাবের সহিত এই বৈষ্ণব আদর্শটিও রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যর গোপী-প্রেমের আদর্শ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। The Religion Of Man গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the poet of the Vaishnava Sect came to my hand when I was young. I became aware of some underlying idea deep in the obvious meaning of these love poems. I felt the joy of an explorer who suddenly discovers the key of the language lying hidden in the hieroglyphs which are beautiful in themselves. I was sure that these poets were speaking about the supreme Lover, whose touch we experience in all our relations of love—the love of nature's beauty, of animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of a love that ever flows through numerous obstacles between man and Man the Divine, the

eternal relation which has the relationship of mutual dependence for a fulfilment that needs perfect union of individuals and the Universal.” অর্থাৎ,—“সৌভাগ্য বশতঃ শৈশবে বৈষ্ণব-কবিদের রচিত কতগুলি প্রাচীন গীতি-কবিতার সংগ্রহ আমার হাতে পড়ে। এই প্রেম গীতিগুলির আপাতপ্রতীয়মান অর্থের পশ্চাতে একটা গভীর ভাব খুঁজিয়া পাইলাম,—নিজস্ব-মাধুর্যে সুন্দর কতগুলি প্রতীকলিপির ভিতরে নিহিত ভাষার চাবিটি সহসা আবিষ্কৃত হইলে আবিষ্কারকের মনে যে আনন্দ হয়, আমিও সেইরূপ একজন আবিষ্কারকের আনন্দ অনুভব করিলাম। আমি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলাম, এই কবিগণ এক পরম প্রেমিকের কথা বলিতেছেন, যে প্রেমময়ের স্পর্শ আমরা অনুভব করি আমাদের সকল প্রেম-সম্বন্ধের ভিতর দিয়া,—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেমে,—প্রাণীদের প্রেমে, শিশু—সঙ্গী,—প্রেমাস্পদ প্রভৃতি সকলের প্রেমের ভিতর দিয়া,—সে প্রেম আমাদের সত্যের চেতনাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে। তাঁহারা সেই প্রেমের গানই করিয়াছেন, যে প্রেম চিরন্তন কালের জন্য অসংখ্য বাধা-বন্ধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে মানুষ এবং মানুষের স্বর্গীয় সত্তার ভিতরে; সে একটা চিরন্তনের সম্বন্ধ,—যাহার ভিতরে আছে উভয়েরই পূর্ণত্ব-লাভের একটা পারস্পরিক অপেক্ষা,—যে পূর্ণত্বের ভিতরে প্রয়োজন ব্যক্তিসত্তা এবং বিশ্ব-সত্তার ভিতরে একটা সম্পূর্ণ

মিলন।” এই দৃষ্টিতে দেখিলে রাধাকৃষ্ণের প্রেম জীব এবং বিশ্বদেবতার ভিতরকার অনাদি প্রেম-সম্বন্ধেরই প্রতীক মাত্র। এ প্রেম-সম্বন্ধের ভিতরে রহিয়াছে উভয়েরই পূর্ণত্বলাভের একটা পারস্পরিক অপেক্ষা; অর্থাৎ কাহাকেও বাদ দিয়াই কেহ পূর্ণ নয়,—সীমা তাহার পূর্ণত্ব খুঁজিতেছে অসীমের ভিতরে, অসীম আবার বিকাশের পূর্ণত্ব, আত্মোপলব্ধির পূর্ণত্ব খুঁজিতেছে সীমার মধ্য দিয়া। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবধারার ভিতরে উপনিষদের পটভূমিকায় একাধারে হেগেলের মতবাদটি এবং বৈষ্ণব মতবাদটি মিশিয়া আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জীব-শক্তিকে তটস্থাশক্তি বলিয়া যে সিদ্ধান্ত তাহা একটি গভীর তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়। জীবের ভিতরে রহিয়াছে একটা তটস্থ ভাব,—সে আছে সীমা ও অসীমের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সীমা ও অসীমের একটা মিশ্রণ রূপে। এই জন্যই মানুষ হইতেছে একটি finite-infinite being! এই তটস্থ লক্ষণের জন্যই জীবের ভিতরে রহিয়াছে অসীম প্রেমাস্পদের জন্য অনাদি অনন্ত প্রেম।

আমরা রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতার ভিতরে একদিকে পাইতেছি হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গির সমগ্রতা এবং ব্যাপকতা,—অন্যদিকে পাইতেছি বৈষ্ণবদের প্রেমের গভীরতা। এখানে একদিকে যেমন রহিয়াছে অন্তর্লোক এবং বহির্লোক উভয় জুড়িয়া একই নটরাজের একই নৃত্যভঙ্গির দুইটি পদবিক্ষেপ,

—অন্যদিকে তেমনই দেখিতে পাই, মানুষের সহিত বিশ্ব-দেবতার প্রেমের গভীরতা,—যে গভীরতার ভিতর দিয়া আমাদের জীবন তাহার সকল অতীত, বর্তমান ও অনাগতকে লইয়া সাজিয়া উঠিয়াছে এক পূর্ণ স্বরূপের মিলন আকাঙ্ক্ষায় একটা অনাদি অভিসারের রূপে। 'বলাকা' এবং তৎপরবর্তী যুগের কবিতার ভিতরে অবশ্য দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের ভিতরে পরম সত্যের ধারণা ক্রমান্বয়ই অস্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই পরম সত্য ব্যক্তিক অথবা নৈর্ব্যক্তিক অথবা অন্য কিছু তাহা যেন আর স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় না; কিন্তু 'বলাকা'র পূর্ববর্তী যুগে, বিশেষ করিয়া 'গীতা-ঞ্জলি'র কবিতা গুলির ভিতরে যেন মনে হয়, কবি ব্যক্তিক ব্রহ্মে বিশ্বাসবান ছিলেন,—সেই ব্যক্তিক। ব্রহ্মের সঙ্গেই যেন আমাদের ব্যক্তিপুরুষের চলিয়াছে অনাদি প্রেমের খেলা—উভয়েরই অনন্ত অভিসার যাত্রা। তাই কবি বলিতেছেন,—

জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।
কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ কিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।

সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রস বরিষণ॥

কোন্ এক অনাদিকাল হইতে এই জীবনের অভিসার-যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। চলার পথে দুই পাশে যেন জন্ম-জন্মান্তরের সৌন্দর্য, মাধুর্য, স্নেহভালবাসার ভিতর দিয়া কোন্ এক প্রিয়তম পূর্ণস্বরূপ দয়িতেরই আভাস পাইতেছি। শুধু যে সৌন্দর্য-মাধুর্য—স্নেহভালবাসার ভিতরেই যে তাহার ও আমার মিলন-অভিসার চলিয়াছে তাহা নহে,—

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,—
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই—
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।

সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হ'তেছো তুমি পার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।

পূর্বেই দেখিয়াছি, একটা নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত প্রকাশই জীবনের ধর্ম; কিন্তু এই গতির ধর্মের ভিতরে আমরা জীবনের কোনও মূল্য খুঁজিয়া পাই নাই,—কারণ, উদ্দেশ্য-বিহীন, অন্তবিহীন যে নিরন্তর ভাসমানতা তাহার ভিতরে কোনও শাশ্বত অর্থ নাই। কিন্তু এ যাত্রার পশ্চাতে রহিয়াছে একটি প্রেমের মিলনাকাঙ্ক্ষা,— এই মহা-মিলনের আদর্শেই জীবনের খরস্রোতে ভাসমানতা একটা গভীর অর্থ লাভ করে।

যাত্রী আমি ওরে।
যা কিছু ভার যাবে সকল স'রে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে,
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে।
যাত্রী আমি ওরে।
বাহির হ'লেম না জানি কোন্ ভোরে।
তখন কোথাও গায়নি কোন পাখী,
কি জানি রাত কতই ছিল বাকি,

নিমেষ-হারা শুধু একটি আঁখি,
জেগেছিলো অন্ধকারের পরে।
যাত্রী আমি ওরে।
কোন্ দিনান্তে পৌছাবো কোন্ ঘরে।
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে,
বাতাস কাঁদে কোন কুসুমের ঘ্রাণে,—
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু'নয়ানে,
অনাদি কালে চাহে আমার তরে।

আমাদের অজানায় আমাদের জীবনের অনন্ত যাত্রার মধ্যে এই মিলনের বাসনাটি মিশিয়া আছে। ঝরণা যেমন না জানিয়া বাহিরে সাগরের পানে ছুটিয়া চলে, পুষ্প যেমন না জানিয়া আলোর জন্য সমস্ত নিশি জাগিয়া কাটায়, তেমনই কোন্ আদি যুগ হইতে অজ্ঞাত গভীর আশায় এ জীবনের ধারা ছুটিয়া চলিয়াছে এক পরম দয়িতের পানে।

কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
... ...
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়,
জানেনা সে কাহারে চায়,
তেম্‌নি ক'রে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
... ...

পুষ্প যেমন আলোর লাগি—
না জেনে রাত কাটায় জাগি'
তেম্‌নি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় ॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমিই যে, সেই পরম দয়িতের মিলনের জন্য জীবনের অনাদি অভিসারে ছুটিয়া চলিয়াছি তাহা নহে,—তিনিও অনাদি কালের অভিসারে বাহির হইয়াছেন আমার মিলনের জন্য। তাইত ;—

আমার মিলন লাগি' তুমি
আস্‌ছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে।

কতো কালের সকাল সাঁজে
তোমার চরণ ধ্বনি বাজে,—
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।

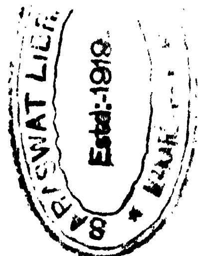
চিরন্তন দয়িতের এই মিলনের আহ্বান—এই অনাদি বংশী-ধ্বনিই—আমাদিগকেও এই সীমাবদ্ধ সত্তাকে অতিক্রম করিয়া প্রেমের ভিতরে কোন্ সুদূর গভীরতায় টানিয়া লইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়ই বলিতে গেলে,—

The Vaishnava Poet sings of the Lover who has his flute which with its different stops, gives out the varied notes of beauty and love that are in Nature and Man. These notes bring to us our message of invitation. They eternally urge us to come out from the seclusion of our self-centred life into the realm of love and truth. অর্থাৎ—"বৈষ্ণব কবি সেই প্রেমিকের কথাই গান করেন, যাঁহার হাতে আছে বিভিন্ন-সুরের বাঁশী, সে বাঁশীতে বাজিয়া ওঠে প্রকৃতি ও মানুষের ভিতরে আছে যত সৌন্দর্য এবং প্রেম তাহারই বিচিত্র সুর। এ সুর বহিয়া আনে একটা আহ্বান-বাণী, উহা চিরন্তন কালের জন্য আত্ম-কেন্দ্রিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা হইতে আমাদিগকে প্রেম ও সত্যের রাজ্যে আসিবার জন্য অনুপ্রেরণা দান করিতেছে। জীবনের ক্ষণে ক্ষণে সুদূর হইতে আসিতেছে এক মোহন বাঁশীর ঘর-ছাড়ান তানে প্রেমাভিসারের সুর,—সমগ্র জীবনকে সে যেন করিয়া রাখিয়াছে বিরহ বিধুর। সে বিরহ-বেদনার ভিতর দিয়া শুধু ইহাই যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, আমার জন্য আমার প্রিয়তম অনাদিকাল জাগিয়া আছেন।

বেদনা দূতী গাহিছে, "ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি' জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,

দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি',
বাদল জল পড়িছে ঝরি' ঝরি',
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি'
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল জল পড়িছে ঝরি' ঝরি'।



বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে;
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে!

কিন্তু আমার মিলনের জন্য সেই বিশ্ব-দেবতার এমন আকুলতা কেন? সেই আত্ম-চেতনা এবং আত্মোপলব্ধির জন্য। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে,—আমাদের জন্য আমরা তাঁহার প্রিয় নহি,—আমাদের ভিতর দিয়া তিনি যে খুঁজিয়া পান নিজেকে, তাই আমরা তাঁহার এত প্রিয়। যেদিন তিনি আপনাতে আপনি সমাহিত ছিলেন, সেদিন ত আপনাকেই আপনি দেখিতে পান নাই! তখন আত্মো-পলব্ধির জন্য সেই আদির এক বলিলেন,—'একোঽহং বহু

স্যাম্' এবং তখন তিনি করিলেন আত্মাবলোকন,—'তদৈক্ষত'; এই আত্মাবলোকনের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইল 'বহু'র রূপ। 'বলাকা'র একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।

কিন্তু তাহার পরে,—

আমি এলেম, ভাঙ্‌ল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে
আমায় তুমি মরণ মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।
আমি এলেম, কাঁপ্‌ল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার ফাগুন ভরা বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতার ভিতরেও কবি বলিতেছেন,—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চ'ল্‌ছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধ'রে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই তো, তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি'
ফির্‌ছ কত মনোহরণ-বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি'।
তাই তো প্রভু, হেথায় এল নেমে,
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে॥

আমাদের এই সীমার ভিতর সেই অসীমের দেবতা নিরন্তর বাজাইতেছেন তাঁহার অসীমের সুর,—নানা বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গানে সেই অরূপের রূপের লীলায় জীবন ভরিয়া উঠিয়াছে। মানুষের সেই তটস্থরূপ,—সেই finite-infinite being! জীবনের যত অভিজ্ঞতা যত অনুভূতি তাহা আর কিছুই

নহে,—সকলই সেই অসীম অরূপের আত্ম-প্রকাশের রূপের লীলা। তাঁহার ভিতরে যাহা কিছু ছিল কায়াহীন সম্ভাবনা,—আমাদের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া সে উঠিতেছে সুন্দর বিধুর হইয়া।

তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে,—
বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর॥

এই সমগ্র জীবন ভরিয়া শুধু চলিবে আমার প্রিয়তমের লীলা,—সেই জন্যই ত আমার অস্তিত্ব,—সেই জন্যই ত নিখিল জগতের সহিত এক ধারায় এক সুরে চলিয়াছে এই জীবন।

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।

অন্যত্র কবি বলিতেছেন,—

তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভ'রে
এ সংসারে রেখেছ তাই ধ'রে

রইব বাঁধা তোমার বাহুর ডোরে
বাঁধন আমার সেইটুকু থাক্ বাকি—
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

এইখানেই জাগিয়াছে প্রেম-ভক্তি,—এইখানেই আসিয়াছে জীবনের চরম আত্ম-সমর্পণ। জীবনের ভিতর দিয়া যুগে যুগে দেশে দেশে সেই প্রিয়তমই করুক আত্মোপলব্ধির নিত্য-লীলা,—জীবন শুধু বাঁশী হইয়া পড়িয়া থাক তাঁহার হাতে। আমার ভিতর দিয়া তাঁহার লীলা যেদিন লাভ করিবে তাহার পূর্ণ প্রকাশ, সেদিন আমিও লাভ করিব জীবনের পূর্ণতা, এবং জীবনের সেই পরিপূর্ণতার ভিতরেই আমার প্রিয়তমের সহিত আমার ঘটিবে পূর্ণ মিলন। ভক্ত তাই নিশিদিন জাগিয়া আছে,—তাহার ভিতর দিয়া ভগবান নিরন্তর করিতেছেন কি অমৃতের আস্বাদন!

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি',
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী!

তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখেছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকখানির ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই অনেকখানি এই বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের খণ্ড রূপকে যখন নিজেদের আয়নার ভিতরে দেখিতে চাই তখন তাহাকে দেখিতে পাই কত ছোট করিয়া,—রূপের যেন খুঁজিয়া পাই না গভীরতা এবং ব্যাপ্তি; কিন্তু যেদিন 'রাজা'র আয়নার ভিতরে নিজেদের রূপ দেখিতে পাই সেখানে দেখি, আমরা কত বৃহৎ,—সেখানে আমরা শুধু আমরা নই, সেখানে আমরা 'রাজা'রই দ্বিতীয়। তাই রাজা ও রাণীর কথোপকথনে দেখিতে পাই,—

সুদর্শনা

আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি, এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা

পাই বই কি।

সুদর্শনা

কেমন করে দেখ্তে পাও? আচ্ছা, কি দেখ?

রাজা

দেখ্তে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার

আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে' দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!

সুদর্শনা

আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে' ওঠে। কিন্তু ভাল করে' প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে ত দেখ্‌তে পাই নে।

রাজা

নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোট হ'য়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখ্‌তে পাও ত দেখ্‌বে সে কত বড়! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি কি সেখানে শুধু তুমি!

এই যে রাণীর অনুপম রূপ ইহা রাণীর কিছুই নহে,—রাজার নিজের অনুপমত্বেরই ছায়া পড়ে রাণীর দেহ-মনে রাজার গভীর প্রেমের ভিতর দিয়া,—এবং রাণীর ভিতর দিয়াই রাজা আস্বাদ করিতেছেন আপন অনুপম রূপ।

সুদর্শনা

—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা

তোমারি মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা

যদি থাকেত সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।

রাণীই যে শুধু রাজার প্রেমে সার্থক হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে, রাজাও যে রাণীর প্রেমের জন্য—রাণীর ভিতর দিয়া আত্মোপলব্ধির জন্য আগেই রাস্তায় বাহির হইয়া আছেন।

সুদর্শনা

তা'র পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হ'লে এই কথাটাই তা'কে বল্‌ব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বল্‌ব চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি! এ গর্ব্ব আমি ছাড়ব না!

সুরঙ্গমা

কিন্তু সে গর্ব্বও তোমার টিক্‌বে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য!

পার্বত্য ঝর্ণা যেমন সকল উপল খণ্ড ভেদ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন চলিয়াছে সাগর-সঙ্গমে, যুগে যুগে দেশে দেশে ভক্ত-প্রাণ আপনার জীবন-ধারাকে সার্থক করিয়া উপলব্ধি করিতে

চাহিয়াছে ভূমার ভিতরে,—পূর্ণ সত্যস্বরূপ—প্রেমস্বরূপের ভিতরে। যুগে যুগে দেশে দেশে ভক্তকবির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে সেই বাণী,—সেই খণ্ডের ভিতরে অখণ্ডের লীলা,—সীমার ভিতরে অসীমের সুর। সেই সুরে সমগ্র জীবন,—সমগ্র সৃষ্টি-প্রবাহ হইয়া উঠিয়াছে একটা অনাদি অভিসার। এ অভিসারে যাত্রা করিয়াছি 'আমি'ও 'তিনি'ও। একদিন হয়ত জীবনের পূর্ণ-বিকাশের মধ্য দিয়া তাঁহার সঙ্গে হইবে আমার পূর্ণ-মিলন।

শরৎ-সাহিত্যের শাশ্বত নারী ও পুরুষ

মনস্তত্ত্বের ভিতরে মনের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যত বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায় তাহাদের ভিতর হইতে এই একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, আমাদের যত মানসিক সৃষ্টি তাহার ভিতরে থাকে দুইটি উপাদান। একটি উপাদান আমাদের বহির্জগৎ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা, আর একটি মনের নিজস্ব সম্পদ। এই দ্বিতীয় উপাদানটি যে ঠিক কি তাহা লইয়া অনেকে অনেক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন,—আমাদের ভারতীয় দর্শনের ভাষায় এই মনের নিজস্ব সম্পদটিকে বলা যাইতে পারে 'বাসনা-সংস্কার'। এই বাসনা সংস্কারের বিভিন্নতার জন্যই জগতের একই বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দর্শন ও জ্ঞান হইতেছে। মোটের উপর দেখা যায়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বহির্জগতের সকল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ইন্দ্রিয়ানুভূতি রূপে মনের ভিতরে থাকিয়া মনের মাল-মসলারূপে পরিণত হইতেছে; কিন্তু এই সকল মাল-মসলাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতেছে মন তাহার বাসনা-সংস্কারের দ্বারা। সুতরাং কোনও রূপ সৃষ্টির ভিতরে আমরা বাহিরের এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি গুলিকেও যেমন বাদ দিতে পারি না, আমাদের বাসনা-সংস্কারকেও তেমনই বাদ দিতে পারি না।

সৃষ্টি-কার্যের ভিতরে মনের এই যে দুইটি উপাদান তাহা ধরা পড়ে সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরেও। আমরা সাধারণতঃ প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নিজেদের যতই সংস্কার-মুক্ত মনে করি না কেন,—বাসনা-সংস্কার আমাদিগকে কোন দিনই ত্যাগ করে না, তাহার বাস যে একেবারে আমাদের মর্মের মূলে। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই, তাঁহার মনটি ছিল সংস্কার-মুক্ত,—জীবনকে তিনি দেখিয়াছিলেন শুধু সমাজ, জাতি, ধর্ম ও নীতির সংস্কারের রঙীন চশমার ভিতর দিয়া নহে,—জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন সংস্কারের বাহিরে,—তাহার স্বাধীন স্বাভাবিক রূপে। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা যে একেবারে অমূলক এ কথা বলা যায় না ;—সত্য সত্যই জীবন সম্বন্ধে তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে জীবন সম্বন্ধে দান করিয়াছিল নূতন ভাবদৃষ্টি,—তিনি লাভ করিয়াছিলেন জীবনের অভিনব তত্ত্ব ও তাহার অসীম রহস্য। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টিকে বিশ্লেষ করিলে দেখিতে পাইব,—মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা, তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার গভীর রহস্যবোধকে তিনি যেখানে সাহিত্যের ভিতরে রূপায়িত করিয়াছেন সেখানে সাধারণতঃ রহিয়াছে দুইটি উপাদান,—একটি জীবনের রহস্যময় অভিজ্ঞতা,—অপরটি তাঁহার বাসনা-সংস্কার। মানব সম্বন্ধে তাঁহার বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা দিয়াছে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মাল-

মসলা,—কিন্তু অনেক স্থানে তাঁহার হৃদয়স্থিত বাসনা-সংস্কার তাহাকে দিয়াছে বিশিষ্ট রূপ।

কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র গুলি বিশ্লেষণ করিলে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টিকে সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, তাঁহার সৃষ্ট মূল চরিত্রের অনেকগুলির ভিতরে একটা শ্রেণীগত ঐক্য রহিয়াছে। আশপাশের চরিত্রগুলি যতই বৈচিত্র্যময় হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অভিনব হইয়া উঠুক না কেন, প্রধান চরিত্রগুলি যেন সব সময় এক একটি নূতন ব্যক্তিত্ব লইয়া আমাদের কাছে ধরা দেয় না। এই প্রধান চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, শরৎচন্দ্রের মনে একটি শাশ্বত নারী এবং একটি শাশ্বত পুরুষের চিত্র অঙ্কিত ছিল। এই মূল নারী—এবং পুরুষ-প্রকৃতিই যেন নানা অবস্থা বিপর্যয় এবং দেশ-কালের অবস্থানের ভিতর দিয়া বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রধান কতগুলি উপন্যাসের মধ্যে। বাহিরের এই রূপবৈচিত্র্যের পশ্চাতে যে নারী-প্রকৃতি এবং পুরুষ-প্রকৃতি রহিয়াছে তাহা অনেক স্থলেই এক। এই যে মূল নারী-প্রকৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতি ইহাকেই আমরা বলিতে পারি শরৎচন্দ্রের মনের উপাদান,—বাহিরের নরনারীর ভিতরেও শরৎচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে খুঁজিয়া পাইয়াছেন এই অন্তরের নরনারীকে। প্রথমে শরৎচন্দ্রের মানস নরনারীর মূর্তিই একটু চিনিয়া লওয়া দরকার।

ভারতীয় চিন্তাধারার ভিতরে প্রায় সর্বত্রই একটা জিনিস দেখিতে পাই, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, কিন্তু পুরুষ চিরদিনই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, ভোলানাথ। প্রকৃতির হাতেই চলিতেছে সমগ্র জগৎ-ব্যাপারটি,—কোথা হইতে কি দিয়া যে প্রকৃতি সংসারটিকে কেমনভাবে চালাইয়া লইতেছে পুরুষ তাহার কিছুরই খোঁজ রাখে না,—খোঁজ রাখিতেও চাহে না,—সে যেন এই বিশ্বাসেই সর্বদা নিশ্চিন্ত হইয়া আছে যে, সংসার-ব্যাপারটির চলাচলের জন্য ভাবিবার একজন রহিয়াছে, সেজন্য তাহার বিশেষ ব্যস্ত না হইলেও চলে। বিশ্ব-সংসারের মধ্যে রহিয়াছে যে এই নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি তাহাকেই যেন আবার খুঁজিয়া পাই আমাদের ছোট ছোট সংসারগুলির ভিতরে। এখানেও যেন পুরুষ অনেকখানি ভোলানাথ,—সে যে শুধু সংসার-যাত্রাকে নির্বিঘ্নে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে না তাহা নহে; আপন স্বাতন্ত্র্যে সে আপনিই যেন অনেকখানি অচল,—নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিজের জীবন-যাত্রাটিকে সাবলীল ছন্দে বহাইয়া লইতেই যেন সে অক্ষম—পদে পদে তাই চাই বিধৃতিরূপিণী নারীর শক্তি এবং সাহায্য। আবার এই যে বিধৃতিরূপিণী নারী সে যতই শক্তিময়ী হোক, পুরুষের সাহায্য বতীত সেও অচল,—তাহার সকল শক্তি, সকল গুণের মূল যেন রহিয়াছে পুরুষেরই সাহচর্যে, পুরুষ-সান্নিধ্যেই যেন সেই শক্তি, সেই গুণ তাহার ভিতরে জাগ্রত

হইয়া ওঠে, তখন পুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই নানা ছন্দে জাগিয়া ওঠে তাহার শক্তির স্পন্দন।

আমাদের মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যে দেখিতে পাই যে হরপার্বতীর চরিত্র—তাহা যেন অনেকখানি আমাদের বাস্তব চরিত্রেরই দুইটি প্রতীক। সেখানেও দেখিতে পাই,—পাগলা ভোলাকে লইয়া মা দুর্গার কি বিপদ! ভোলানাথ যে শুধু সংসারের খোঁজ রাখে না তাহা নহে,—নিজেরও খোঁজ রাখে না। কখন কাহাকে খুশী মনে কি বর দিয়া বসিল,—কখন কাহার উপর নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কারণে রুষ্ট হইয়া বসিল, এই সকল গোলযোগ সামলাইতেই পার্বতী হয়রান। কিন্তু পার্বতী এই আত্ম-ভোলা উদাসী পুরুষটির সহিত যতই ঝগড়া করুক,—মান করুক,—অভিমান করুক,—এই ছন্নছাড়া ভোলানাথকে কি সে কখনও দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছে, না দূরে ঠেলিয়া দিতে আন্তরিক ইচ্ছা করিয়াছে? শিব যে দুর্গার ভালবাসা, যত্ন, শাসন এবং সংরক্ষণ ব্যতীত একেবার অসহায়, দুর্গার নিকট ইহা যেন শিবের একটা আকর্ষণ, তাই সকল দোষ, সকল ত্রুটি সত্ত্বেও শিব চিরদিনই তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

এইখানেই যেন নারী ও পুরুষ-প্রকৃতিতে একটা মূলগত ভেদ; পুরুষ অনেকখানি উদাসী, আত্মভোলা, চঞ্চল,—নারী সর্বদা সচেতন শান্ত, ধীর, বিধৃতিরূপিণী। নারী-

পুরুষের প্রকৃতি যেখানে এইরূপ সেইখানেই তাহাদের সত্যকার মিলন, সে মিলনের ভিত্তি তাহাদের প্রকৃতিতে। কিন্তু পুরুষ যেখানে পূর্ণ সচেতন, নিখুঁত হিসাবী,—আপনাতেই আপনি পূর্ণ সেখানে যেন নারী-প্রকৃতির সহিত তাহার ঠিক মিলন হইতেছে না; আবার নারী যেখানে চঞ্চল,—অচেতন, বেহিসাবী, সেখানেও সে পুরুষের হৃদয় জয় করিয়া লইতে পারে না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভিতরে অনেক স্থানে যেন নারী-পুরুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সত্যটিই প্রকাশ পাইয়াছে। নর-নারীর যে প্রকৃতিগত মিলন তাহার ভিতরে অনেকখানি মনোবিজ্ঞানের সত্য নিহিত রহিয়াছে। প্রেমের ভিতর সর্বদাই রহিয়াছে একটা আত্মানুভূতি,—একটা আত্মোপলব্ধির প্রশ্ন। সেই জিনিসকে বা সেই লোককেই আমরা ভালবাসিয়াছি সব চেয়ে বেশী যাহার ভিতরে আমাদিগকে আমরা পাইয়াছি সব চেয়ে বেশী নিবিড় করিয়া; সেখানে আমাদিগকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি একটা দুর্লভ মূল্যে। মানুষ জীবনের প্রতিটি স্পন্দনের ভিতর দিয়া গভীর ভাবে অনুভব করিতে চায় তাহার ব্যক্তি-সত্তাকে। যাহার ভিতরেই মানুষ পায় সেই মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী,—সেইখানেই সে নিজেকে দেয় নিঃশেষে বিলাইয়া; সেইখানেই জাগে তাহার হৃদয়ের সবটুকু প্রেম। পুরুষের কর্মক্ষেত্র বহুবিস্তৃত, সংসারে বহু-ক্ষেত্রে সে সুযোগ পায় এই আত্মপরিচয়—এই আত্মোপলব্ধির;

কিন্তু নারীর জীবনক্ষেত্রের পরিধি স্বাভাবিকই সীমাবদ্ধ,—সে পায় না বহির্জগতের সহিত আদান-প্রদানে আত্মপরিচয়ের সুযোগ; তাই তাহাকে আত্মপরিচয় লাভ করিতে হয় তাহার পারিবারিক জীবনে স্বামিপুত্রের ভিতর দিয়া। যে পুরুষ নিজকে নিজে সম্পূর্ণ গুছাইয়া রাখিতে জানে না, নিজের দেহকে পর্যন্ত নিজে বাঁচাইয়া চলিতে পারে না,—নিজের মনের ভাবনার ভার আর কাহারও উপর না দিয়া যে সোয়াস্তি লাভ করিতে পারে না, তাহারই কাছে নারী বিলাইয়া দেয় তাহার সংহতিশক্তি,—তাহার সংযম-বল—তাহার সমস্ত প্রেম-মাধুর্য। পুরুষ যেখানে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ,—নারী সেখানে পায় তাহার আত্মাভিমানে ব্যথা,—সে নিজেকে মনে করে অনেকখানিই বাহুল্য। কিন্তু তাহার এ বাহুল্যের জীবন তাহাকে কোনও আরামই দিতে পারে না। সে শান্তি চায় না, সুখ চায় না,—আরাম চায় না, স্বাচ্ছন্দ্য পর্যন্ত চায় না,—সে শুধু চায় প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে সংসারে তাহার প্রয়োজন। সে চায় প্রাণে প্রাণে এই অনুভূতি, সে সংসারের আর কোনও কাজেই না লাগুক, সংসারে একটি মাত্র জীব রহিয়াছে যে তাহাকে ছাড়া অচল। তাহার শরীরের যত্ন সে নিজে করিতে জানে না, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ সে নিজে গুছাইয়া রাখিতে জানে না; সংসারে দৈনন্দিন খুঁটিনাটির জন্য সে পরমুখাপেক্ষী,—নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের জন্য

সে সর্বদাই উদাসীন; সংসারের সকল ভালমন্দের হিসাব নিকাশ সে নিজে একলা বসিয়া করিতে পারে না, ঘাত-প্রতি-ঘাতের বেদনাকে সে একা হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে না, নিন্দাগ্লানি অপমানের বোঝা একা বহন করিতে পারে না।

নারী চায় জীবনের সকল দুঃখে অপমানে, বেদনায় দারিদ্র্যে, জীবনের সকল ঘাত-প্রতিঘাতে পুরুষের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে,—এইখানেই সে অনুভব করে তাহার জীবনের দুর্লভ মূল্য,—ইহাই তাহার জীবনের গর্ব! একটি অসহায় জীব তাহাকে ছাড়া চলিতে পারে না, সে যে অনেকখানিই তাহার হাতের পুতুল ইহা নারী জীবনের আক্ষেপ নয়, ক্ষোভ নয়—ইহাই নারী-জীবনের বড় গর্ব। তাই নারী প্রকৃতিতেই অনেকখানি মা, এই মাতৃত্বেই যেন তাহার চরম সার্থকতা! এই যে নারীর প্রকৃতিগত মাতৃত্ব ইহাকেই আমরা সাধারণত বলি হিন্দু-আদর্শ। কারণ ইউরোপে নারী পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়া তাহার জীবনক্ষেত্রের পরিধিও অনেক বাড়াইয়া লইয়াছে; তাই এই নিছক মাতৃত্ব-বুদ্ধির ভিতর দিয়াই তাহাকে সর্বদা আত্মপরিচয় লাভ করিতে হয় না,—আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র সে আরও লাভ করিয়াছে বহুরূপে। কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত নারী-জীবনের পরিধি এই ভাবে খুব বেশী বর্ধিত হয় নাই,—তাহার আত্মপরিচয়ের সুযোগ এখনও সেই মাতৃত্ব-বুদ্ধিতে।

শরৎচন্দ্র আমাদের প্রচলিত সমাজ ও তাহার প্রচলিত রীতিনীতি সংস্কারের বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ ঘোষণা করুন না কেন, নারী-প্রকৃতির এই আদর্শটি তাঁহার মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, তাঁহার প্রায় সকল নারী-চরিত্রের ভিতর দিয়া এই মাতৃত্বের গৌরব। প্রায় সকল প্রধান প্রধান নারী-চরিত্রের ভিতরেই দেখিতে পাই অনেকখানি সেই ধৃতিরূপিণী মাতৃমূর্তি। নিজের ছন্নছাড়া এলোমেলো জীবন—তাহার সকল অসহায়তার কারুণ্য দ্বারা যেন পুরুষ সর্বত্র জয় করিয়াছে নারীচিত্তের অসীম সহানুভূতি—সেই সহানুভূতির ভিতর দিয়া আসিয়াছে একটু একটু করিয়া আত্মসমর্পণ। পুরুষ যেখানে আপনার সম্পূর্ণতা লইয়া নারীচিত্তকে অধিকার করিতে চাহিয়াছে, সেখানে সে পদে পদে লাভ করিয়াছে তীব্র পরাজয়--নারী-প্রকৃতি যেন সেখানে বসিয়াছে বিদ্রোহিণী হইয়া।

ধরা যাক 'চরিত্রহীনে'র সতীশ আর সাবিত্রীর কথা। সতীশ একটি ছন্নছাড়া জীব। তাহার আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে নিজের প্রকৃতির রাশ টানিয়া সে কোন দিনই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না,—উচ্ছৃঙ্খল জীবনের নানাধারাকে একটি সংহতি দান করা তাহার শক্তির অসাধ্য। পিছনে থাকিয়া কেহ তাড়া না করিলে তাহার স্নানাহার হয় না,—স্নানাহার হইলে রাগ করিয়া অনুনয় করিয়া নানা ছলে বলে কৌশলে ইস্কুলে না পাঠাইলে

ইস্কুলে যাইবার উপসর্গটিকে সে সানন্দচিত্তেই ভুলিয়া যায়। সে ধূমপানে ওস্তাদ, থিয়েটারের নামে—গান-বাজনার নামে সে পাগল—অথচ জীবনের বর্তমানের প্রতি সে উদাসীন,—ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ। সে মদ খায়, কুসঙ্গে মেশে,—উচ্ছৃঙ্খলতার আর কিছুই বাকী নাই! কিন্তু তাহার ভিতরে রহিয়াছে একটা তাজা প্রাণ, প্রেমের স্পর্শে সে নিজেকে একেবারে লুটাইয়া দেয়। একটু কারণে সে হঠাৎ রাগিয়া ওঠে, একটু উত্তেজনায় সে আত্মসম্বরণে অক্ষম,—একটু আঘাতে সে চঞ্চল,—একটু বেদনায় সে বিহ্বল! জীবনের ক্ষেত্রে যেন কত নিঃসহায় এই জীবটি, প্রাণের প্রাচুর্যে একেবারে বেদিশা হইয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছড়াইয়া আছে জীবনের ক্ষেত্রে। পাশে আসিয়া দাঁড়াইল সাবিত্রী তাহার প্রেম, ধৈর্য, সংযম ও সংহতি লইয়া। সতীশের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া সাবিত্রীর মনের অবচেতন লোকে শুধু এই কথাটি হয়ত ভাসিয়া বেড়াইত,—কত অসহায় শিশু এই সতীশ,—জীবনের খরস্রোতে কোথায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কেহ দেখিবার নাই, বলিবার নাই, ধরিয়া রাখিবার নাই। এই আত্মভোলা নিঃসহায়তা যেন সতীশের একটা মাধুর্য; সাবিত্রীকে ব্যতীত জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যে সতীশ অচল এইটাই ছিল সাবিত্রীর নারীজীবনের সর্বাপেক্ষা বড় গর্ব—সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

এই জিনিসটা সব চেয়ে বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে

শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি"র ভিতরে। সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিটি ছিল মাটির প্রদীপের মত, পিছন হইতে সর্বদাই কেহ উস্কাইয়া না দিলে সে আপনা-আপনি বেশীক্ষণ জ্বলিতে পারে না। "বলবুদ্ধি, ভরসা তাহার সব আছে, তবু সে একা কোন কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে না। খানিকটা কাজ সে যেমন উৎসাহের সহিত করিতে পারে, বাকীটুকু সে তেমনি নীরব আলস্যভরে ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। তখনই একজন লোকের প্রয়োজন,—সে উস্কাইয়া দিবে।" ধনীর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ আশৈশব বিমাতার যত্নে ও শাসনে প্রতিপালিত, তাই নিজের সম্বন্ধে কোন দিনই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই আত্মপ্রত্যয়। কখন যে কি প্রয়োজন হইবে এবং কখন তাহাকে যে কি করিতে হইবে, সে জন্য সে সম্পূর্ণ আর একজনের উপর নির্ভর করিত। অনেক সময় ক্ষুধা ও নিদ্রাবোধের ভিতরে যে পার্থক্যটা কি তাহাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বুদ্ধিমতী কর্মনিপুণা প্রেমময়ী মাধবীর নিকটে এই গৃহশিক্ষকটি মনে হইত একটা অদ্ভুত জীব বলিয়া। কিন্তু প্রকৃতির এই অদ্ভুতত্বের ভিতর দিয়া এবং জীবনে তাহার সকল নিঃসহায়তার ভিতর দিয়া সুরেন্দ্রনাথ অধিকার করিয়াছিল এই বড়দিদির হৃদয়। সুরেন্দ্র মাধবীর কাছে সর্বদাই মনে হইত একটা অসহায় শিশু। মাধবী একদিন পিতার কাছে হাসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল,—বাবা প্রমীলা যেমন, তাহার মাষ্টারও ঠিক তেমনি।' পিতা উত্তর করিলেন,

'কেন মা?' 'দু'জনেই ছেলে-মানুষ। প্রমীলা যেমন বোঝে না তার কখন কি দরকার, কখন কি খাইতে হয়, কখন শুইতে হয়,—কখন কি করা উচিত, তার মাষ্টারও সেই রকম,—নিজে কিছুই বোঝে না—অথচ অসময়ে এমনি জিনিস চাহিয়া বসে যে জ্ঞান হইলে তাহা আর কেহ চাহে না।' মাধবী আবার হাসিয়া বলিল,—'তোমার মেয়েটি বোঝে কখন তার কি দরকার?' 'তা বোঝে না'। 'অথচ অসময়ে উৎপাত করে ত?' 'তা করে'। 'মাষ্টার বাবুও তাই করে—।' এই যে মাষ্টার বাবুর ছেলেমি ইহা কি মাধবীকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরক্ত করিয়াছে? সে অত্যন্ত কৌতূহলবশে সেই ছেলেমি সহ্য করিতেছে। সুরেন্দ্রের সকল অন্যায় আব্দার—সকল অসময়ের উৎপাতে কি মাধবী সত্যই কখনও রুষ্ট হইয়াছে? সে ত অসীম স্নেহ ভালবাসা অসীম ধৈর্য লইয়া শুধু সহ্য করিয়াছে,—এই সহ্যের ভিতরেই ত তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে আনন্দ উপছাইয়া উঠিতেছে তাহার গোপন আত্মানুভূতিতে।

বাল্যসাথী মনোরমাকে মাধবী চিঠি লিখিল,—"প্রমীলার জন্য বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন—তাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোট ছেলে বলিলেও হয়। আমার বোধহয় ইহার পূর্ব্বে সে আর কখনও বাটীর বাহির হয় নাই—সংসারে কিছুই জানে না। তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইলে তাহার একদণ্ডও চলে না—আমার অর্দ্ধেক

সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে ;—তোমাদের পত্র লিখিব আর কখন ?" সুরেন্দ্রের ভিতরে যে বাস করে একটি শিশু-ভোলানাথ সে আপনার কথা কোন দিনই ভাবিতে পারে না,—সেই ভোলানাথই জয় করিয়াছিল মাধবীর চিত্ত, তাহাকে ছাড়া যে সুরেন্দ্র এক দণ্ডও চলিতে পারে না এইটাই যেন তার নারী-জীবনের গর্ব।

'দত্তা'র ভিতরে এই নারী প্রকৃতিটি আরও একটু সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বিজয়া আধুনিক শিক্ষিতা যুবতী ; বিশেষতঃ সে ব্রাহ্ম,—সুতরাং আধুনিক সংস্কৃতি সে সকলই লাভ করিয়াছে। এই বিজয়ার নারী-প্রকৃতির দুইপাশে দাঁড়াইয়াছে দুইটি পরস্পরবিরোধী পুরুষ-প্রকৃতি। এই দোটানার ভিতরে পড়িয়া বিজয়ার মনের ভিতরে বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছে তীব্র দ্বন্দ্ব,—কিন্তু শেষ অবধি বিজয়া আত্মসমর্পণ করিল নরেনের হাতে। এই নরেনের হাতে একটু একটু করিয়া আত্মসমর্পণের ভিতরে দেখিতে পাই অনেকখানি সেই একই জিনিস—যাহাকে আমরা বলিয়া আসিয়াছি নারীর শাশ্বত প্রকৃতি। নরেনের ভিতরে বাস করিত সেই একটা আপন-ভোলা বিশ্বভোলা 'অদ্ভুত জীব। সে সুরেন্দ্রনাথের মত আপনাতে আপনি একেবারে অচল নহে সত্য,—সতীশের মত অসংযত উচ্ছৃঙ্খল নহে সত্য,—কিন্তু ঠিক সংসারের পাকা মানুষ নহে। বাস্তব উন্নতি, সংসারের ভালমন্দ—লাভ-অলাভ, নিন্দা-প্রশংসা

কাহারই সে ধার ধারে না,—অথচ তাহার ভিতরে বাস করিতেছে একটি জীবন্ত মানুষ যাহার স্পন্দন সে অল্পকালের সাহচর্যেই অনুভব করাইয়া দেয়। মামার হইয়া সে বিজয়ার দয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে,—কিন্তু নিজের বাড়ীঘর যে দেনার দায়ে বিজয়ার হইয়া রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী নিলাম করাইয়া লইতেছে সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। সে বিলাত হইতে ডাক্তারির সঙ্গে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছে, আজীবন তাহা লইয়া গবেষণা করিবে,—কিন্তু ঘরবাড়ী নিলাম হইয়া গেলে যে কোথায় থাকিবে, কি ভাবে জীবিকা অর্জন করিবে কোনো দিকেই তাহার খেয়াল নাই, ভাবনা নাই! একটু কারণে সে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে,—আবার একটু কারণে একেবারে নিভিয়া যায়। যে দিন জুটিল খাইল, যে দিন না জুটিল, না খাইল,—শরীরের প্রতি দৃষ্টি নাই,—পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই,—কোনও চিন্তা ভাবনা নাই, আছে শুধু আত্মসম্মান বোধ,—আছে উদারতা,—আছে অকপট সারল্য। এই পাতলাপানা ক্ষ্যাপাটে লোকটা বিজয়ার কাছে নিজেকে যতই অকর্মণ্য, অপদার্থ, হতভাগা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করুক, বিজয়ার অন্তর জয় করিয়াছিল সে অনেকখানি এই আত্মভোলা উদাস সরল প্রকৃতিটির দ্বারা। বিলাসের প্রকৃতিটি যেন ঠিক ইহারই বিপরীত,—সে পিতার ন্যায় নিপুণ সাংসারিক লোক না হইলেও ধর্মের সহিত এবং অর্থের সহিত ভালবাসাকে কিরূপ

নিপুণভাবে জড়াইয়া লইতে হয়, তাহা সে যে একেবারে না জানিত তাহা নহে। বিজয়া বুঝিতে পারিত, বিলাস তাহার স্বার্থটুকু পুরাপুরিই বোঝে, জীবনের ক্ষেত্রে সে নিজকে যা হোক গুছাইয়া চলিতে পারিবে; কিন্তু সেই পাতলা-ক্ষ্যাপাটে লোকটা নিজের ভালমন্দের দিকে কোনদিনই দৃষ্টি দিতে জানে না, নিজেকে সংসার-জীবনে গুছাইয়া চলিতে জানে না। এই যে প্রকৃতির মূলগত বৈষম্য বিলাসকে ত্যাগ করিয়া নরেনকে গ্রহণের ভিতরে বিজয়ার উপরে তাহার প্রভাব কিছু কম নহে। যাহার মা নাই, বাপ নাই—আপন বলিয়া দৃষ্টি দিবে আদর করিবে এমন কেহ নাই,—একটু মাথা রাখিবার যাহার ঠাঁই নাই,—ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল দেবার কেহ নাই,—অথচ সব চেয়ে আশ্চর্য এই, এজন্য তাহার কোন ভ্রূক্ষেপও নাই,—কেমন যেন একটা সৃষ্টিছাড়া ঔদাসিন্য,—এই যে সৃষ্টিছাড়া প্রকৃতিটি বিজয়ার নারী-প্রকৃতি গোপনে তাহাকেই দিয়াছিল বরমাল্য।

অচলার নারী-প্রকৃতিটিকে মাঝখানে রাখিয়া দুই পাশে দাঁড়াইয়াছিল যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি পুরুষ তাহারাও কতখানি এই নরেন্দ্র ও বিলাসেরই অনুরূপ। মানুষ হিসাবে মহিমের বিরুদ্ধে অচলার বলিবার কিছুই নাই,—অপর পক্ষে, সুরেশের বিরুদ্ধে বলিবার আছে অনেকখানি; কিন্তু অচলার হৃদয় ঝুঁকিল সুরেশের দিকে। ইহার কারণ মহিম ও সুরেশের সেই প্রকৃতিগত পার্থক্য। মহিম আপনাতে

আপনি সম্পূর্ণ,—সে ধীর স্থির সংযত সংহত। মনের বেদনা, জীবনের সকল বিপর্যয় সে নীরবে একাকী সামলাইয়া চলিতে পারে; সুতরাং মহিমের সঙ্গে অচলার জীবন অনেকখানিই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সুরেশের প্রকৃতিটি ঠিক তাহার বিপরীত,—সে অধীর, অস্থির,—অসংযত অসংহত। নিজের শরীরের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই,—জীবন-মৃত্যুর দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই,—নিজের ভাবাবেগের উপর তাহার কোনও শাসন নাই। নিজের জীবনকে, নিজের মনকে,—নিজের ভাবাবেগকে—কাহাকেও সে গুছাইয়া চলিতে পারিতেছে না,—সেইখানেই অচলার আন্তরিক সহানুভূতি,—সেইখানেই তাহার আপনার প্রয়োজন-বোধ। মানুষ হিসাবে অচলা সুরেশ অপেক্ষা মহিমকে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করিত,—কিন্তু সুরেশের জন্যও তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে যেন সহানুভূতি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল,—কারণ সুরেশের সাহচর্যে সে লাভ করিত আত্মানুভূতি, মহিমের সাহচর্যে যাহা সে কোন দিনই লাভ করে নাই। স্বীয় অধিকার হইতে মহিম অচলাকে চিরদিনই রাখিয়াছে বঞ্চিত,—এইখানেই অচলার অভিমান,—এইখানেই তাহার নারী প্রকৃতির বিদ্রোহ। অন্যান্য ঘটনা-সংঘাত ও মানসিক পরিবর্তনের ভিতরে এই মূল প্রকৃতির প্রভাবটিও অচলার জীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মীর নারী-প্রকৃতিটির ভিতরেও

রহিয়াছে এই সূক্ষ্ম মাতৃত্ব। শ্রীকান্ত একটি আজীবন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক,—সে যে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতেই ভবঘুরে সাজিয়াছিল তাহা নহে; এই ভবঘুরেত্ব ছিল তাহার প্রকৃতির ভিতরে। এই যে একটা সৃষ্টিছাড়া খাপছাড়া, ছন্নছাড়া জীবন, ইহার পশ্চাতে প্রয়োজন ছিল একটি আগাইয়া চালাইবার উস্কাইয়া দিবার লোকের; এইখানেই রাজলক্ষ্মী খুঁজিয়া পাইয়াছিল তাহার নারী-জীবনের প্রয়োজন। তাই শ্রীকান্তের অকর্মণ্য অপদার্থ জীবনটিতেই তাহার প্রয়োজন ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। জীবনের প্রতি পদে পদে শ্রীকান্ত ছিল যে কত অসহায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া ধরা পড়িয়াছিল শুধু রাজলক্ষ্মীর দরদী চোখের দৃষ্টিতে। সেই যেন পুরুষের ভোলানাথ মূর্তি, নারীর সেই বিধৃতিরূপিণী মূর্তি!

'পল্লী-সমাজে'র রমা ও রমেশের প্রকৃতিটিও যেন খানিকটা এই ছাঁচেই ঢালা। রমেশ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সাহসী, উদার, মহান; কিন্তু নিজের জীবনে সে যেন কেমন উদাসীন,—নিজের দিকে যেন তাহার কোনও দৃষ্টিই নাই,—শুধু অকাতরে সে আপনাকে বিলাইয়া দিতেছে। নিজের স্বার্থ সে বোঝে না,—বুদ্ধির অভাবে নহে,—শুধু নিজের পানে তাকাইয়া দেখিবার ধাতটিই দেন নাই বিধাতাপুরুষ তাহার ভিতরে। তাহার বাপ নাই, মা নাই,—সেই যেন অনেকখানি ছন্নছাড়া ভোলানাথ জীবন। থাকিবার ভিতরে

আছে শুধু বিরাট প্রাণ,—সংসারের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা যাহাকে সহসা স্পর্শ করিতে পারে না। আর এই রমেশেরই ঠিক বিপরীত প্রকৃতির লোক বেণী ঘোষাল। রমা যেন সংহতিরূপিণী,—ধৈর্য, সংযম, তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি,—অন্তর ভরা তাহার প্রেম ও দরদ। এইখানেই রমা ও রমেশের প্রকৃতিগত মিল, এবং এই মিলন ডোরে বাহির হইতে যতই আঘাত লাগুক,—সে কখনই একেবারে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে নাই।

এই যে নারী-প্রকৃতির ভিতরে সূক্ষ্ম মাতৃত্ব-বোধ ইহাই যেন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে শরৎচন্দ্রের সকল সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরে। সাবিত্রী, মাধবী, বিজয়া, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির ভিতরে যাহা দেখা দিয়াছে অনেকখানি সূক্ষ্ম-রূপে,—তাহারই স্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাইলাম 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দু, 'রামের সুমতি'র নারায়ণী, 'পণ্ডিত মহাশয়ে'র কুসুম, 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী, 'মামলার ফলে'র গঙ্গামণি প্রভৃতির ভিতর দিয়া। যে শিশু-ভোলানাথকে অনেক সময়ে আমরা অস্পষ্টভাবে পাইয়াছি সতীশ, সুরেন্দ্র, নরেন, সুরেশ, শ্রীকান্ত প্রভৃতির ভিতর দিয়া, তাহাকেই অতি স্পষ্ট করিয়া পাইয়াছি রাম, কেষ্ট, অমূল্য, গয়া প্রভৃতির ভিতর দিয়া। তাই মনে হয়, সূক্ষ্ম নারী-প্রকৃতিতে যেমন সাবিত্রী, বিজয়া, মাধবী, অচলা, রাজলক্ষ্মী, রমা প্রভৃতি বিন্দু, নারায়ণী, কুসুম, হেমাঙ্গিনী, গঙ্গামণি প্রভৃতিরই সমান, তেমনই

সতীশ, সুরেন্দ্র, সুরেশ, শ্রীকান্ত প্রভৃতিও যেন সেই রাম, কেষ্ট, গয়া প্রভৃতিরই সমধর্মী।

পূর্বেই বলিয়াছি, জীবন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি সত্যই অতি গভীর, এবং তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতাও অতি বিচিত্র। জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সত্য সত্যই লাভ হইয়াছিল একটা নিজস্ব দর্শন। তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া তিনি দিয়াছেন তাহার পরিচয়। কিন্তু জীবনের সকল বৈচিত্র্য এবং রহস্যের মধ্য দিয়াও যেন মনে হয়, নারী ও পুরুষের ভিতরে তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন শাশ্বত দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতি,—জীবনের বিভিন্ন অবস্থানের ভিতর দিয়া তাহারা কখনও স্পষ্টরূপে কখনও বা অতি সূক্ষ্মরূপে অঙ্কিত হইয়াছে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি চরিত্রের ভিতর দিয়া।

সমাপ্ত